বন্যা এলো

শক্তিপদ রাজগুরু

করুণা প্রকাশনী কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

যতদূর চোখ যায় জল আর জল, রাতের অন্ধকারে তারাগুলোও সব ডুবে গেছে, মেঘে ঢাকা পড়েছে। জমাট কালো অন্ধকারের বুকে চকচক করে দিগন্তজোড়া জলের সীমানা।

বৃষ্টির শব্দ ওঠে, বাতাস যেন ক্ষেপে উঠেছে। আধডোবা গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে দমকা এলোমেলো বাতাস নাড়া দেয়, গাছপালা থেকে ঝরঝরিয়ে জল ঝরে, আর ভেসে আসে স্রোতের গর্জন—গাঁ-শোঁ-শোঁ!

—বাঁচাও! বাঁচাও—

কাদের চীৎকার কানে আসে, স্রোতের টানে ভেসে ভেসে চলেছে সেই আর্ত চীৎকার, মাঝে মাঝে চীৎকারটার সবটুকুই মুছে যায়, বোধহয় ভাসমান সেই প্রাণীটা জলে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে ওঠে চীৎকার করে, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে সেই আর্তনাদ।

মিনি! অ······মিনি!······কার গলা রে? ছিদেম—না?

ঘরটা ডুবে গেছে অনেকখানি, দরজার মাথাও ডুবেছে সন্ধ্যার ই! উঠোনের ধানের মরাইটা থেকে কিছুমাত্র ধানও সরাতে র নি। ধানের ভারে আর জলের চাপে ভারি মরাইটা কাত হয়ে ড়য়ে আছে, ওপাশের গলা ডুবু-ডুবু পুরোনো শজনে গাছের গায়ে হলান দিয়ে পড়েছে সেটা, এখনও খসে পড়ে নি বড়গুলো, তবে ধান মত তলিয়ে গেছে জলে।

কয়েকশো মণ ধান! চমকে ওঠে ভূষণ। অন্ধকারে দূর হতে এখনও সেই ডাকটা ভেসে ভেসে আসে জলের বুকে, কান করে শুনছে ভূষণ। ককিয়ে ওঠে ছেলেটা; মিনুর সারা কাপড়চোপড় ভিজে গেছে, ঠাণ্ডা জলে এতক্ষণ ভিজেছে—শাড়িটাও স্যাপ-স্যাপ করছে।

নিচে একটা লগি ঝুলিয়ে জল দেখছে। মাঝ নদীতে নৌকার লগি নামার মতো জলের তলে সরসরিয়ে লগিটা নেমে গিয়ে বেশ খানিকটা নিচে কাদায় আটকালো। বিভূতি মাস্টার অবাক হয়—এতো জল?

—আবার কি দেখছো? জল মেপে কি হবে?

ওপাশে মলিনা একটা ছাতা আড়াল দিয়ে বসেছিল, ছাতাটা হাওয়ায় সাপটে দুলছে, বৃষ্টি পড়ছে কখনো জোরে, কখনও টিপটিপ করে। মলিনা আকাশের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—দেবতার মরণ নাই। এই করলে শেষকালে?

হঠাৎ কিসের শব্দ শুনে মলিনা বলে:

—ওগো, রাঙি গাইটা হামলুচে—ভেসে গেল যে।...

মলিনা উত্তেজনার বেগে লাফ দিয়ে উঠেছে যেন ওই ডুবন জলেই নেমে যাবে গাই গরুটাকে ধরতে, গোয়ালের পাশেই একটা ঢিবিমতো ছিল, বৈকালেই বান বাড়তে দেখে বিভূতি মাস্টার গরুগুলোর দড়ি খুলে দিয়ে ওদের বিড়বিড় করে বলেছিল:

—যা, ঢিবিতে দাঁড়াগে মা, তারপর তোদের অদেষ্ট!

গরু-বাছুরগুলোও ভয় পেয়েছে। লম্বা কান খাড়া করে তারা জলকল্লোলের শব্দ শুনেছে, ওদের কালো ডাগর দু-চোখে কি ভয়ের ছায়া নামে।

কারা তখনও চীৎকার করছে—বাঁধ গেছে হে...এ...এ, মান কেরার বাঁধ।...গ' হুঁ শি য়ার—

ক'দিন ধরেই বৃষ্টি নেমেছে, ভাদ্র মাসের শেষ। বর্ষার সময় ভালো বৃষ্টি হয়-ই নি। তবু কোনোরকমে সেচ দিয়ে ক্যানেলের জলে ঠেলেঠুলে চাষ করেছে। ধান গাছগুলো নাবি রোয়া, তবু চাষ-আবাদ শেষ করেছে তাবৎ লোক। মাঠের পর মাঠ সবুজ ধান গাছের ভিড়ে ভরে উঠেছে।

তারপর ক'দিন এই বৃষ্টিতে ধানগুলো ভালোই লেগেছিল গায়ে-গতরে। গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে ওদের রং। যতদূর চোখ

যায়, সবুজ আর কোমল—সবুজ ধানশিশুর দল ক্ষেত জুড়ে যেন মেলা বসিয়েছে। পাটও হয়েছে সরেশ। ঘন সবুজ পাটগাছগুলো জলে দাঁড়িয়ে আছে।

বিভূতিবাবু গ্রামের স্কুলের মাস্টার। সামান্য কিছু জমি-জিরাতও আছে, সেগুলো ভাগে দেওয়া, তবু বিভূতির জমির দিকে টান খুব বেশী, নিজেও মাঠে যায় অবসর পেলে। এবার চাষ-আবাদ দেখে খুশী হয়েছিল সে।

বিভূতি মাস্টার এই সামান্য রোজগারে তার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে সুখেই ছিল। বাবার আমলের বাড়িটাই টিকে আছে, নাম-ডাক আর নেই। তবু একমাত্র মেয়ে চামেলীকে পড়াচ্ছে। পাশেই গোবিন্দপুরে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়েছে, গ্রামের অনেক মেয়েরাই যায়।

মলিনা বলেছিল—দরকার কি বাপু, পড়িয়ে-টড়িয়ে, তার চেয়ে দেখে-শুনে বিয়ে দিয়ে দাও। ব্যস, চুকে যাবে ব্যাপার।

বিভূতিও সেটা জানে, কিন্তু দিতে গেলে একসঙ্গে অনেক টাকা বের করতে হবে, সে টাকা কোথায়! তাই মেয়েকে লেখাপড়াই শেখাতে চায়, তবু নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে সে দরকার হলে।

আজ এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় বিভূতি মাস্টারের। কি সব ভাবছে সে। তবু জানে সে। ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সব তার ভেসে গেছে ওই বানের তোড়ে।

মলিনা চীৎকার করছে—গাইটা গেল, ওগো! ··দেখ কেমন ডুবছে আর হামাল্‌ছে! ওগো—

চামেলী মাকে জড়িয়ে ধরেছে। ওই কাতর করুণ দৃশ্যটা দেখা যায় না; জীবন-মৃত্যুর এই লড়াই দেখে তারা শিউরে উঠেছে।

ঝপাং ··জলটা ফুলে ওঠে ওই ধাক্কায়।

আর্তরোল ওঠে রাতের অন্ধকারে।

চামেলী বলে:

—গণেশ কাকাদের বাড়ি পড়ে গেল মা, দেখো চালটা ভেসে যাচ্ছে! পটু, লক্ষ্মী, নিবুদি—মা ওরা চালে বসেছিল যে!

—ওরা ভেসে যাচ্ছে। ধরো—

বিভূতি মাস্টার চীৎকার করে ওঠে। বেশ কিছুটা দূর দিয়ে চালটা ভাসতে ভাসতে চলেছে, ওই চালের উপর ক'টা অসহায় মানুষ আতঙ্কে চীৎকার করছে।

মলিনা ছু-চোখ বুজে আর্তনাদ করে—ঠাকুর। হেই বাবা দামোদর—দামোদর! বাবা দামোদর! ঠাকুর! শত্তুর, শত্তুর! চিরকালের শত্তুর আমাদের।

বিভূতি মাস্টার বিড়বিড় করছে ভাঙা-বাঁশের কাদামাখা লগি হাতে, জল মাপতেও ভুলে গেছে সে। মাপার ইচ্ছেও নেই বোধহয়, ওই জলের আবর্ত-স্রোত যত তাড়াতাড়ি হোক তাদেরও এই আশ্রয়টুকু মুছে দিক। এই যন্ত্রণার শেষ হোক।

রাত নামছে, আবার বৃষ্টি বেড়েছে। দিগন্তবিস্তারী জলের বুকে ওই বৃষ্টির শব্দ আর ঝড়ের সাপট ধ্বংসের ভয়াল রূপটাকেই প্রকট করে তুলেছে।

ভেসে আসে নদীর দিক থেকে গর্জন, হানামুখ দিয়ে ঘোলা জল নদীর বুক থেকে লাফিয়ে কলোচ্ছ্বাসে চারদিক মুখর ক'রে নামছে, কোন হিংস্র দস্যুর দল আদিম লালসা নিয়ে হানা দিয়েছে মানুষের জগতে। শান্ত জনপদ, সবুজ ধানের ক্ষেত, সোনা-রং-আসা আউশ ধানের শীষগুলোকে—পাট ক্ষেতকে নির্মূল করে দিয়েছে, গ্রাস করেছে ওদের জনবসত।

চামেলী শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে।

বৈকাল পর্যন্ত তারা ভেবেছিল ওই বৃষ্টির জমা জল হয়তো আর উঠবে না, ওদিকে নদীতে জল বাড়ছে। পরিত্যক্ত দামোদরের

বুক হঠাৎ কি আক্রোশে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। হারিয়ে যাওয়া রাজ্যে কোন সিংহাসনচ্যুত রাজা আবার দলবল নিয়ে হিংস্র আক্রোশে দেশ পুনর্দখল করতে এসেছে। মরা নদীর বিস্তীর্ণ খাত এতদিন পড়েছিল শূন্যপ্রায় অবস্থায়। বর্ষার সময় জল কিছু আসতো, তা সামান্যই, তাকে ভয় করতে ওরা ভুলে গেছে।

পাঞ্চেৎ, মাইথন ড্যামই ওই জল আটকে রাখতো, বাকী যে জলটুকু ছাড়া হতো তা দুর্গাপুর ক্যানেল দিয়ে বের হয়ে যেত চাষ-বাসের জন্য। এমন সর্বনাশকে তারা এর আগে প্রত্যক্ষ করে নি।

চামেলী বই-এ পড়েছে, দেখেছেও। তাদের গ্রামের ধারে একদিন প্রবলস্রোতা দামোদর বইতো, সেই খাত ক্রমশ বুজে এসেছে। সেখানে দখল গেড়েছে মানুষ। ধান, পাট, রবিখন্দ, নানা তরিতরকারি হয়। বিস্তীর্ণ নদীর দু-দিকে বাঁধটা টিকে আছে আর মাঝখানে সামান্য একটু সরু জলের রেখা দেখা যেতো ; হঠাৎ সেই পরিত্যক্ত বে-দখলী রাজ্যে দামোদর হঠাৎ তার পাহাড়ী সৈন্যদল নিয়ে এসে হানা দিয়েছে।

তিনটি প্রাণী বসে আছে অন্ধকারে। কোথাও আলো নেই, বাতাসে ওঠে জলকল্লোল আর ভেসে যাওয়া কান্না—আর্তনাদ আর মাঝে মাঝে বাড়ি ধসে পড়ার শব্দ ; ওই ধ্বংসের জগতে মানুষগুলো হারিয়ে গেছে।

—নুড়ো জ্বেলে দিই ; তোর বাসমড়া বার করিরে-এ······!

অন্ধকারে থ্যানখেনে গলা শোনা যায়। বৃষ্টির আর্দ্রতায় আর আতঙ্কে সেই শক্ত-কঠিন কণ্ঠস্বর এতটুকু চিড় খায় নি বরং আরও সতেজ আর কর্কশ হয়ে উঠেছে।

বুড়ি মন্দিরের চাতালে পা মেলে বসে আছে, আর সেই গ্রাম্য-দেবতা বাবা বুড়োরাজের উদ্দেশ্যেই গাল পাড়ছে। মন্দিরটার

চারদিকে খানিকটা ঠাঁই তখনও জেগে আছে, বেশ খানিকটা উঁচু ঢিবির উপর এই পুরোনো মন্দির—ওপাশের বড় পুকুরটা ভেসে গেছে, এক হয়ে গেছে মাঠের সঙ্গে, দূরে হানামুখ দিয়ে নদীর জল নামছে অবিশ্রান্ত গতিতে।

কাঁপছে বুড়ি! ভিজে কাপড়ের খুঁট থেকে দোক্তা এক লোট দাঁতপড়া মুখগহ্বরে ফেলে আবার চীৎকার শুরু করে নতুন উদ্যমে।

—অ মণে, বলি মালপত্তর তুলতে পেরেছিস কিছু, না সবই ওই যম্‌ভরা নদীর গব্বে গেছে? হায়, হায় গো ধানের মরাইটা বললাম বিচে দে, তা আঁটকুড়ির ব্যাটার বড় লালস্‌ বলে কিনা পূজোর আগেই দাম বাড়ুক, তখন ছাড়বো। পায়া পায়া গুড় কিনেছিলি পূজোর মরশুমে দু-পয়সা কামাবি। লে, এখন কামা! পূজো, মরণ! বলি, পাপে যে সব ভরে গেছে র‍্যা, ঠাকুর দ্যাবতাও মরে গেছে। এখন গেল তো সব। একেবারে হাতে ডালি করে দিলি—অ মুখপোড়া দ্যাবতা!

মণি দত্ত মায়ের কথায় বলে—বসো দিকি, ফ্যাচ ফ্যাচ করো না। চুপ করে বসে থাকো।

—অ মা! যার জন্যে চুরি করে, সেই-ই বলে চোর! কলিকাল তো একেই বলে।

বুড়ি আবার নোতুন উদ্যমে শুরু করবে ঠাকুর-দেবতা আর গ্রামের তাবৎ মানুষকে বাপ-বাপান্ত করতে। তারাই যেন দল বেঁধে মজা দেখবার জন্য তার এই সর্বনাশ করেছে।

মণি দত্ত মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে চাতালে, জলটা নাটমন্দিরের ভিটে ছুঁই-ছুঁই করছে। ওদিকে উঠেছে কাদের চীৎকার। বোধহয় কিছু মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে এদিকে আসছিল, তাদেরই কয়েকজন প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে বিরাট ওই দীঘিটার দিকে, সেখানে জল ঘূর্ণিপাক দিয়ে ছুটে চলেছে। এই স্রোতে কারা ভেসে গেল চকিতের মধ্যে।

মণি দত্ত অসাড় হয়ে বসে আছে। দেখছে।

অনেক সর্বনাশ সে দেখছে সকাল থেকেই, তিন দিন, তিন রাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নেমেছিল। মাঠের ধান ডুবে গেছে জমা জলে, গ্রামের পথও জলের তলায়। ভেবেছিল ও জলে নেমে যাবে। মণি দত্ত এই বর্ষার ক'দিন বেশ বেচাকেনা করেছে।

গ্রামের মধ্যে ওরই গোলদারী দোকানটা বড়সড়। মণি দত্ত কারবার বোঝে, তাই ধান, গুড় এটাসেটার রাখি কারবারও করে। এমন অতিবৃষ্টির পর ধান-চালের দরও বাড়বে। তাই খুশী হয়েছিল সে।

এবার বেচাকেনা ভালো হবে এই আশাতে। চতুর লোকটা এর মধ্যে বেশ কিছু রোজগার করেছে ব্যবসা করে।

হঠাৎ সেদিন গ্রামে কলরব ওঠে। একটা সাড়া পড়ে যায়।

সকালবেলাতেই গ্রামের লোক চমকে ওঠে।

মণি দত্ত সকালে মজানদীর দিকে গেছে হাতমুখ ধুতে, তার আগেই সারা গাঁয়ের লোক জমেছে সেখানে ; ওদের মুখে ভয়ের চিহ্ন, সেই মরা নদীর বিস্তীর্ণ খেতে আউশ ধান পেকেছিল ; কেউ কেটেছে, কেউ কাটবে বাদলা ছাড়লেই। পাটও হয়েছে সরেশ, তেজালো লম্বা আঁশের পাট গাছগুলো মাথা তুলেছে লকলকিয়ে।

সে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নদীর খাতে গেরুয়া জল ফুলে-ফেঁপে উঠেছে এ কোল থেকে ও কোল অবধি আর তাতে তেমনি স্রোত। শশী মোড়ল বলে :

—ভুজঙ্গ! ই যে বেপদের কথা রে। পুরোনো বাঁধ—ঘোঘের বাসায় ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। বান ডাকলেই বেপদ ঘটবে।

বিভূতি মাস্টারও এসেছে।

সেইই বলে—পরশু থেকে মাইথন-পাঞ্চেত ড্যামএ জল ছাড়ছে,

দেখছ না বৃষ্টি! বাঁধে পাহারা লাগাও মোড়ল কাকা; গতিক ভাল লয়!

উদ্দাম-উত্তাল জলরাশি, বিজ্ঞ মোড়লের চোখে ভয়ের ছায়া নামে। ছেলেবেলায় তখনকার দামোদরের খাতে এমনি বন্যা দেখেছে সে। দূরে কাদের চীৎকার শুনে ওরা চাইল।

ওপারের বিস্তীর্ণ জমি, ধানক্ষেত, গ্রাম এর মধ্যেই জলে ভেসে গেছে; ওদিক থেকে দলে দলে লোক মেয়েছেলে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বাঁধের ধার দিয়ে পালাচ্ছে সেই আক্রমণ হতে বাঁচার জন্য।

ওদের মধ্যে থেকে কে হেঁকে বলে—ওদিকে মুণ্ডেশ্বরীর বাঁধ ভেসেছে হে সামলাবে! দেগাঁ, বসন্তপুর, গুপীনাথপুর, বাড়রা, বিবাক চক নির্মূল্।

জলের স্রোত পার হয়ে ওই চীৎকারটা ভেসে আসছে কি সাংঘাতিক খবর নিয়ে। সব জল এই দিক ঠেলে আসবে তাদের গ্রামগুলোর দিকে। বাঁধে চাপ পড়বে—আর জীর্ণ পুরোনো ওই মাটির রেখাটুকু নদীর সর্বনাশা স্রোতের সাপটে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে।

নদী থেকে গ্রামবসত অনেক নিচে।

কথাটা ভাবতেও পারে না তারা। স্তব্ধ নির্বাক ভীত মানুষগুলো কি সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছে।

ভূষণ ঘোষ কোদাল হাতে এসেছিল জমির দিকে—যদি পারে তবে জল কেটে বের করে দেবে ধানক্ষেত থেকে; কিন্তু করার কিছুই নেই। একতল মাঠ—দূর গ্রামসীমা অবধি ক্ষেতগুলো বন্দীজলে ডুবে গেছে। তখনও ধানগাছগুলোর সবুজ মুখ কি অসহায় আর্তিভরে জেগে আছে এতটুকু আলো আর বাতাসের সন্ধানে। হয়তো বাঁচবে ওরা জল নেমে গেলে।

বাঁধের উপর শশীমোড়ল আর অন্য লোকজনকে দেখে এসে উঠল ভূষণ: ওর মুখে চোখে ভয়ের ছায়া নেমেছে।

—খুড়ো ! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে ভূষণ নদীর ওই রুদ্র মূর্তি দেখে।

ভূষণ বলে—এ যে সব্বোনাশ করে দেবেগ ? নদীর গতিক তো সুবিধের লয় ?

শশী মোড়ল চাইল ওর দিকে।

কোনো আশ্বাস সান্ত্বনা সে দিতে পারে না, বুড়ো শশী মোড়ল বলে :

—নদীর খাত তো বুজে গেছে ভূষণা, জল যদি বাড়ে ধরবে কোনখানে ? তখন সব তোড়ে বাঁধ ভাঙবে—তছনছ হয়ে যাবে গাঁ ও সারা চাকলা !

ওরা নদীর বাঁধের মাটি পরখ করছে। ক'দিনের বৃষ্টিতে ভিজে রসে উঠেছে মাটি, পিছনের দিকে বন্দী-জল ঠেলে আসছে। মাটিও নেই—যে বাঁধ বাঁধবে।

মণি বলে—ই যে পাকা কাঁটালের মতো তপ্ তপ্ করছে গো ?

ওরাও তা জানে তাই ভয় পেয়েছে। শশী বলে চলেছে :

—যে যত পারো বস্তা যোগাড় করে রাখো, তালপাতা, বাঁশ, দরকার হলে তালগাছও কাটতে হবে। বাঁধ বজায় রাখতেই হবে।

গ্রামের অবাল-বৃদ্ধ-বনিতাও এসে জুটেছে বাঁধে ; ছেলেগুলো মোচার খোলার নৌকা ভাসাচ্ছে। ওদের ফুর্তি লেগেছে জল দেখে।

বিভূতি মাস্টার ধমকে ওঠে :

—এ্যাই ফট্‌কে ! ওই জলে পড়ে গেলে আর উঠতে পারবি ? সরে আয়।

গিরিশ বেদান্ততীর্থের নাতি ফট্‌কে গাঁয়ের মধ্যে ডানপিটে, পড়া-শোনাতেও ভালো। তার খুব সাধ যায় বেশ খানিকটা সাঁতার কাটতে ওই স্রোতে। আজ দুপুরে চান করবার সময় দলবল নিয়ে নদীতে নামবে একবার ; কি মজাই না হবে !

আপাতত পণ্ডিত মশায়ের ধমকানির চোটে সরে এল ফট্‌কে দলবল নিয়ে।

ওপারের ভীত পলাতক জনতার ভিড় বাড়ছে—ওরা পালাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে ; চলেছে শহরের দিকে আশ্রয়ের সন্ধানে। কাঁদছে কেউ কেউ ওপারের জলে-ডোবা গ্রামগুলোর দিকে চেয়ে। ওগুলো জলে ভাসছে তখন।

মণি দত্ত তাই চেষ্টা করেছিল কিছু দোকানের মালপত্র সরাতে। কিন্তু মরাই ভেঙে এত ধান সরাবে কোথায় ? যা পেরেছে বিক্রি করেছে। আর কিছু ধান-চাল সরিয়ে দিয়েছে গোবিন্দ মুন্সীর দোতলায়। লোকজন লাগিয়ে বাকী মালও সে সরিয়ে ফেলছে।

গোবিন্দ মুন্সীদের অবস্থা এককালে ভালোই ছিল। পুকুর, বাগান, জমিদারী, চকমিলানো দালান—সবই ছিল। দুর্গাবাড়ি, চণ্ডীমণ্ডপ এখনও টিকে আছে। তবে জমিদারীও নেই, গোবিন্দবাবুদের অবস্থাও ধসে পড়েছে। গোবিন্দবাবুর এখন দিন চলে দালালী করে, না হয় পঞ্চায়েত অফিস, ব্লক আপিসে গ্রামের লোকজন চাষীদের কৃষি-ঋণ, গ্রাম্য রাস্তা সংস্কারের টাকা বের করার তদ্বির করে।

পুরোনো আমলের বড় বড় বাড়িগুলো মেরামত অভাবে নোনা ধরেছে, কোনোটায় জল পড়ছে, তারই একটা বাড়িকে সারিয়ে নিয়ে স্কুল তৈরি হয়েছে।

মণি দত্তের মাথায় বুদ্ধিটা খেলে যায়। সে সকাল থেকে কয়েকজন লোক নিয়ে নিজেই মাথায় করে মালপত্র চাল, চিড়ে, গুড়—সবই বয়ে এনেছে গোবিন্দবাবুর একটা ঘরে। তার জন্য অবশ্য ভাড়া কিছু দিতে হবে।

গোবিন্দবাবু ওকে মালপত্র নিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়। গোবিন্দ বলে :

—তাহলে কি বলিস মণে—বান আসবে? এ্যাঁ! আম্মো বাবা কিছু মালঝাল যোগাড় করে রাখি। বুঝলি—ভাত একদিন না হলেও চলবে কিন্তু এই মাল না হলে তো 'ডেঞ্জারাস' ব্যাপার হয়ে যাবে। তা মণে—দে দিকি গোটা পাঁচেক টাকা, ঘরভাড়া তো দিবি—তা ওটা আগাম কিছু ছাড়।

মণির দাঁড়াবার সময় নেই। ততক্ষণে দোকানের মালমসলা, দু'বস্তা ধান-চাল বওয়া হয়ে যাবে। তাই কথা এড়াবার জন্য পাঁচ টাকার নোটটা ফেলে দিয়ে ওই বৃষ্টির মধ্যেই লোকজন নিয়ে আবার দৌড়ল বাড়ির দিকে। সময় থাকতে সে এসব করিয়ে নিতে চায়।

ততক্ষণে বাঁধের গায়ে এসে ওই ঘোলা জল লেগেছে, ধীরে ধীরে বাড়ছে জলসীমা, উঁচু পাটগাছগুলো এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল গলাজলের মধ্যে, সেই গাছগুলোও তলিয়ে যায়, পিছন দিক থেকে মুণ্ডেশ্বরীর বাঁধ ভাঙা জলের চাপ এসে লেগেছে; মাঠ-পুকুর ভাসছে।

গিরিশ বেদান্তভীর্থ ওঠেন ভোরবেলাতেই। ভোর থেকেই তার পুজা অর্চনার পাট সেরে তবে জলগ্রহণ করেন। নিষ্ঠাবান নিরীহ ব্রাহ্মণ।

কাশীতে অধ্যয়ন শেষ করে বেদান্ততীর্থ সেখানেই কোনো রাজ-পরিবারের দেবসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। একমাত্র ছেলে, বাবার মতো সংস্কৃতের ভক্ত ছিল না। চতুষ্পাঠীতে পড়ে নি, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিত্মালয় থেকে পাস করে ওখানেই চাকরি করতো—অবশ্য বেদান্ততীর্থ ছেলের এই ব্যবহারকে ক্ষমার চোখে দেখেন নি। তাঁর ছেলে সংস্কৃতকে এমনি অবহেলা করবে, এটা ভাবতে পারেন নি। ওঁর ছেলে দেবেন বলতো :

—বাবা, দিন বদলাচ্ছে। যুগ বদলাচ্ছে। এখন সেই ভাবেই চলতে হবে।

—তাই সব আচার-ব্যবহার, ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপও করবে না, ম্লেচ্ছ খাদ্য গ্রহণ করবে আমি বেঁচে থাকাকালীন?

ছেলে জবাব দেয় নি। বাবার এই কথায় হেসেছিল মাত্র। বাবার অত্যন্ত সেকেলে মতবাদ আর গোঁড়ামিকে দেবেন সমর্থন করতে পারে নি। তাই দেবেন বাবার একরকম অমতেই বিয়ে করেছিল গরীব কোনো ব্রাহ্মণের মেয়েকে। আগে থেকেই তাকে চিনতো।

গিরিশ বেদান্ততীর্থ সেদিন আঘাত পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী। দেবেন তাঁকে যেন অগ্রাহ্য করেছে সবদিক দিয়ে।

একমাত্র ছেলের এই উদ্ধত ব্যবহারটা গিরিশ বেদান্ততীর্থকে মুষড়ে দিয়েছিল। বার বার তিনি ভেবেছিলেন দেবেন তাঁকে এই অপমান করেছে আর এটা তার ইচ্ছাকৃত। নইলে দেবেন এত কথার পর বাবার মতামত কি নিশ্চয় জেনেছে, আর জেনে-শুনেই তাঁকে আঘাত দেবার জন্যই এই কাজ করেছে।

তাই বেদান্ততীর্থ ছেলের ওখান থেকে সরে গিয়েছিলেন কোনো কথা না বলে। সংবাদ নিয়েছেন—ব্রাহ্মণের মেয়েকেই দেবেন বিয়ে করেছে, পালটি ঘরই তাদের। কিন্তু ওদের সংস্কার শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপার নেই বললেই চলে। কাশীতেই এতদিন ধরে ঘর বেঁধেছিলেন তিনি।

কিন্তু এই ব্যবহারের পর সব ছেড়ে সেই রাজবাড়ির একটা এঁদো ঘরে এসে জায়গা নিয়েছিলেন বেদান্ততীর্থ। রাগ, অভিমান তো ছিলই সারা মনে, তবু ভাবতেন ঈশ্বরের বোধহয় এটা নির্দেশ। তাঁকে এত বড় পৃথিবীতে একাই থাকতে হবে। ক্রমশ এই আঘাতকে সহজভাবে নেবার চেষ্টাই করেছিলেন তিনি।

সেই কারণেই তিনি সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন বাইরে নয়, অন্তরে। বাইরে পেয়েছেন যত আঘাত আর অবজ্ঞা, ততই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে

উঠেছিলেন তিনি। বেদান্ত বলে—মায়া! ওটা ছিল তাঁর অধীত বিদ্যা। সারা জগৎ সেই মায়াতে আবৃত, মায়ার অজানা রহস্যে আবৃত এই জাগতিক সব সত্য, সেই সত্যকে জানতে গেলে মায়া আর মোহকে উত্তীর্ণ হতে হবে।

—দাদু!

ফটিকের ডাকে তিনি নাতির দিকে চাইলেন। ফর্সা। সুন্দর ছেলেটার ডাগর দু'চোখে কি বিস্ময় আর আনন্দ। ফটিক খবরটা এনেছে। ও জানায়।

—মরা নদীর দু-ধার ছাপিয়ে বান এনেছে, উথল-পাথাল ঢেউ, আর ওদিকে গাঁ ঘরবাড়ি সব ভেসে গেছে, ওরা যে যা পারছে নিয়ে এসে বাঁধে উঠেছে, কেউ কেউ পালাচ্ছে শহরের দিকে। শশীদাদু, ভূষণ জ্যাঠাও বলছে জল ইদিকে আসছে। কি মজা হবে, না দাদু? থৈ-থৈ বান ডাকবে। সব ডুবে যাবে।

বেদান্ততীর্থ চমকে ওঠেন—সে কি দাদুভাই? ও কথা বলতে নাই।

ফটিক অবাক হয়—কেন? বেশতো হবে!

বেদান্ততীর্থ কি ভাবছেন। একটা সর্বনাশের ছবি ফুটে ওঠে তাঁর চোখে।

ফটিকের কথা শুনে ওর মা বিজয়াও রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। পরনে সাদা থান, তবু বিজয়ার থান পরার বয়স এ নয়। এখন সারাদেহে ওর যৌবনের ঢল, বেদনার বাঁধ দিয়েও সেই উচ্ছলতাকে আটকে রাখা যায় নি। এই যন্ত্রণাটাও ফুটে ওঠে ওর চোখে-মুখে।

ফটিকের কথায় শুধোয় বিজয়া—বান! বান এসেছে নদীতে? এ দিকে যে বৃষ্টির জল জমে সমুদ্র হয়ে উঠেছে। তারপর বান! আকাশের বৃষ্টিই যে ডুবিয়ে দেবে বাবা? বান এলে তো কথা নেই।

বেদান্ততীর্থের মায়াবাদ দর্শনের পুঁথি আর পড়া হল না, বাস্তববাদ বোধহয় সবচেয়ে তীক্ষ্ণ-প্রখর আর কঠিন ব্যাপার। সব দর্শনশাস্ত্র যা কিছু শ্রুতি-উপনিষদ আছে তাও মিথ্যা হয়ে যায় বাস্তববাদ আর বর্তমানের কাঠিন্যে।

গিরিশ বেদান্ততীর্থ বলেন—অসম্ভব কিছুই নয় মা। তখনও দেখেছি ছোটবেলায় বান হাঁকত দামোদরে, তখন নদী ছিল গভীর আর খরস্রোতা, তার গভীর বুক ছাপিয়ে জল বড় একটা উঠতো না। এখন নদী বলতে কিছু নেই, সব বুজে গেছে, তাই তোড়ে জল ছাড়লে নিচের দিকে এই বিপদ হবেই। দেখা যাক—নারায়ণ কি করেন।

গিরিশ বেদান্ততীর্থ আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। কালো মেঘঢাকা আকাশ, আকাশের নীল আঙিনাটুকু কয়েক পুরু কালো মেঘে ঢেকে গেছে। দমকা এলোমেলো বাতাসও সেই মেঘ স্তরকে সরাতে পারে না, থেকে থেকে বৃষ্টি নামছে। ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি। জানালা দিয়ে দেখা যায় ভিটের নিচে বাঁশ বনের ফাঁক দিয়ে বিস্তীর্ণ মাঠে হাঁটু-কোমরভোর জলের বিস্তার। সামনের আকাইপুর অবধি সব জল, মনে হয় গ্রামখানা জলে শুধু ভাসছে। এমন বন্যা তিনি দেখেন নি —স্রোতও রয়েছে জলে, কচুরীপানার দল টুকরো টুকরো হয়ে স্রোতের আবর্তে ভেসে চলেছে। বদ্ধ পুকুরের সীমায় ওরা দল বেঁধে ছিল—মুক্তির আনন্দে ওরা দলছুট হয়ে যে যে-দিকে পারছে তুফানে ভেসে চলেছে। মেঘের গতিকও ভালো নয়। কে জানে কি হবে ?

বেদান্ততীর্থ বলেন :

—বৌমা, তুমি একটু তাড়াতাড়ি ঠাকুরদের ভোগ রেঁধে ফেল—আমি বরং খবর নিয়ে আসি বাঁধের কি অবস্থা।

ফটিক জল ভেঙে এ-দিকে ও-দিকে ঘুরেছে, মজাই বোধ হয়েছে তার ওই জল দেখে। সে ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে চায় না। ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেছে। সে বলে :

—আমিও যাবো দাদুভাই তোমার সঙ্গে।

বেদান্ততীর্থ বলেন—না, না, বৃষ্টিতে ভিজো না ফটিক। আমি যাবো আর আসবো খবরাখবর নিয়ে।

বৃষ্টি ঝিমঝিম পড়ছে তো পড়ছেই। এই বৃষ্টিতে বুড়ো মানুষ আবার জল-কাদায় বের হবেন দেখে বিজয়া বলে :

—আপনি আবার এ সময় বৃষ্টি মাথায় জল-কাদা ঠেলে কোথা যাবেন? আমিই না হয় গরুর বাগাল ছেলেটাকে পাঠাই—খবর আনতে।

বেদান্ততীর্থ বিপদের গুরুত্বটা জানতে চান নিজে। তাই বলেন :

—না, মা, যাবো আর আসবো। তুমি ভেবো না।

যাবার আগে ফটিককে বলে যান—তুমি জলে নেমো না দাদুভাই।

মা ওকে ততক্ষণে ধরে ফেলেছে। ফটিক এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, যাতে মা ওর মাথায় হাত না দেয়। কারণ এতক্ষণ ধরে পথে-পথে জল ঘেঁটেছে আর মাঝে মাঝে দু'এক পসলা বৃষ্টিও গেছে মাথার উপর দিয়ে। মাকে সেটা জানাতে চায় না। বিজয়া ফটিকের মাথার একরাশ সুন্দর কোঁকড়ানো চুলে হাত দিয়ে অবাক হয়।

—ওমা, এমনি করে জলে ভেজে বাবা? এখুনি শরীর খারাপ করবে। ছিঃ বাবা! বৃষ্টিতে ভিজতে নাই।

ফটিক বুঝতে পারে না সামান্য একটু বৃষ্টিতে ভেজাকে ওরা এতবড় অন্যায় কাজ বলে কেন? চারিদিক জল—কলকল করে স্রোত বইছে, এ সময় ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে কথাটা ভাবতেই বিশ্রী লাগে তার, ছোট ছোট মাছগুলো পুকুর ছাপিয়ে কি মুক্তির আনন্দে উঠে এসে সাঁতার কাটছে, সবাই বাঁধে দৌড়াচ্ছে, এ সময় ফটিকই একলা ঘরে আটকে আছে। ভিজতে পারবে না, সাঁতার কাটতে পারবে না।

ফটিক মায়ের কথায় বলে—কতো জল ছাখো মা। সব্বাই বের হয়েছে। উঃ কি মজা হয় যদি বাঁধ ভাঙে?

বিজয়া আতঙ্কে শিউরে ওঠে সেই সাংঘাতিক ছবিটা কল্পনা করতে। তাই দাবড়ে ওঠে ছেলেকে।

—ওসব কথা বলিস না বাবা।

—কেন মা? বেশতো নদীর ধারে আর যেতে হবে না, আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে নদী বইবে।

—না, না! ওরে নদী যেমন আছে থাক। ও নদী নয়—ও রাক্ষস! সবকিছু গিলে খায়, অনেক খেয়েছে ওই নদী তবু ওর তৃপ্তি নেই, খিদেও মেটে নি।

ফটিক মায়ের দিকে চেয়ে থাকে, দেখছে মাকে। ওর চোখেমুখে কি জমাট ভয়ের কালোছায়া দেখে ফটিক চুপ করে থাকে। মনে হয় কি যেন সাংঘাতিক একটা কথা বলে ফেলেছে সে। যে কথা বলে ফেলেছে সে কথাটা বলা তার উচিত হয় নি।

কালো আঁধার নামা আকাশে ঝড়ের গর্জন ওঠে। নারকেল-গাছের ঝুঁটি ধরে কোনো একটা দৈত্য যেন ওকে উপড়ে আছড়ে ফেলে দিতে চায়। বাঁধের দিক থেকে কাদের চীৎকার-কলরব ভেসে আসছে।

—মাটি আন! ওরে মাটির বস্তা ফেল। তালপাতা নিয়ে আয়। শশীমোড়ল তদারক করছে। কে বলে গলা তুলে:

—ওরে। ওপাশের ওই তালগাছ দুটোই কাট শীগ্‌গীর।

ওরা দলবেঁধে কি একটা সাংঘাতিক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ক্রমশ যেন কোণঠাসা হয়ে আসছে তারা।

আর ওদের চীৎকারে কোনো তেজ-দাপট নেই। কেমন ভয় মেশানো ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে এই চীৎকারে। নদীর দিক থেকে একটানা শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে আসে যেন দিগন্তপ্রসারী কোনো একটা আহত জানোয়ার দুঃসহ যন্ত্রণায় শুধু গোঙাচ্ছে।

বিজয়া বিবর্ণমুখে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। রাতের অন্ধকারে বাঁধের দিক থেকে ওই চীৎকার ভেসে আসে। ওরা বসে থাকে দাওয়ায়। বৃষ্টির জমা জলও ঠেলে এসেছে বাড়ির কাছ অবধি। বাঁধের দিক থেকে চীৎকার ওঠে।

—বালির বস্তা আনো হে!···বাঁধ সামলাবে—এ···এ!···

বিজয়া ভাবছে বুড়ো মানুষটার জন্য, সংসারের ঐ একটা মানুষ এখনও বটবৃক্ষের মতো সবকিছু বিপদ-আপদ থেকে ক'টি প্রাণীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেদিন স্বামীর মৃত্যুর পর বিজয়া একমাত্র সন্তান ফটিককে নিয়ে বিপদে পড়েছিল। বিদেশ বিভূঁই জায়গা চেনা-জানাও তেমন ছিল না। সেই দিনগুলোর কথা আজও ভোলে নি সে।

বিজয়ার নিজের ভয় করে। অজানা সেই ভয়। স্বামীর আপিস থেকে টাকাকড়ি কিছু পেয়েছে, পেন্সনও পায় সামান্য; কিন্তু ফটিককে মানুষ করতে হবে। একলা মেয়েমানুষ সে কি করবে দিশে পায় না। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরমশায়ের সম্পর্কও ছিল না। বাবার কাছেই থাকতে পারেন নি তিনি।

এমনি দিনে বেদান্ততীর্থ আবার গিয়েছিলেন।

বৃদ্ধের একমাত্র সন্তানও পর হয়ে গেছল, হয়তো বিজয়াই বাবা আর ছেলের মধ্যে এই মতান্তরের জন্য দায়ী, নিজেকে দোষী মনে করতো সে। কিন্তু সেই চরম সর্বনাশের দিনে বিজয়া বৃদ্ধকে আসতে দেখে প্রণাম করে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। দু'চোখ ছেয়ে জল নেমেছিল বিজয়ার। ফটিক ডাগর কালো চোখ মেলে দেখছিল ফর্সা ওই বৃদ্ধকে। চাদরের খুঁটে চোখ মুছে বেদান্ততীর্থ বলেন—চোখের জল ফেলো না মা।

বিজয়া কান্নাভেজা কণ্ঠে জানায়—আমাদের চলবে কি করে বাবা? অনেক দোষ করেছি আমি, এ সব বোধহয় তারই প্রায়শ্চিত্ত।

বেদান্ততীর্থ ছেলের দিক থেকে আসা সব আঘাতই সহজভাবে নিতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর যুক্তিবাদী মন নিয়ে। তবু যুক্তির হৃদয়হীন

তীক্ষ্ণতা দিয়ে অন্তরের স্নেহপ্রবণ কোমল সত্তাকে বোঝানো যায় না। তাই চোখে জল আসে।

ওর কথায় বেদান্ততীর্থ বলেন :

—না, না। তা নয় মা। ঈশ্বরের এ বিধানকেও মেনে নিতে হবে। তিনি মঙ্গলময়—তাঁর জগতে জন্মও যেমন স্বাভাবিক, মৃত্যুও তেমনি সত্য। সবই পূর্ণতার প্রতীক মা।

বিজয়া বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে। দীর্ঘ জীবনের বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে অভিজ্ঞতার বেদনায় একটি মর্মসত্যকে তিনি অনুভব করতে চেয়েছেন। এ বোধহয় তারই অভিব্যক্তিসঞ্জাত। বিজয়া সেদিন মানুষটিকে নতুন করে চিনেছিল। দেখেছিল ওঁর অন্তরকে। বৃদ্ধ বলেন :

—দিন ঠিকই চলে যাবে মা। আমারই বা কে আছে? ভেবেছিলাম ছেলেকে মানুষ করেছি, তার দায়িত্ব সেই-ই পালন করবে, আমি এবার মায়া মোহ বিমুক্ত হয়ে নিজের পথেই থাকবো। কিন্তু ঈশ্বরের এ বিধান বোধহয় নয়, তাই আবার অনারব্ধ কর্মকেই তুলে নিয়ে সংসারাশ্রমে ফিরে যেতে হবে। বুঝলে মা—আত্মদর্শনের বোধহয় অনেকখানি বাকী ছিল।

বৃদ্ধ কি ভাবছেন।

ফটিক ভয়ে ভয়ে দাদুর কাছে এসেছে। ওর ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে দাদুকে ধরেছে। নিবিড় শান্ত কি অজানা সুবাস-ভরা ওই ছোঁয়াটুকু বৃদ্ধের সারা মনে সাড়া আনে। বৃদ্ধ ওকে দেখলেন সেদিন।

কোনো ফেলে-আসা গ্রামের ছায়া-সবুজ আলো-আঁধার-ভরা পথে এমনি একটি শিশুকে দেখেছিলেন দীর্ঘ অনেক বছর আগে; চোখে কাজল, পরনে হলুদরঙা ধুতি মালকোচা মারা ; বই দপ্তর হাতে সে ফিরতো পাঠশালা থেকে।

ভাঁট—আমের বোল-এ মিষ্টি গন্ধ মেশানো বাতাসে মিশেছে বাতাবী ফুলের সুবাস।

দূর হতে বহু বছর পার হয়ে আজ এই উদাস হলুদ রোদ-ভরা কোনো অপরাহ্ণ বেলায় সেই ছবিটা ভেসে আসে।

—দাদুভাই! বেদান্ততীর্থ নাতিকে কাছে টেনে নেন।

উষ্ণ কোমল স্পর্শটুকু বৃদ্ধের জ্বালাভরা বুকে শান্তির স্পর্শ এনেছিল সেদিন। বিজয়া দেখেছিল হৃদয়বান ওই মানুষটিকে।

ক'বছর হয়ে গেছে। ওদের নিয়ে কাশী থেকে এই পৈতৃক ভিটেতে ফিরে এসেছিলেন বেদান্ততীর্থ। যেন আবার নতুন করে জীবন শুরু করেছেন গৃহত্যাগী মানুষটি। আজ এই সংসারের তিনিই প্রধান অবলম্বন। আবার ঘর গড়েছেন ওদের নিয়ে।

বিজয়া বৃষ্টিভরা আকাশের দিকে চেয়ে বলে—কোথায় গেল মানুষটা?

ফটিক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে:

—দেখে আসবো? বাঁধে অনেক লোক জমেছে—কতো টিন, বাঁশ, বস্তা, তালপাতা নে গেছে। বিশুদের দুটো তালগাছই কেটে ফেলেছে।

কি যেন উৎসব লেগেছে ছেলেদের। কেউ জাল-পলুই নিয়ে বের হয়েছে, কেউ গেছে বাঁধের ওদিকে। ফটিক ছটফট করছে বাইরে যাবার জন্য।

বেদান্ততীর্থ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফেরেন, কাপড়টা ভিজে গেছে। তাঁর মুখে ভাবনার কালো ছায়া! বিজয়া সেটা দেখেছে।

—বাবা, ওই ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলুন।

বেদান্ততীর্থ বলেন: ওদিককার খবর ভালো নয় মা; কি করবেন নারায়ণ, জানি না।

স্নান করে এসেছি মা, ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করে দাও। তারপর জিনিসপত্র কিছু গোছগাছ করে রাখো মা, বাঁধের গতিক সুবিধে নয়।

বিজয়া ওর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়। জিনিসপত্র গোছগাছ করেছিল সেবার কাশীর সংসার তুলে এখানে আসার সময়। সেদিন ছিল ঘর ভাঙার দিন। এখানে এসে সব ভুলে বিজয়া আবার ঘর বেঁধেছিল। তাই জিনিসপত্র গুছোনোর কথায় ভয় পায় সে।

—কি হবে বাবা? বিজয়া ভীত আর্ত কণ্ঠে শুধায়।

বেদান্ততীর্থ জীবনের অনেক যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কাছে জীবনটা যেন মহীরুহ। কৈশোর যৌবন বার্ধক্যের সঙ্গে সমতা রেখে এর পদক্ষেপ। আসে কিশলয়—যৌবনের পর ফলের সম্ভাবনা আসে, কালের চিহ্ন আঁকা পড়ে এর অন্তরে, বৎসরান্তের কালো দাগগুলো জমে ওঠে সঙ্গোপনে। আসে বার্ধক্য। তারপর আসে ঝরে যাবার পালা। মহীরুহের দিন শেষ হয়।

প্রারব্ধ কর্মের সব দেনা চুকিয়ে একদিন মায়াময় জগৎ থেকে সে হারিয়ে যায়। কিছুদিনের খণ্ড মুহূর্তের এই জীবনের দুঃখ বিপর্যয়-গুলোকেও মেনে নিতে হবে। স্ত্রী গেছে, একমাত্র কৃতীসন্তান, সেও গেছে। এই ঘর কতোবার গড়েছিলেন, ভেঙে গেছে। আবার গড়েছেন।

তাই বলেন তিনি—যা হবার তা ঠিকই হবে মা। তোমার আমার স্বার্থে তো সংসারের গতিরুদ্ধ হবে না।

ফটিক নতুন প্রাণের আবেগে দৃপ্ত। সে বলে ওঠে:

—বাঁধ ভাঙবে নাকি দাদুভাই? কতোখানি জল আসবে?

বিজয়া চমকে ওঠে ছেলের কথায়—ওসব বলতে নাই বাবা!

বেদান্ততীর্থ নাতির দিকে চেয়ে থাকেন, ওর হারাবার কিছুই নেই তাই ও মুক্ত, আর তাঁরা? অনেক নকল বোঝায় জীবনের পাত্র পূর্ণ করেছেন। তাই এতো মায়া—এতো ভাবনা!

সেই কারণে চরম আঘাতকে এড়াবার এই প্রাণান্তকর চেষ্টা করছে সকলেই—তিনিও।

ত্রিদিব মুখুয্যেও বাঁধে এসে হাজির হয়েছেন ততক্ষণে এক হাঁটু এক কোমর জমা জল ঠেঙিয়ে। মাঠের দিক থেকে জল বাড়ছে, জলের কালো রং বদলে গেছে ; লালচে হয়ে উঠেছে এদিককার জলের রং। এই দিক থেকেও নদীর জলের চাপ আসছে। হঠাৎ মুণ্ডেশ্বরীর বাঁধ ভাঙা জল এসে পৌঁছেছে ; আরও বাড়ছে এদিককার জল ; ওই জলেই গ্রাম মাঠ সব ডুবে গেছে। পঞ্চায়েত বোর্ডের পটু কেরানী মোটা থলথলে দেহ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ঃ

—এই জলেই গ্রাম-বসত ডুবে যাবে পেসিডেন মশাই, তার ওপর আবার দামোদর যদি দয়া করেন—তালে তো গেছি রে বাবা ! আর তেমনি লেগেছে হ্যাবতা, যেন আমাশয়ের বাহ্যি ; শ্লা থামার নাম নাই গো।

শশী মোড়লও চেনে ওই জীবটিকে। একা শশী মোড়ল কেন বাগ্দী পাড়া চাষা-পাড়ার তাবৎ মানুষের কাছে, এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের চোখে ওই পটু কেরানী একটি ছারপোকা জাতীয় জীব।

যে কোনো দরকারেই কেউ ওর অফিসে যাক, পটুর মেজাজ দেখতে হবে আগে।

ও বলে—ঘোড়াটা একটু বাঁধ হে ! সরকারী কাজ এ সব, ভাতের গেরাস লয় যে কপাৎ করে গিলে দেবে। হ্যাঁ—কি গো তোমার ? কৃষি লোন ? দরখাস্তের দিন কবে পার হয়ে যেছে—তুমি ঘুমুচ্ছিলে নাকে সরষের তেল দিয়ে ? এ্যাঁ ?

লোকটা হাতজোড় করে অনুনয়-বিনয় করে। পটু কেরানীকে চটাবার সাহস তাদের নেই।

—হেঁই বাবু। জানতাম না।

—এইবার জানো ! কি হে জগদীশ—তোমার ? ও সারের দরখাস্ত ! তা—বাপু ওপর থেকে হুকুম এসেছে আর দরখাস্ত পাঠানো হবে না। মানে "কোটা" যা ছিল সব খতম। বুঝলে না ?

ওরা সবাই জানে পটু কেরানীর পটুত্ব। এরপর শুরু হবে' দরা-দরি আর কমিশন-এর হার। লোকটার স্বভাবই অমনি।

বোর্ডের কেরানীগিরি করেই ক'বছরে শাঁসে-জলে ফুলে উঠেছে।

টেস্ট রিলিফের জন্য সরকার থেকে বাঁধ সংস্কার করানো হয়, রাস্তাও তৈরি হয়। পটু কেরানীর তখন মরশুম পড়ে যায়।

ত্রিদিববাবু সঙ্গতিপন্ন জোতদার, ধানি জমিও তার নামে-বেনামে অনেক। পুকুর বাগান কোনোটারই অভাব নেই। কলকাতায় বড় বাজারে চালু কারবার। সেখানে এক ছেলে কারবার দেখে। ত্রিদিব মুখুয্যে নাকি গ্রামকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তাই এইখানেই জমিজমা আগলে রয়েছে।

কথায় কথায় গ্রামের লোককে বলে ঃ

—এ সব প্রেসিডেন্টগিরি আমার ভালো লাগে না হে। তোমরা চেপে ধরলে তাই হলাম। নালে কি দরকার বলো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে?

ওই রিলিফের হাজার হাজার টাকার কাজ সবই পটু কেরানীর পেটোয়া লোক-জনরাই করে। অবশ্য এই করে ত্রিদিববাবুর মজা দীঘিটা পটু কাটিয়ে গভীর সরোবর করে তুলেছে। কাগজে-কলমে ওটা সাধারণের সেচ পুকুর। ত্রিদিববাবুর দীঘিটার ধারে একলপ্তে বিশ বিঘে ধানিজমি বের করেছে। পুকুরে বড় বড় মাছ হয়েছে— আর ধারের ওই জমিতে পাম্প দিয়ে তাইচুং, আই আর এইট্ ধানের চাষ হয় বারো মাস।

রিলিফের টাকায় ত্রিদিববাবুর জমি চাষ ও দীঘি কাটা হয় আর পটু ফাঁক থেকে বেশ কিছু টাকা সরিয়ে নেয়। তবু ওর এই ছোঁক ছোঁক স্বভাবটা যায় নি।

পটু বোর্ড অফিসের সামনে জমা লোকগুলোর কাছ থেকে দরখাস্ত পিছু একটাকা করে আদায় করে। বলে,

—তদ্বির করতে হবে ব্লক অফিসে হে। বাবুদের ব্যাপার তো জানো না, কিছু পান-টান না খেলে কথাই বলবে না।

পটু কেরানী ওদের কাছ থেকে এইভাবেই দোহন করে।

এটা তার বউনি, তারপর লোন মঞ্জুর হলে আবার কিছু বখরা দাও। পটু কেরানী ওসব দিকে পটু। তার কাছে ওদের কারোও রেহাই নেই।

আর জানে সে ত্রিদিব মুখুয্যেকে কি করে হাত করতে হয়। সেই-ই বলে,

—এবার ভোটে দাঁড়িয়ে পড়ুন মুখুয্যে মশায়, কি হবে ছুঁচো মেরে হাত কালো করে? হতে হয় এম-এল-এ হোন, তারপর সুবিধা মতো দল দেখে কেটে পড়ুন। মন্ত্রিত্ব পেয়ে যাবেন।

ত্রিদিব মুখুয্যে কথাটাকে ফেলতে পারে না। কেউকেটা হবার সাধ তার অনেক দিনের। তাকে এলাকার লোক মানবে। তবু মুখে বলে—কি যে বলো পটু! ওসব মন্ত্রীটন্ত্রী সেজে দরকার নাই হে, এই বেশ আছি।

পটু হাসে। দেখেছে সে মুখুয্যের চোখে কি একটা চকচকে ভাব। এটাকে চেনে সে। পটু ওকে ওই আশ্বাস দিয়ে নিজের কাজ গুছোতে থাকে।

এবার বৃষ্টি নেমেছে ক'দিন ধরে। পটু কেরানী মনে মনে খুশিই হয় এমনি একনাগাড়ে বৃষ্টি দেখে। ধানখেত—জমি ফসল ডুবেছে। পাটের গলাসই জল দেখে পটু খুঁশি হয়। গিন্নী বলে ওর কথায়,

—মানুষের কি হেনস্থা হবে বলো দিকি! বেবাক ক্ষতি হয়ে গেল। তুমি বলছো ভালো হচ্ছে।

পটু কৃষি ঋণের দরখাস্তগুলো বাড়ি এনে বখরার হিসাব করছিল। স্ত্রীর কথায় বর্ষণক্লান্ত আকাশের দিকে চেয়ে হুঁকো টানতে টানতে বলে,

—হোক! আর একটু বেশি করে হোক গিন্নী। মজা জমবে।

গিন্নী এই সর্বনাশের কল্পনায় চমকে উঠে বলে,

—সে কি কথা গো! মানুষের সব গেল—ধান, পাট, এইবার জলবন্দী হয়ে ঘরদোর পড়বে।

পটু হুঁকোটায় জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাণী ছাড়ে,

—পড়ুক! রিলিফের কাজ হবে। আর জানোই তো লাড়ু নাড়লে গুঁড়ো পড়ে, তবু আমাদের হাতে যা হোক কিছু আসবে!

পটু কথা শেষ না করেই আবার হুঁকো টানতে থাকে। গিন্নী শোনায়,

—এ যেন শকুনির জাত। গরুর মরণ হবে—উনি তার হাড় চিবুবেন। মরণ!

কিন্তু সেই চাওয়াটা যে এভাবে পূর্ণ হতে পারে কোনোদিন পটুর তা জানা ছিল না। কলরব শুনে পটু কেরানীও গামছা পরে ছাতি মাথায় দিয়ে বাঁধে এসে উঠেছে—আর ওই মারমুখী নদীর রূপ দেখে শিউরে উঠেছে।

যতদূর চোখ যায় জল আর জল। ওপারের গ্রামকে-গ্রাম ডুবিয়ে আসছে জলস্রোত, লোকজন সব ফেলে পালাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ঘরবাড়িগুলো ওই জলের স্রোতে সশব্দে আছড়ে পড়ছে। ভীত-ত্রস্ত অসহায় মানুষগুলোর হাহাকার আর কান্নার শব্দ ভেসে আসে জলের বুকে। প্রকৃতির ওই রুদ্র মূর্তির সামনে হাজার হাজার সাজানো বাগান নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ভয় হয়। পটু কেরানীই হাঁকডাক করে বাগ্দীপাড়ার লোকদের এনেছে। হঠাৎ সে কেমন অতিমাত্রায় সজাগ গ্রাম সেবক হয়ে ওঠে।

—কই রে লম্বু, অ নিবারণ ছাখ বাবা। বাঁধ তোদের বাঁচাতেই হবে, না'লে বিলকুল ধুয়ে-মুছে যাবে। কই রে লোচন—তোদের

পাড়ার বাবুদের ডাক ! নে—ঝুড়ি কোদাল ধর বাবা। ওরে এ যে সবারই সমান বিপদ রে।

পটু সকলের মনে সেই বিপদের গুরুত্বটা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়,

—পেসিডেনবাবুকে খবর দে, ওই নীমু যা দিকি।

দলে দলে এ-গ্রাম আশপাশের গ্রাম থেকেই লোকজন ছেলেরা এসে জুটেছে। মাটিও নেই। বাঁধের পিছনেও কোমরভোর জল জমেছে—আরও বাড়ছে সেই জল। সব মাটিকে ডুবিয়ে দিয়েছে। তবু তরুণ, বৃদ্ধ এদিক-ওদিক থেকে ঢিবি কেটে মাটি আনাচ্ছে। বস্তায় পুরে সেই ভারী মাটিভর্তি বস্তাগুলোকে বাঁধের গায়ে বাখারি, বাঁশ, শালপাতা দিয়ে আটকে মাটি ফেলছে যাতে খরস্রোতের টানে সেগুলো ভেসে না যায়, চীৎকার করে তরুণবাবু,

—মাটি ! মাটি আনো হে।

তরুণ একাই একশো। বলিষ্ঠ একটি যুবক। কয়েক বছর হল পাস করে এখানে স্কুল মাস্টারি করে। বোর্ডিং-এ থাকে। এ মাটির সঙ্গে—এই গ্রামের দুঃখ-সুখের জীবনের সঙ্গে তরুণ জড়িয়ে পড়েছে। তাই সকলের আগে আজ সেইই ছুটে এসেছে বাঁধে। নিজেই মাটির বস্তা তুলে নিয়ে গিয়ে বাঁধের ভাঙলায় ফেলে—সেই সংকীর্ণ পথটুকুকে বুজিয়ে দিতে হবে।

নদীর ধারে সারা গ্রামের লোক জমেছে ; এরই মধ্যে কোন ফাঁকে মণি দত্ত সরে গেছে। দু'চার জন করে পিছু হটেছে।

—পটু কই হে ? শশী মোড়ল খুঁজছে তাকে।

কার হাসির শব্দ ওঠে ; শশী মোড়ল এই বৃষ্টি মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠেছিল, তবু জলের ঠাণ্ডায় কাঁপুনি লাগে। ওই মেয়েটার দিকে চাইল।

সৌরভীও এসে জুটেছে নদীর ধারে, বৃষ্টিতে ওর শাড়িখানা ভিজে নিটোল দেহে চেপে বসেছে, কপালে চুলের লতিগুলো নরম

গালে জড়ানো—তাতে লেগেছে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জলকণা ; সৌরভীকে দেখে শশী মোড়ল খুব খুশি হয় নি। ও বলে ঃ

—তুই আবার কেনে এসেছিস ?

সৌরভী বলে—দেখছি মোড়ল, তোমাদের মদ্দানি। নদীর গতিক ভালো লয় গো। তাই বলছিলাম—ঘর সামলাও গো। বাঁধ আর লয়।

একটু অবাক হয়ে শশী ওর দিকে চাইল। তারা আর ভদ্দরলোক বামুন কায়েতদের দু-চারজন ছাড়া বাঁধে আর কেউ নেই। সৌরভীর কথাগুলো কঠিন হলেও সত্যি বলে বোধহয়। ওরা নিজেরটাই বোঝে।

নদীর ধারে এই জলকাদায় বৃষ্টিতে মারমুখী গাঁঙ-এর সঙ্গে যুঝে চলেছে মাত্র কয়েকটি মানুষ। বাকী সবাই সরে গেছে।

তরুণবাবুকে চেনবার উপায় নেই কাদা-মাটিতে মাখামাখি হয়ে গেছে। ওই মানুষগুলোর মাঝে সেও দাঁড়িয়ে তদারক করছে বাঁধ-এর কাজ। তখনও আশা ছাড়ে নি তরুণবাবু। সে ডেকে চলেছে ঃ

—তালগাছগুলো ফেল, গোঁজ পুঁতে দাও হে—মাটি আনো।

নিজেই বুক জলে দাঁড়িয়ে মাটি ফেলাচ্ছে। সৌরভী ওর দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটাও দেখছে ওদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম।

সৌরভীও দেখেছে এদের। পটু কেরানীকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে।

শুধু পটু কেরানী কেন এ গ্রামের অনেককেই সে চেনে। গোবিন্দ মুন্সী থেকে শুরু করে মণি দত্ত, ওই বাদল ডাক্তার ও ত্রিদিব মুখুয্যেদের সবাইকে। দিনরাতের, বহু মুহূর্তের ওদের লালসায় বিকৃত ছবিগুলোকে সৌরভী দেখেছে। তার মনের পরতে তাদের সেই বহুবিচিত্র ছবিগুলো আঁকা আছে। মেয়েটা সব দেখে শুনেও নির্বিকার।

সৌরভী তবু ওদের প্রশ্রয় দেয়—দিতে হয়, হেসে কথাও বলতে

হয় ওদের সঙ্গে কিন্তু মনে মনে স্বার্থপর ওই মানুষগুলোকে সে চেনে। তার ঘরে ওদের গতায়াত আছে, রাতের অন্ধকারে ওই সেজে থাকা ভালোমানুষগুলোকে সে দেখেছে তাদের প্রকৃত পরিচয়ে, সেই পরিচয় শুধু বেদনাদায়কই নয়—ঘৃণায় ভরা।

তাই হাসে সৌরভী :

—তোমরা খেটে মরবে, ওরা মজা মারবে গ!

তরুণের দিকে চেয়ে বলে সৌরভী।

—জাড়ে ভিজে কালিয়ে গেইছো যে মাস্টার?

তরুণ মেয়েটির দিকে চাইল। বৈকাল হয়ে আসছে। দিন তবু পার হয় কিন্তু বিপদের সময় এই রাত্রেই।

সারাদিন জল-কাদায় পরিশ্রম করে ওরা হাঁপিয়ে পড়বে, নদী তখনও ক্রমাগত ছোবল মেরে চলবে বাঁধে। ওর ক্ষুরধার জিবের সাপটে মাটিটুকু ধুয়ে-মুছে নিয়ে যাবে—ভেসে যাবে স্রোতের আবর্তে। বিপদ আসবে তখুনিই। চরম বিপদ।

সৌরভীর মায়া হয় ওদের এইভাবে যুঝতে দেখে। বাঁধ রক্ষা করা যেন একা ওদেরই দায়। কোথা থেকে সে এক কেটলী চা আর কয়েকটা কাপ-বাটি যোগাড় করে এনেছে কার বাড়ি থেকে।

—চা খাবেন মাস্টারবাবু?

তরুণ ওর দিকে চাইল। এ সময় চা হলে মন্দ হয় না, তাই হাত বাড়িয়ে দেয়।

—কই! দাও একটু!

আরও অনেকে জুটেছে। শশী মোড়ল এখনও বাঁধে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে সকলে মিলে দু'এক ছিলিম তামাক খেয়ে আবার কাজ করছে ও বলে,

—তামুক যে ফুরিয়ে গেল ভজা?

ভুজঙ্গও তাই দেখছে। এই ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে তামাক না হলে চলবে না।

সৌরভী বলে—দেখছি মোড়ল। তামাক আছে তো নিয়ে আসছি। মেয়েটাও তার সাধ্যমতো এই বাঁধের কাজে এগিয়ে এসেছে। এই ক্লান্ত মানুষগুলোকে সাহায্য করছে।

সৌরভী বামুন পাড়ার দিকে এসেছে তাই। সৌরভীই ওই হাঁটুভোর জল ঠেলে এগিয়ে এসে ওই লোকগুলোর সামনে বলে :

—বলি হ্যাগো পেসিডেন, বলি বাঁধে হানা পড়লে তোমার কোঠা বালাখানা বজায় থাকবে, না? লোকগুলোকে মেরে ফেলবা নাকি?

ত্রিদিব মুখুয্যে ওর চীৎকারে বের হয়ে আসে। সৌরভী গলা থনখনিয়ে ওঠে,

—বলি, অ মুন্সী মশায়, মাল না হয়ে বাঁধে বসেই গেল গা, তবু লোকগুলোন ওতেই জোর পাবে গা। বিড়ি নাই—তামুক নাই, ওদের কি বাপের ছেরাদ্দ আটকেছে? সৌরভী মণে বেনেকে দেখে বলেঃ

—অ দুকানী, তাই বলি দুকানী এত ঘুরঘুর করছে কেনে ইখানে? বাঁধ ভাঙার আগে মাল সামলাছো গ। বলিহারী কি বলিহারী!

মণে বেনে মালপত্তর সামলাচ্ছে। মেয়েটার কথায় একটু থমকে দাঁড়ালো সে। সৌরভীর কথায় জবাব দিলে এখুনি কথা বাড়বে। ওকে পারা দায়। তাই মণি বলে,

—যাচ্ছি গো, বাঁধে যাব বৈকি।

সৌরভী বলে—হ্যাঁ, তাই চলো, হেজাক বাতি দুটো জ্বেলে নিয়ে যেও, আর তামুক, বিড়িও নিয়ে যাবা কিন্তু।

সৌরভীর হাঁকডাকে আর ওর তীক্ষ্ণ কথার ভয়েই মানুষগুলো বাঁধে এসেছে আবার, হেজাক জ্বলছে কয়েকটা, আবছা অন্ধকারে দেখা যায় জলের বিস্তার, সাদা চকচকে জলের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয় মাটি আর নেই। তারাগুলো ডুবে গেছে জমাট মেঘের অতলে—দূর থেকে ভেসে আসে কোনো গ্রামের জলবন্দী অসহায় মানুষের আর্তনাদ, ওপারে যাবারও কোনো উপায় নেই।

—হুঁশিয়ার!

বানের জল বেড়ে চলেছে। এদিকে আবার নেমেছে বৃষ্টি! বৃষ্টির জলে নরম মাটিগুলো ধুয়ে ধুয়ে পড়ছে। দামোদর তখন ফেঁপে-ফুলে সমানে গর্জন করে চলেছে।

ভূষণ বলে—শালোরা বাঁধ দিয়েছে, ক্যানেল করেছে। তা মাস্টার ই যি মরণকল করেছে গো। চাষ করার জল দেবার বেলায় ঢু-ঢু, ডুবোবার বেলায় মূর্তি হ্যাখে কেন্নে নদীর।

তরুণ একটু দম নিচ্ছে। ক্লান্তিতে ছেয়ে আসে দেহ, জলে-কাদায় যেন হেজে গেছে। সামনে থমথমে কি জমাট আতঙ্কভরা নিবিড় রাত্রি; এ রাত্রি কোন বিপদের প্রতীক—সর্বনাশের হতাশায় ভরা এর বুক। তরুণও দেখেছে এইভাবে নদীতে জল আসার পরিণাম কি হতে পারে। কিউসেক দরুনে নয়—হাজার হাজার কিউসেক জল ছাড়তে হচ্ছে প্যানচেত মাইথন থেকে, এদিকে ক্যানেল দিয়ে জল যাচ্ছে—সেই জল ক্যানেলের বাঁধ ছাপিয়ে সারা মাঠ ডুবিয়ে গ্রাম ঠেলে এসেছে, আর দামোদরের পুরোনো খাতও বুজে গেছে, তার পলি মাটি কাটাও হয় না, স্রোতও নেই। ফলে নদীর বুক বুজে গেছে। আর এই জল ধরবার মতো ক্ষমতাও ওর নেই।

তরুণ বলে—কাজ আধখানা করেছে, বাকী আধখানা যদি কাটানো না হয় তবে এমনই হবে প্রতি বর্ষায়।

কলকল্লোল ছাপিয়ে কার গলা শোনা যায়। ছপাছপ করে জল ভেঙে এগিয়ে আসছে। ওর ভরাটি গলার আবৃত্তি শোনা যায়ঃ

—আশার ছলনে ভুলি,
কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে,
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু
পানে ধাই
ফিরাবো কেমনে?

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ঘুচিল না
একি হায়—

জল-কাদায় ভিজে বাঁধে এসে উঠল কিশোরী ধাড়া ; কিশোরী ধাড়া ; ভরাটি গলায় বলে ঃ

—এই যে মাস্টার, বাঃ কেলাস তাহলে এইখানে বসিয়েছো ? কিসের ক্লাস ? ইঞ্জিনীয়ারিং ? আয় বাপ্—সৌরভী দি গ্রেট ! হেসাক জ্বলছে—কলরব উঠছে। ভাবলাম গাওনার আসরই বসেছে —তা বাব্বাঃ একেবারে ভবনদীর কূলে এসে পড়েছি। পাড়ি দিতে আর কতো দেরি হে ?

কিশোরীর কণ্ঠস্বর জড়িত। ঈষৎ টলছে সে। দেখে মনে হয় রীতিমতো মদ গিলে চুরচুরে হয়ে এসেছে নেশায়।

ওটা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। তখন ওকে কেউ চিনতো না। গাঁযের একপাশের একটা একচালা ঘর ছিল ওদের। কিশোরী ধাড়া তখন ইস্কুলে পড়া ছেড়ে গাঁযের যাত্রার দলে জুটে অ্যাকটিং করছে। চেহারা বেশ দশাসই—ফর্সা রং, গলাটাও ছিল ভরাটি।

সেই কিশোরী ধাড়া এখন কলকাতার নামকরা যাত্রার দলের চ্যাম্পিয়ন অ্যাক্টার। ফি রাতে আসরে নামলে একশো একটাকা রেট, তাছাড়া জলপানি, সিঙ্গিল বাসা, আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা থাকে। আর মরশুমের প্রথমদিকে দল ভাঙাভাঙির সময় কিশোরী ধাড়াকে দলে নেবার জন্য তাবড় যাত্রার দলপতিদের পাল্লা লেগে যায় টাকা নিয়ে।

কিশোরী বলে ঃ

—বর্ষার সময় ভাবলাম দিন কতক গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নোব। দুধ-ঘি, মাছ-মাংস খাঁটি একটু পেটে পড়বে, তা ড্যাম বর্ষা যেন আমাশার মতো লেগেছে হে ! বললে মণিদা—বাঁধ ভাঙবে বোধহয়। তালেই তো শ্লা চিত্তির। ব্যাটা নদী যেন দামাল ছুঁড়ির মতো টগ্‌বগে হয়ে উঠেছে হে—রগরগে যৌবনবতীর মতো।

তরুণ ওর দিকে চাইল। কিশোরীর কথাবার্তাই এমনি।

কিন্তু সৌরভী রয়েছে ওর সামনে এইভাবে ওকে কথা বলতে দেখে তরুণেরই লজ্জা করে। তাই বলে :

—বসুন কিশোরীবাবু!

কিশোরী জানায়।

—বসবো কোথা? বসতে আসি নি ভাই। তা সৌরভী দি গ্রেট যখন আছে তখন বাঁধ ভাঙার আগেই ওর চীৎকার শুনতে পাবো, অবশ্যি যদি আবার মাত্রা বেশী না হয়ে যায়। চালাও ভাই। ট্রাই ট্রাই এগেন। ওরে ও ভূষণ, লে বাবা, বিড়ি-টিড়ি, চা-টা অর্গানাইজ কর, এতো দেখছি হোল নাইট প্রোগ্রাম, চা-টা খাস—

কিশোরী আদ্দির পাঞ্জাবির পকেট থেকে দলাপাকানো কয়েকটা পাঁচটাকা দশটাকার নোট্ বের করে দিয়ে আবার বাঁধ থেকে নেমে গেল। জল কাদায় পিছল হয়ে গেছে। পা ফস্‌কে পিছলে পড়ে লোকটা। পাঞ্জাবি পায়জামায় কাদা লেগেছে।

—আহা! ধরতে যাবে ভূষণ ওকে।

কিশোরী উঠে পড়েছে, বলে সে :

—কতো ধরবি ভূষণা? সময়কালে কোন শ্লা শালীই ধরলো না, তাই তো ভেসেই গেলাম। আজ আর ধরে কি হবে বাবা! গো টু হেল। চলি মাস্টার।

লোকটা জলে-কাদায় চলেছে, সৌরভী দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণ ধরে কিশোরীর নাটকীয়ভাবে প্রবেশ আর প্রস্থানটা দেখছিল চুপ করে। মুখরা মেয়েটা চকিতের জন্য কেমন নির্বাক আর স্তব্ধ হয়ে গেছে। ডাগর দু'চোখের কোণে কোণে একটা অব্যক্ত নীরব যন্ত্রণা ফুটে না উঠলেও সেটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

ওই বাচাল মেয়েটাও একটুক্ষণের জন্য কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে। পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে সৌরভীর।

সৌরভী সেই দিনগুলোকে আজ ভুলতে চায়। জলের কলকল্লোল শোনা যায়।

সৌরভী চেয়ে দেখেছিল কিশোরীকে।

কিশোরী ওকে দেখেছে, দু'একটা কথাও বলেছে। কিন্তু সে কথায় আন্তরিকতার ছোঁয়া ছিল না এবং শেষকালের ওই কথাগুলোয় ছিল তীব্র ব্যঙ্গ, আর সেই ব্যঙ্গটা একমাত্র তাকেই লক্ষ্য করে তা সৌরভীও বুঝেছে।

অন্ধকারে বাঁশবনে হাওয়া কাঁপে, ঝর ঝরিয়ে ঝরছে বৃষ্টির জমা জল। আকাশ-বাতাসে হু-হু চাপা কান্নার গোঙানির মতো উঠছে জলের শব্দ; ওই ভয়-জড়ানো শব্দটা যেন অনেকদিন আগেকার কতো নিঃসঙ্গ রাত্রির অসহায় বেদনার তীব্রতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় সৌরভীর মনে।

কিশোরী ধাড়া তখন ভরজোয়ান। বেবশ—রাশছেঁড়া বুনো ঘোড়ার মতোই তেজী আর বেপরোয়া। বাবা-মায়ের কথাও শোনে না, ত্রিদিব মুখুয্যের আড়তে কাজকর্ম করে নামে মাত্র আর সন্ধ্যার পর থেকেই মাতে যাত্রার আখড়া নিয়ে। সুরেলা গলা—গান গাইতে পারে সুন্দর।

সৌরভীর মনে হঠাৎ ওই কিশোরীই সেদিন ঝড় তোলে। সৌরভীর দেহে-মনে উঠল যৌবনের ডাক, বর্ষার ভরা নদীর মতোই দু'কূল ছাপানো যৌবন শাড়ির বাঁধন মানে না। চোখে ওর নেশা জাগে, সৌরভী নিজের দিকে চেয়ে অবাক হয়।

কিশোরীকে সেবার বুড়োশিবতলার যাত্রার আসরে দেখেছিল কোন রাজ্যহারা রাজপুত্রের ভূমিকায়। চারিদিকে বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, নিষ্ঠুর সেনাপতি আর বিশ্বাসঘাতিনী রাজবধূ একটি মানুষকে কেন্দ্র করে এতো জ্বালা-যন্ত্রণা, যৌবনবতী সৌরভীর দু'চোখে উঠেছিল বেদনার ছায়া।

ওই রাংতা জরির পোশাকপরা মানুষটার জন্য মন কেঁদে উঠেছিল,

চোখের সামনে থেকে মুছে গেছল লোকজনের ভিড়, হেজাকের জোরালো আলোয় ভরেওঠা চারদিকের বাঁশবন, মাদার ফুলের তীব্র সুবাস ঢাকা রাতের বাতাসে ওর সদ্যজাগর মন অজানা পথ ধরে রূপ-কথার রাজ্যে হারিয়ে গেছল কোন রাজপুত্রের সন্ধানে, বুকভরা ভালোবাসা আর সমবেদনার উত্তাপ নিয়ে। তন্ময় হয়ে সৌরভী ওকে দেখছে।

—কি লো সৌরভী, হাঁ করে দেখছিস, কানছিস্—মরণ! কি হ'ল গ তোর?

ভূষণের বৌ মিনি পাশেই বসেছিল। মিনিই ওকে কথাটা বলে।

চমকে ওঠে সৌরভী ওর ধাক্কায়, সেই স্বপ্নজগৎ থেকে ফিরে আসে সে। তখন সর্বহারা রাজপুত্র রাজপুরী ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পলাতক।

সপ্রতিভ স্বরে বলে সৌরভী—কই না তো? বেশ গাইছে কিন্তু লয় গ? সোন্দর গায় কিন্তু কিশোরী।

মিনুর দু'চোখে হাসি আর কৌতুকের উচ্ছলতা। বলে সে।

—তা গাইছে ভালোই। মনে ধরেছে বুঝি মানুষটাকে?

—ধ্যাৎ! কি তোর কথা বৌ! মরণ!

সৌরভীর মুখটা লজ্জায় কি একটা বিচিত্র অনুভূতির উত্তাপে টসটস হয়ে ওঠে।

মিনিবৌ হাসছে।

সৌরভীর জীবনে তখন ওই মানুষগুলো ভিড় করে নি। মনকে পশরা সেও সাজিয়ে বসে নি, কুমারীমন নিভৃতে একজনকে কেন্দ্র করেই হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখছিল।

সৌরভী পরদিনই ওকে দেখেছিল খালের ধারে, দুপুরের অলস রোদটুকু বাঁশবনে ছায়া মেলেছে, মাঠের দিক থেকে দু'একটা পাখির ডাক ভেসে আসে, দত্তদের বাগানের দেওদার গাছের পাতায় রোদের মায়াজাল জড়ানো।

সৌরভী মাঠ থেকে মুনিষজনদের মুড়ি দিয়ে ফিরছিল, সামনেই কিশোরীকে দেখে দাঁড়াল বকুল গাছতলায়। চঞ্চল-দুরন্ত মেয়েটা কেমন চুপ করে গেছে, আদুড় গায়ে শাড়িখানাকে ভালো করে জড়াবার চেষ্টা করে সে।

—কি রে? কিশোরীই এগিয়ে আসে।

সৌরভীর কথা কইবার সামর্থ্যটুকুও নেই; ও যেন কাঁপছে। নির্জন ছায়া ছায়া দুপুরে কোন্ দূর নিভৃত স্বপ্নজগতে কোথায় হারিয়ে গেছে সে। ওর দিকে চাইল ডাগর দু'চোখ মেলে। সেই হারানো রাজপুত্র তার সামনে।

সৌরভী এই ভাবান্তরে অবাক হয়েছে কিশোরীও। তার মনেও জাগে চিরন্তন তৃষ্ণা। ও দেখেছিল কালকের আসরে ওই সৌরভীর ডাগর দুটো চোখ, এত লোকের ভিড়েও সে ওকে দেখতে ভোলে নি। হয় তো তার কাছেই এই বেদনাটাকে নিবেদন করতে চেয়েছিল কিশোরী, এ তার বহুদিনের স্বপ্ন আর না বলা কথা।

সৌরভী বলে—কাল সুন্দর মানিয়েছিল তোমাকে আর গেয়েছিলেও খুব জোর।

সত্যিই কিশোরী যেন এইটুকু শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়েছিল।

সেই ভালো লাগার খুশী-খুশী ভাব ফুটে ওঠে তার দু'চোখে, খালের জলে ছায়ার স্নিগ্ধতা; কিশোরীর মনে হয় সে একা—চারদিকে ওর এমনি খর রৌদ্রের নিষ্ঠুর শূন্যতার জ্বালা ওর সৌরভীই সেখানে প্রশান্তি আর স্নিগ্ধতার আশ্বাস আনে। ওর ভালো-লাগাটুকুই তার সব চেয়ে বড় পাওয়া।

কিশোরী বলে—আজ হবে কর্ণার্জুন। কর্ণ সাজবো।

—ও তো কেবল দুঃখের পার্ট গ।

সৌরভী ওর জীবনের দুঃখটাকে জানে। তাই ও মনে মনে চায় আর যেন দুঃখ না পাক ও। তাই সৌরভী বলে:

—দুঃখের পার্ট ছাড়া কি আর কিছুই করতে পারো না তুমি?

সত্যি দুঃখু—দুঃখু ও তো লেগেই আছে দিনরাত। আবার যাত্রাতেও তাই?

হাসছে কিশোরী। সৌরভী তার অজান্তেই ভালো লাগার স্বপ্নরেশটুকু এনেছে তার সারা মনে। কোথায় সুর ওঠে। চমকে ওঠে সৌরভী, কিশোরী তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওই ছেলেটার বাবা মাও নেই। শুধু সৌরভীর কথায় কিশোরী বলে ঃ

—দুঃখুটাকে চিনিরে, তাই তো ওই পার্ট করি। সৌরভীর মনে ওর কথাগুলো গভীরভাবে বাজে, ওর মনে প্রথম সাড়া তুলেছিল সেই ওর ছেলেটাই।

আজ সব কোন দিকে হারিয়ে গেছল। সেই ভালোবাসা-স্বপ্ন-সবকিছু অন্ধকারে মিশেছে।

জলে ডোবা বাঁশবনে দমকা হাওয়ার সাপটে বাঁশপাতাগুলো মর্মর শব্দ তোলে, দুকূল ছাপানো নদীর বুকে ওঠে জলকল্লোলের উন্মাদ কলরব। দীর্ঘ অনেকগুলো বছর পার হয়ে অতীতের বুক থেকে কি হাহাকার ভেসে আসে সৌরভীর আজকের শূন্য জীবনে।

সবই আছে, ওই কিশোরীও আজ প্রতিষ্ঠিত। সৌরভীর নিজের জীবনের খাত বয়ে বহু প্লাবন আর সর্বনাশা ঝড় বয়ে গেছে। সব সুর আর স্বপ্নসাধ কোনদিকে ভেসে গেছে ওই জলপ্রবাহের ধ্বংসযাত্রার পথ বয়ে। সৌরভী সেই বেদনাকে দেখেছে।

আকাশ-বাতাস শুধু দীর্ঘশ্বাসমুখর।

কাদের কান্নার শব্দ ওই দিগন্তপ্রসারী জলের বুকে ভেসে ভেসে আসে। আর্তনাদ উঠেছে অন্ধকারে, এই নিষ্ঠুরতার রাজ্যে।

এখানের বাঁধের দু'দিকে জল জমেছে, নদীর উপরের কোন গ্রামের বাঁধ ভেঙেছে—ওরা শেষ চীৎকার জানাচ্ছে আকাশে আকাশে। সাহায্য করার কেউ নেই—সারা সৃষ্টি রসাতলে যেতে বসেছে। অন্ধকার রাত্রে ওই চীৎকারে এদের বুক কেঁপে ওঠে সর্বনাশা ভয় আর ভাবনায়। তরুণ হাঁক পাড়ে ঃ

—মাটির বস্তা আনো মোড়ল এখানে—এখানে বাঁশ-এর খুঁটিগুলো নড়ছে গো।

—মাটি!

ভূষণ চীৎকার করছে। ওদের একটু ঝিমুনি এসেছে। সারাদিন জল-কাদায় দাঁড়িয়ে লড়াই করে করে তারা ক্লান্ত, তবু বানের জলও বেড়ে চলেছে। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় চাপ চাপ ফেনার পুঞ্জ ভেসে চলেছে তীব্র স্রোতে। ভেসে চলেছে বাঁশ-খড়-হাঁড়িকুঁড়ি, কার যত্নে বাঁধা ঘরকে ওই সবনাশা নদী গ্রাস করে খলখল অট্টহাসিতে দিকবিদিক ভরিযে ছুটে চলেছে। চমকে ওঠে শশী মোড়ল। হাঁকে সে ঃ

—বাঁধ ছাপান দেবে এবার!

কোথায় বাঁধের মুখে মুখে জল এসে লেগেছে। ওরা শ্রান্ত-ক্লান্ত—দমকা হাওয়ার সাপটে খুরধারা জলস্রোত বাঁধ উপচে এদিকে লাফ দিয়ে পড়তে চায় ওই বাঁধনটুকুকে তুচ্ছ করে।

মাটি। ক্লান্ত কর্দমাক্ত মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় যেন আদিম অন্ধকারে হারানো একদল মানুষ নামক জীব—বিরাট সামগ্রিক ধ্বংস আর মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তারা যুঝছে। এই লড়াই-এর ইতিহাস এর নীরব সাক্ষী ওই কলপ্রবাহরূপী রুদ্র দামোদর—ও নদী নয়, যেন যুগান্তের পুঞ্জীভূত অকল্যাণ, অন্ধকারে জনপদ গ্রাস করে মানুষের সৃষ্টি আর স্বপ্নকে ধ্বংস করে।

ওই ছায়া ছায়া অন্ধকারে মানুষগুলো নদীর এই সংহার মূর্তি দেখে শিউরে উঠেছে।

সারা গ্রামের ঘরে ঘরে ঘুম নেই। আতঙ্কের রাত। এদিকে জল জমেছে চারিদিকে। উঠান ছাপিয়ে জল ঠেকেছে দাওয়ায়। সেই সঙ্গে চলেছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—আর ঝড়ের সাপটও রয়েছে।

বেদান্ততীর্থ জেগে বসে আছেন, ঘরে ম্লান হ্যারিকেনের লালাভ আলোয় ওই আতঙ্কের রাত যেন বিভীষিকাময় বলে বোধহয় তাঁর সামনে। তক্তপোশের উপর ফটিক ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্ত আরামে; ঠাণ্ডার রাত; ও জানে না কি সর্বনাশ আসছে সামনে; ওর কাছে এটা মজার খেলাই বোধ হয়েছিল, সারাদিন পালিয়ে জলে জলে ঘুরেছে। এখন সে ক্লান্ত। ঘুমে আচ্ছন্ন। বিজয়া ওর গায়ে একটা কাঁথা চাপিয়ে দিয়েছে। কাঁথার সেই ওমটুকুতে সে আরামে ঘুমুচ্ছে।

বাঁধের দিক থেকে চীৎকার আসে।

—কি হবে বাবা? বিজয়ার মুখ-চোখ শুকনো। ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে তাতে। বেদান্ততীর্থ বৌমার দিকে চাইলেন। তাঁর চোখের সামনে ঘর ভাঙার ছবিগুলো ভেসে ওঠে।

যৌবনে তিনি স্ত্রীবিয়োগের পর এমনি সাজানো সংসার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে পথের টানে হারিয়ে গেছলেন একমাত্র শিশুপুত্রের হাত ধরে। সেদিন মনে ছিল সাহস—দেহে শক্তির অভাব ছিল না, ছিল আত্মবিশ্বাস।

আজ তাঁর সব হারিয়ে গেছে। ওই ফটিকই এ বংশের একমাত্র ভবিষ্যৎ। তাকে আগলে রাখতে হবে এই বিপদের হাত থেকে। আশ্রয়-আহার্য চাই। বুড়োর দু'চোখে অন্ধকার নামে।

তবু অন্তর-মনের জোরটুকু তার মুছে যায় নি। বলেন তিনি:

—ঈশ্বর যা করবেন তাই হবে মা।

রাতের প্রহর জেগে আছে দুটি প্রাণী—যেন মুখ বুজে প্রতীক্ষা করছে সেই চরম বিপর্যয়ের। কখন আসবে সেই আঘাত।

বিভূতি মাস্টার সারাদিন বাঁধে ছিল; লোকজন ডেকেছে—বাঁশ-তালগাছ কাটবার ব্যবস্থা করেছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে।

ঘুম আসে নি মলিনার। জল তখনও বাড়ছে—গোয়ালবাড়ির পিছনের পুকুর ছাপিয়ে জল এসে লেগেছে গোয়ালঘরের ভিতে, মাটি ও জলের ঝাপটায় রসে উঠেছে।

মেয়ের ডাকে ধড়মড়িয়ে ওঠে মলিনা, গোয়ালে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় রয়েছে গরুগুলো, কিছু হয়ে গেলে বন্দীশালায় মরবে ওরা। চামেলি বলে—মা, গোয়ালটা মড়মড় করছে। মা উঠে পড়ে।

চামেলিও মায়ের আগেই উঠে দাওয়া থেকে জলে নেমে এগিয়ে যায়। উঠানের ওদিকে গোয়ালঘরটার দিকে। উঠানে পা দিয়েই হেঁকে ওঠে চামেলি—এতো জল? হাঁটু ছাড়িয়ে জলস্রোত বইছে—পুকুরের দিক থেকে কচুরীপানার জঙ্গল ঠেলে এসে উঠানে ঢুকেছে। সর্বনাশা বৃষ্টি—ওই বুনো জলস্রোত যেন মানুষের বাসই উঠিয়ে নিজেদের দখল কায়েম করতে চায়। তাই মাঝ উঠানে এনে পাহাড় করে জমিয়েছে এঁদো পুকুরের কচুরীপানার দলকে।

অন্ধকারে মলিনার বুক কাঁপে ভয়ে,—গেছো মেয়ে চামেলির কোনো ভয় ডর নেই। আবছা অন্ধকারে ওই জল ঠেলে সে চলেছে গোয়ালবাড়ির দিকে, গরুগুলোর আর্ত চীৎকার কানে আসে। দাপাচ্ছে অসহায় প্রাণীগুলো—চোখে ওদের ভয়ের বিকৃতি।

অন্ধকার ঠাহর হয় না। চামেলি শিকল খুলে ভিতরে ঢুকে ওদের দড়িগুলো খুলতে থাকে—মুক্তি পেয়ে ভীত আর্ত প্রাণীগুলো জলে লাফ দিয়ে পড়ছে বাইরের উঠানে।

মলিনার চীৎকারে বিভূতিবাবুর তন্দ্রা ছুটে যায়। সেও বাইরে আসে, হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় দেখা যায় সারা বাড়ি জলে ভাসছে। গরুগুলো কোন্‌দিকে যাবে দিশে পায় না—দাপাচ্ছে ওই জলে। নই বাছুরটাকে একনজর দেখতে পায়—তারপর আর সেটাকে দেখা যায় না; ওর চীৎকার ভেসে আসে অন্ধকারে। চামেলি বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মড়মড় শব্দটা বেড়ে ওঠে,

মাটির পাঁচিল থেকে চালের বাঁধনগুলো খুলে যাচ্ছে—ছিটকে চলেছে একটার পর একটা। বিভূতিমাস্টার চীৎকার করে ওঠে।

—চামেলি। সরে আয় চামেলি।

চামেলিও কোনোমতে সরে এসেছে। দেখছে ওই সর্বনাশকে। ঘরটা ভেঙে পড়ল। ওর সব চীৎকার ডুবিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড শব্দে গোয়ালবাড়ির মাটির দেওয়ালটা আছড়ে পড়ছে। প্রচণ্ড আবর্ত ওঠে জলে, থই থই করছে উঠান। জলের ঢেউ এসে ঘরের দাওয়ায় উঠে চৌকাঠ ছাপিয়ে ঘরে ঢুকছে।

মলিনা আর্তকণ্ঠে বলে—কি হবে গো ?

চামেলি আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বিভূতি মাস্টার-এর চোখের সামনে শুধু জল আর জল। গোয়ালটা তবু এই ঘরখানাকে জলের স্রোত থেকে আটকে রেখেছিল। সেই ঘরটা পড়ে যেতে ওর ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে বিজয় উল্লাসে জলস্রোত এসে হানা দিয়েছে এই ঘরেও।

বিভূতি মাস্টার বলে।

—সব দেখে শুনে মনে হয় এখনও সময় আছে, চলো মুন্সীদের বাড়িতেই চলে যাই—যা পারি তাই নিয়ে। দেরি করলে যেতে পারা যাবে না।

—এই জল ঠেলে যাবো সব কিছু ফেলে রেখে ? মলিনার সংসারীমন এটা ভাবতেও দুঃখ পায়। তাই ওর সারা মন অব্যক্ত বেদনায় মুচড়ে ওঠে। কি ভাবছে সে।

—বাবু!··· অ বাবু! কে ডাকছে।

বৃষ্টির সাপট আর হাওয়ার গর্জনের মধ্যে ওই শব্দটা শুনে চমকে ওঠে গোবিন্দ মুন্সী। বৃষ্টির রাত। বাঁধে একবার হাজিরা দিয়েই ফিরে এসে আবার ধেনো মদের বোতল নিয়ে বসেছিল।

এটাই তার একমাত্র করণীয় কাজ, নেশাটা জমে উঠেছে। গোবিন্দ মুন্সী আজ সব হারিয়ে ওই নেশাটাকে সার করেছে। কোথাও কোনো নীতির বালাই নেই। বিবেক নেই। সব বিসর্জন দিয়ে ওই নিয়ে সব দুঃখ ভুলতে চায় সে।

চেনা কণ্ঠস্বর। ওই ডাকটা তার অসাড় মনে চকিতের মধ্যে কি সাড়া আনে, ঝাঁপির মধ্যে বন্দী বিষধর সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সেই ঝাঁপির ঢাকা কে তুলে দিয়ে তুবড়ী বাঁশী বাজাচ্ছে। সেই চেতনায় সাপটা যেন চকিতের মধ্যে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে রাতের অন্ধকারে ওই ডাক শুনে।

গোবিন্দ মুন্সীর দু'চোখ জ্বলছে অন্ধকারে কি শ্বাপদ লালসায়।

বৃষ্টির রাত। লোকটা ওই জলবাদলে বের হয় না। এতদিন ওদের দিন চলেছিল পরের স্বত্ব অপহরণ করে। ওরা ছিল মধ্য-স্বত্বাধিকারী জমিদার। এখন ও সব গেলেও স্বভাবটা যায় নি। রয়ে গেছে স্বভাবজাত সব দোষগুলোই। তাই ওরা যখন বাঁধে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে কাদা মেখে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য যুঝছে, গোবিন্দ তখন বাউরীপাড়া থেকে চোলাই মদের হাঁড়ি যোগাড় করে এনেছে, নিজের কাজই গুছিয়েছে।

শীত-শীত বৃষ্টিনামা রাত। গোবিন্দ মুন্সী মদ গিলছে, আর ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছে নদীর ওই বন্যাকে, ওপারের সর্বনাশকে। এককালে ওই সব ছিল তাদের জমিদারী, এখন ব্যাটারা আর মানে না। আগে দেখা হলে গড় করতো, কতোজন আসতো তার কাছে কত কি দরকারে। এখন তারাও বদলে গেছে।

এখন ধান পাট-এর দর পেয়েছে। পয়সা কুড়িয়েছে তারা, আর গোবিন্দ মুন্সীকে চেনেই না। উল্টে মুখের উপর কথা বলে। দরকার হলে তারা দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে যায়।

আজ! গোবিন্দ মুন্সী দেখছে ওরা ডুবছে। ভাসছে গ্রামকে গ্রাম, গোবিন্দ মুন্সী খুশিভরে কলকলিয়ে ওঠে।

—মর শালারা, পাপ—পাপের দাম দিতে হবে না ? ছ্যাখ মজা এইবার।

রাত নামে। অন্ধকার দুর্যোগের রাত। গোবিন্দ মুন্সীর শিরায় শিরায় মদের তৃষ্ণা আর বিকৃতি। নিঃস্ব একটা মানুষ অতীতের বঞ্চিত প্রাচুর্যের মিথ্যা দাপটে গজরায় আহত জানোয়ারের মতো।

আজ যেন শোধ নিতে পেরেছে সে ওদের দুর্দশার। অতীতের সামন্ততান্ত্রিক রক্ত মদের উত্তাপে মাতাল হয়ে ওঠে।

গোবিন্দ মুন্সীর চোখের সামনে হারানো দিনগুলো ফুটে ওঠে, কি উদ্বেল লালসায় বিকৃত কতো রাত্রি, সেই জ্বালাটা মদের নেশার সঙ্গে মিশিয়ে আছে, জড়িয়ে আছে।

—কে ! গোবিন্দ মুন্সী উঠে এগিয়ে আসে।

গোবিন্দ মুন্সীর কানে গেছে ওই ডাকটা। নিশীথের ডাকের মতো সেই আহ্বান ওর সারা মনে আনে নেশার চাঞ্চল্য ; সৌরভী ডাকছে তাকে।

—বাবু! বাবুমশাই'গ

এমনি কতো বৃষ্টিঝরা রাতে আসে ওই স্বৈরিণী মেয়ের দল। গোবিন্দ মুন্সীর সারা দেহে শিহর জাগে। আজও এই দুর্যোগের রাতে এসেছে মেয়েটা। গোবিন্দ খুশী হয়েছে।

দরজা খুলতেই সৌরভী বৃষ্টির ঝাট আর ঝড়ো হাওয়ার কনকনে ভাব এড়িয়ে উষ্ণ ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

গোবিন্দ মুন্সী দেখছে ওকে।· আলোর আভা পড়েছে সৌরভীর সারা দেহে। ভিজে শাড়িটা ওর নরম পুরুষ্ট গায়ে চেপে বসেছে, পুরুষ্ট মাংসগুলো হর্তেলের মতো আভা নিয়ে ঠেলে উঠেছে। নিটোল মাংসল হাতদুটো অনাবৃত। সৌরভীর দেহে যৌবনের ঢল, আর মুখখানা এখনও কাঁচা। বৃষ্টিতে পানপাতার মতো মুখখানা সজীব সবুজ আর কোমল।

গোবিন্দ মুন্সী বলে :

—শীতে কাঁপছিস যে—নে দু'ঢোক গিলে নে। শরীরটা তরতাজা হয়ে উঠবে। যুত পাবি গা-গতরে।

গোবিন্দ মুন্সী দেখছে মেয়েটাকে। সৌরভী অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। চারিদিকে সর্বনাশা ধ্বংস এগিয়ে আসছে। দিকে দিকে কতো লোক নিরাশ্রয় হয়ে গেল,—বানে ভেসে গেছে তাদের সব কিছু ; ঘর-বাড়ি ধান আর মাথা গোঁজার ঠাঁইও নেই। সারা গ্রাম ডুবছে—আর ওই গোবিন্দ মুন্সীর দু'চোখে মদের নেশা, ওর সারা মনে কি দুরন্ত লালসা। সৌরভী ঘৃণা ভরে শোনায়।

—বাবু!

গোবিন্দ মুন্সী অন্ধকারে ক্ষেপে উঠেছে। সৌরভীর দিকে এগিয়ে আসে। ওর হাতটা ধরে টানছে।

সৌরভীর সারা মনে আতঙ্ক আর ঘৃণার ছায়া ফুটে ওঠে! ওর কণ্ঠস্বরকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। ও বলে ঃ

—বাবু। কি গো তুমি? মানুষ? ওরা ডুবছে—

হাসছে গোবিন্দ মুন্সী, রাতজাগা শেয়ালের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে। ওর জিব দিয়ে লালা ঝরে।

—থাম তুই। ডুবুক শালারা। বুঝলি সৌরভী মজা লুটে লে। জাহান্নামে যাক ব্যাটারা।

—খবরদার। মেয়েটাও রুখে দাঁড়িয়েছে। ওর মনে হয় গোবিন্দের মতো লোকদের কাছে পৃথিবীর আর কিছুর কোনো নামই নেই। সৌরভীর কাছে এটা অসহ্য বোধহয়। বলে সে—তুমি মানুষ না আর কিছু?

জবাব দিল না গোবিন্দ মুন্সী।

লোকটা তত বেশীমাত্রায় ক্ষেপে উঠেছে। মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরতে যায় সে,—ওর জীর্ণ দেহের শিরায় শিরায় কি মাতন জাগে।

সৌরভী এসেছিল যদি এখানে কোনো তেরপল পাওয়া যায় তার

খবর নিতে। বাঁধে দাঁড়িয়ে ওরা ভিজছে। তবু একটু ছাউনী হবে। ওরা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবে।

কিন্তু এখানে এসে সৌরভী চমকে উঠেছে। লোকটা খ্যাপা কুকুরের মতো এগিয়ে আসছে তার দিকে; সৌরভীর বুনো সত্তা কঠিনতর হয়ে ওঠে। সে গর্জাচ্ছে।

—বাবু! খবরদার এগোবে।

হাসছে গোবিন্দ।

—এ্যা! সতীপনা! ছিনেল মাগী কিনা দাম বাড়াচ্ছিস? নে—নে! গোবিন্দ মুন্সীর টাকার অভাব? এমন কতো রাখ্নী রাখতে পারি এখনও, জানিস? মরা হাতী হলেও সওয়া লাখ টাকা। সৌরভীর সামনে টাকা কয়েকটা ছিটিয়ে দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসে। সৌরভী গর্জে উঠে। বেশ চড়া স্বরে সে বলে ঃ

—দরজা টো ছাড় বাবু!

হাসছে লোকটা।

শক্ত হাতে ওকে ধরে ফেলেছে। চকিতের মধ্যে সৌরভী সারা শক্তি দিয়ে ওর নাকেই একটা প্রচণ্ড আঘাত করেছে। তবু লোকটা দুর্বার হয়ে ওঠে।

গোবিন্দ মুন্সীও ওকে ধরে ফেলেছে, সৌরভীর দম বন্ধ হয়ে আসছে। অন্ধকারে একটা দানব যেন কি প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে পিষে শেষ করে দেবে। ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে সৌরভী।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় ভেজানো দরজাটা খুলে যায়—ওই হাওয়ায় ভেসে আসে শত শত মানুষের কাতর আর্তনাদ। সারাদিনের সংগ্রাম প্রচেষ্টা সব শেষ হয়ে গেল। ওরা হেরে গেছে সর্বনাশা দামোদরের কাছে। তারা চীৎকার করে।

—বাঁধ গেছে···এ···! হুঁশিয়ার—বাঁধ গেলো···ও···ও!

হাহাকারভরা ওদের সেই প্রাণ-কাঁপানো চীৎকারটা নৈশ অন্ধকারের বীভৎসতাকে খান খান করে দেয়। ঘোষণা করে আগামী সর্বনাশের।

ওই ডাকে চমকে উঠেছে গোবিন্দ মুন্সী।

সৌরভীও তার উদ্যত হাত থামিয়ে এক লাফে দরজার বাইরে এসে পড়েছে। সারা গ্রামের লোক—আবালবৃদ্ধবনিতা চীৎকার করছে। রাতজাগা পাখিগুলো গাছের ডাল ছাড়িয়ে উঠে পড়েছে—তারাও চীৎকার করছে। বাতাসে ওঠে মত্ত নদীর ক্রুদ্ধগর্জন। সারা নদী লাফ দিয়ে বাঁধের বাঁধন তুচ্ছ করে গ্রামের উপর হানা দিয়েছে। যেটকু এখনও টিকেছিল সে সব অস্তিত্বকেও মুছে ফেলবে এইবার ওর প্রচণ্ড আঘাত।

ঝিমুনি এসেছিল তরুণের। তখনও সমানে বৃষ্টি ঝরে চলেছে টিপ টিপ করে, রাতের নিথর নির্জনতার বুকে ঝড়ো হাওয়ার মাতন বেড়ে ওঠে। ছাপাছাপি নদীর জল বাঁধ গড়িয়ে পড়বে, ঢেউগুলো ফুলে ফেঁপে এসে হানা দেয় বাঁধে কী দুর্বার আক্রোশে; তরুণ মাস্টার চমক ওঠে।

—মাস্টার মশাই গ!

ভূষণ আর্তনাদ করে। ঢেউ-এর আবর্ত এসে বাঁধের সামনে ঘূর্ণি তুলেছে। একটা শব্দ করে সামনের বেশ খানিকটা মাটি—বালির বস্তাসমেত ভুস করে অতলে তলিয়ে গেল।

বাঁধের মাটি এইবার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

জলস্রোত এসে হানা দেয়। এদের সব চেষ্টা যেন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তবু যুঝছে তারা। তরুণ হাঁপাচ্ছে একটু দম নিচ্ছিল সে। ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসে তার সারা দেহ।

হেজাকগুলোর বিবর্ণ আলোয় মনে হয় বিরাট নদী ওই আঘাতে মত্ত হয়ে আবার ছুটে আসছে। তরুণ হেঁকে ওঠে:

—মোড়ল! শীগ্‌গীর এদিকে।

শশীও হকচকিয়ে ছুটে এসেছে। ততক্ষণে নদীর খরস্রোত একটা

তাল গাছকেই ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ওরা সকলেই ছুটে আসে। শেষ চেষ্টা করছে তারা।

বস্তা—টিন—তালপাতা এসেছে।

নিষ্ঠুর নদী যেন লুকোচুরি খেলেছে, এবার আঘাত হেনেছে বাঁধের অন্যদিকে ; ভিজে মাটির বিরাট একটা অংশ বাঁধের গা থেকে ফাট ধরে নেমে গেল জলে।

তরুণও চমকে ওঠে।

বাঁধের উপরই দাঁড়িয়েছিল সে, মনে হয় তার পায়ের নিচের মাটি দেবে যাচ্ছে। ও জানে আর রক্ষা নেই—তাদের সব প্রচেষ্টাকে নিষ্ঠুর নদী হারিয়ে দিয়েছে। ধ্বসছে—ধ্বসে যাবে এইবার বাঁধ এক নিমেষের মধ্যে, মাটি কাঁপছে তাই।

চীৎকার করে তরুণ।

—পালাও, পালাও মোড়ল। বাঁধ আর রাখা যাবে না। পালাও—হুঁশিয়ার।

ওর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ ওঠে, ছিটকে পড়ে মাটির বস্তা—টিন—বাঁশগুলো, জয়ধ্বনি ঘোষিত করে নদী এইবার লাফ দিয়ে পড়ে জনপদে। ভীত ত্রস্ত মানুষগুলো আর্তনাদ করছে রাতের অন্ধকারে।

ওরা দৌড়চ্ছে, ঘর-বাড়ি সবই যাবে। লোকজনদের নিয়ে তবু একটু নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে। ওদের আর্তনাদ সারা গ্রামের মানুষের কানে পৌঁছে গেছে।

দিক থেকে দিগন্তে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় সেই বাঁধ ভাঙার খবর। জলস্রোতের গর্জন ওদের চীৎকারকে মুছে দিতে চায়।

মত্ত উল্লাসে দামোদর বাঁধের মাটিটুকুকে গ্রাস করে এগিয়ে এসেছে রুদ্র সন্ন্যাসীর মতো। বহু দিন বহু বৎসর পর সে আবার ফিরে এসেছে কোন পার্বত্য-গুহা থেকে ধ্বংসদূতের মতো মানুষের গ্রামবসতে হানা দিতে।

আহত মুমূর্ষু জানোয়ারের মতো থেকে থেকে কাকচ্ছে অসহায় মানুষগুলো ; কেউ কেউ আগে থেকে সাবধান হয়েছিল। তারা গ্রামের উঁচু ঢিবিতে, না হয় ইস্কুলবাড়ি কিংবা গ্রামদেবতায় মন্দির চত্বরে ঠাঁই পেয়েছে। অনেকে এখনও রয়ে গেছে ধ্বসে পড়া বাড়ির খড়ের চালে। ওদের চারিদিকে জলস্রোত—কেউ বা উঠেছে কাছাকাছি কোনো গাছে। রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়া অসহায় মানুষগুলো আতঙ্কে নিবাক হয়ে রাত্রি শেষের প্রহর গুণছে আলোর সন্ধানে। তারা ওইভাবে যেখানে পেরেছে বসে আছে হয়তো দিনের বেলায় তাদের কেউ উদ্ধার করে নিয়ে যাবে এরই আশায়।

ভূষণ বাঁধে থেকে শেষ চেষ্টা করেছিল। বাঁধ ভাঙার আগে সে বাড়ি ফিরে যাবার সময় পায় নি। ভূষণ মিনু আর ছোট বাচ্চাকে নিয়ে খড়ো বাড়ির চালে এসে উঠেছে। বৃষ্টি এসেছে আর বাঁধ ভাঙা জলস্রোত দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে।

—খোকন কাঁদছে যে।

মিনু খোকনকে নিজের দেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। ছোট্ট বাচ্চাটার তবু ঠাণ্ডা লাগে। হয়তো খিদেও পেয়েছে। ভূষণ তখন বুঝতে পারে নি কতখানি ক্লান্ত সে। সারাদিন বাঁধে দাঁড়িয়ে মাটি কেটেছে, বস্তা বোঝাই করে ফেলেছে নদীর খাতে।

ভেবেছিল যেভাবে হোক এ যাত্রা টিকে যাবে বাঁধ ; ওপাশে বাঁধের নিচে তার একলপ্তে সাত বিঘে ধানের খেত, লকলকে সবুজ ধানগুলো মাথা তুলেছে। ফসলও হবে এবার ষোলআনা। তাদের মায়াতেই বাঁধে পড়েছিল। কিন্তু কিছুই হয় নি।

হাতগুলো টাটাচ্ছে। সারা দেহে ব্যথা বোধহয়। ভূষণ বাড়ির কোনো কিছুই সামলাতে পারে নি হঠাৎ বাঁধ ভেঙে যেতে কোনো রকমে এসে বাড়ি পৌঁছেছিল। তখন আর অন্য কোথাও যাবার উপায়

নেই। তার বাড়ির ওপাশ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। তাড়াতাড়িতে চালে উঠে বসেছে। মিনু বৃষ্টিতে ভিজছে।

—শুকনো কাপড়ও নাই গ! ভিজতে হবে?

ভূষণ নির্বাক হয়ে বসে আছে। জলের স্রোতে চালাটা কাঁপছে। মনে হয় সে বোকা; একবারও তার নিজের বৌ-ছেলের কথা মনে হয় নি।

বুঝতে পারে সেও ক্ষুধার্ত।

কিন্তু খাবারও নেই—সামান্য চাল ছাড়া। খিদেটাই অসাড় হয়ে গেছে। নিস্পন্দ হয়ে গেছে তার সব অনুভূতি। মিনুর ওই কান্নাও তার কানে আসে না। শূন্য দৃষ্টিতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষটা চেয়ে আছে—কি দেখছ তাও জানে না। শূন্য দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে শুধু জল আর জল—বাতাসে জাগে কলকল্লোল।

সকাল থেকেই নেমেছে আবার বৃষ্টি, এ বৃষ্টি প্রথম আষাঢ়ের কালো পুঞ্জ মেঘের বুকঝরা অমৃতআশ্বাস মাখা স্নিগ্ধতা আনে নি, মাটির বুকের অতল থেকে তৃপ্ত ধরিত্রীর দীর্ঘশ্বাসও আনে নি এই বর্ষণধারা; তৃণাঙ্কুরের বুকে—নতুন দিনের আলোমাখা বীজধানের স্নিগ্ধতাকেও বিকশিত করে তোলে নি সজীবতার স্বপ্নে।

এ বৃষ্টি এসেছে ধ্বংসের প্রতীক হয়ে, প্লাবনের সঙ্গী হয়ে।

আবছা আলোয় কি বিভীষিকাময় দেশের ছবিটা ফুটে ওঠে। মৃতের রাজ্য। বাতাসে জেগে আছে বাঁধ ভাঙা দামোদরের বিজয় উল্লাস, বাঁধটা ভেঙে গেছে এদিক থেকে ওদিক অবধি, হানামুখ দিয়ে অর্ধেক নদীর জলস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

পাখিগুলোও আজ ভোরে কলরব করে না, ওরা বোধহয় অনেকেই উড়ে গেছে কোথায় সবুজের দেশে, কাকগুলো জলে ভাসমান গরু না না হয় অন্যকিছুর উপর বসে ভেসে চলেছে আর ঠোকরাচ্ছে। বীভৎস সেই বিকৃত মৃত-দেহটাকে ঘিরে ওরা ভোজ লাগিয়েছে।

মাঝে মাঝে গাছগাছালি আর গলা অবধি জলে ডোবা বাড়িঘর—

—এখানে ওখানে দুচারটে মানুষ নামক জীবের অস্তিত্ব, এই নিয়েই গ্রামের পরিচয়টুকু মাত্র টিকে আছে।

—দাদু! কত জল দেখেছো? একটা গরু মরে ভেসে চলেছে। ওটা কি দাদু? ছাখো!

এ দৃশ্য এর আগে ওরা কেউ দেখে নি। তাই কৌতূহলী চোখ মেলে ফটিক চীৎকার করে চলেছে। বেদান্ততীর্থ চুপ করে বসে আছেন।

সন্ধ্যার পরই তিনি এসে উঠেছিলেন ত্রিদিব মুখুয্যের বাড়ির লাগোয়া ইস্কুলের বাড়িতে। জায়গাটা গ্রামের মধ্যে সব থেকে উঁচু। ওপাশেই গোবিন্দ মুন্সীদের বাড়ি। এককালে গড়ের মতোই ছিল, মাটি দিয়ে উঁচু করা এই বিরাট ঢিবির উপর কয়েকখানা বড় বড় বাড়ি, ওপাশে গ্রামদেবতার মন্দির। বুড়োশিব-এর আটচালা; সামনে স্কুলের মাঠ। কিছু গাছগাছালি।

তারপরই শুরু হয়েছে জলের সীমানা; এই জায়গাটায় এখনও জল ওঠে নি। তাই যারা পেরেছে ঘরবাড়ি ছেড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে ইস্কুলে—মুন্সীদের পরিত্যক্ত কাছারি বাড়ির ঘরগুলোয়, না হয় বিরাট আটচালায়। কেউ বা ওই ফাঁকা মাঠেই তালপাতা দিয়ে ঘরমতো করেছে।

লোকজনের ভিড়ে জায়গাটা ভরে উঠেছে। কিছু গরু-বাছুরও এসে আশ্রয় নিয়েছে। খাবার নেই—কিচ্ছু নেই। গরুগুলোর ডাগর কালো চোখে জমাট আতঙ্কের ছায়া। মাঝে মাঝে ওরা শূন্যে মুখ তুলে ডাকছে।

ফটিকের চোখেমুখে সেই আনন্দের আভাসটুকু মুছে গেছে। ভীতকণ্ঠে বলে ওঠে ফটিক:

—একটা মানুষ ভেসে চলেছে দাদু! মরে গেছে? কেমন ফুলে উঠেছে।

—আঃ ফটিক। জলের ধার থেকে সরে এসো।

বেদান্ততীর্থ ওকে ডাকছেন।

ফটিক দাত্বর ওই কথায় ফিরে চাইল। সহজ মিষ্টি কণ্ঠস্বর এ নয়—কি বেদনায় জমাট আর কঠিন এই কথাগুলো সেটা ফটিকও বুঝতে পেরেছে। তাই সরে এল চুপ করে। এসব তার দেখতে ভালো লাগে না।

ফটিকের খিদেও লেগেছে। প্রথম প্রথম এই জলস্রোত দেখতে তার ভালোই লেগেছিল। তারপর দেখেছে সারা গ্রামের অবস্থা ; মানুষগুলো বানে ভাসা খড়কুটোর মতো এদিক ওদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। সব হারিয়েছে। তাদের বাড়িঘরও সব ডুবে গেছে।

মায়ের কান্না দেখে ফটিকের চোখে জল এসেছিল কাল। বুড়োদাত্ব শীতে কাঁপছে। মনে হয় একরাত্রেই দাত্বর চোখমুখ বসে গেছে। ওই বুকজলে কোনো রকমে পুঁটলি, সামান্য জিনিস আর কিছু পুঁথিপত্র আর শালগ্রামশিলা সম্বল করে ওরা এসে উঠেছে এইখানে।

ফটিকের খিদেও পেয়েছে। বেলা হয়েছে—ত্বধও নেই। রাঙি গাইটার কথা মনে পড়ে। ফটিকের ত্ব'চোখ জলে ভরে ওঠে। গাইটাকে খুলে দিয়েছিল ওর মা ; অন্ধকারে গরুটা লাফ দিয়ে জলে পড়েছিল—আর কোনো খবরই জানে না তার, হয়তো ওই স্রোতে ভেসে গেছে।

—মা। ফটিক মাকে ডাকছে।

ভিড় ঠেলে ফটিক দোতলার একটা ঘরে এসেছে। ওরা এইখানে রয়েছে আপাতত। হাঁড়ি, থালাগুলো বোঁচকা বাঁধাই রয়েছে। ওপাশে গাদা করা পড়ে আছে দাত্বর পুঁথি। শালগ্রামের ছোট্ট সিংহাসনটা রয়েছে একপাশে। আর আনতে পেরেছে খান ত্বয়েক কম্বল—ত্বচারটে কাপড়-চোপড়। ব্যস—এই তাদের সম্বল।

বিজয়া ছেলের দিকে চাইল। ফর্সা টুকটুকে ছেলেটার মুখে যেন

কালো কালি জমেছে। প্যান্ট জামাও ময়লা—ভিজে ভিজে। তার একমাত্র সন্তানকেও সে এট্টুকু আশ্বাস দিতে পারে নি। হারিয়ে গেছে তাদের সবকিছু। কালিঢালা আকাশ থেকে তখনও বৃষ্টি ঝরছে—বাতাসে ওঠে সেই জলকল্লোলের শব্দ।

—বৃষ্টিতে ভিজিস না বাবা!

বিজয়া ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে ওর মাথা মুছিয়ে দিয়ে বলে—মুড়ি-টুড়ি চাট্টি খা!

জললাগা মিয়ানো মুড়ি, চাল চাল হয়ে গেছে। তাই চাট্টি দিল ওকে। বিজয়ার দুচোখ ছেয়ে জল নামে। দুধও নেই—গরুগুলোও কোথায় হারিয়ে গেছে। কে জানে অকূল পাথারে খানিকক্ষণ ভেসে থেকে তারপর ডুবে গেছে না হয় ভেসে গেছে।

ফটিক বলে—আমরা বাড়ি কবে ফিরবো মা?

ওর জবাব দিতে পারে না বিজয়া। কবে জল নামবে কে জানে। তবু বলে সে:

—জল কমলেই আমরা ফিরে যাবো।

কিন্তু ঘরবাড়ি আর নেই। মাটির দেওয়াল পড়ে গেছে। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জানে না। সামনে দুর্গাপূজো—তাও এবার ভাসিয়ে দিতে হবে। এসব খবর ফটিক জানে না।

শূন্য রিক্ত—সর্বনাশের বেদনায় বিকৃত কোন্ ভবিষ্যতের দিকে মা আর ছেলে চেয়ে থাকে, দু'জনের চোখে জল উপচে আসে।

—মা! ফটিক খেতে পারে না।

খাওয়া ফেলে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে সে। ফুলে ফুলে ওঠে ছোট শিশুর দেহটা কি অসহায় কান্নায়। সেও বুঝেছে তাদের সব কিছু হারিয়ে গেছে। বিজয়া ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দেয়:

—ছিঃ কাঁদে না। আবার বান কমে যাবে, আমরা বাড়ি ফিরবো।

ফটিক দুদিনেই এই বেদনাকে অনুভব করেছে। এর থেকে মুক্তি পেতে চায় সে। তাই ওই ঘরে ফেরার কথায় মায়ের দিকে চাইল।

বিজয়া ফটিকও স্বপ্ন দেখে তাদের সংসারের আগেকার ছবিটার। বিজয়া বলে চলে ওকে কাছে এনে।

—গরুগুলোও ফিরে আসবে। দাওয়ার নিচে লেবু গাছে বড় বড় লেবুগুলো পাকবে—শিউলি ফুল ফুটবে; ভোর রাতের শিশিরে তলা বিছিয়ে পড়ে থাকবে সাদা সাদা ফুলগুলো। পুজোর ঢাক বাজবে—

বিজয়ার কণ্ঠস্বর বুজে আসে—ওই স্বপ্ন নিয়ে সেও কাঁদছে। প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেও পারে না। দু'চোখ বেয়ে জল নেমে আসে।

বেদান্ততীর্থ ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বিজয়ার কথাগুলো তিনিও শুনেছেন।

ওই শিউলি কাশফুল ফোটার জগৎ আজ মিথ্যা হয়ে গেছে—ভরে উঠেছে কোন বিভীষিকায়; তবু কোনোকালে তা সত্যি ছিল। আজকের বিষণ্ণ আশ্বিন সেই পরিচয়টুকু হারিয়ে ফেলেছে।

তবু এই মোহ নিয়েই ওরা বেঁচে থাকবে।

থ্যানথ্যানে গলার কর্কশ শব্দ ওঠে।

—মর! মর যমতরা আঁটকুড়ির ব্যাটারা। জাতজন্ম কিছুই রাখলি না? এত পাপ মা বসুন্ধরা সইবে কেনে লা—তাই তো মরছিস সব্বাই।

মণে বেনের মা ময়না বুড়ি চীৎকার করছে। ওপাশের একখানা ঘর জুড়ে তার রাজ্য। ও সময় থাকতে অনেক মালপত্র সরিয়ে এনেছে। ঘর বোঝাই হয়েছে তাতেই।

খাবার জল বলতে এই চত্বরে দুটো টিউবওয়েল। চারিদিকে জল, কিন্তু সে জল বিষাক্ত। তা খাওয়া যায় না। এত লোক এখানে

এসে জমেছে—নামোপাড়ার বাগ্দী, বাউরীরাও এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের জন্য ঘর আর কুলোয় নি। ওরা ওই বৃষ্টির মধ্যেই আটচালায় পড়ে আছে—কেউ কেউ তালপাতা এটা সেটা দিয়ে খেলার মাঠের ধারে ছাদন করে পড়ে আছে।

ওদেরও খাবার জলের দরকার। টিউবওয়েলে এসে ভিড় করেছে। ময়না বুড়ি চান করছে তো করছেই। না শুচিবাইগ্রস্ত বুড়ির সারা দেহ-মন থেকে পাপের ময়লা ধুতে অনেক জল লাগে।

পটলা বলে :

—অ দিদিমা, এত যদি চান করবার সখ, তালে চলো টিবির নিচে ঠেলে দিই—ভেসে ভেসে একেবারে গঙ্গায় গিয়ে পড়বে।

বুড়ি ফোঁস করে ওঠে ঃ

—কোন মুখপোড়ারে ?

পটল ওর কথায় প্রতিবাদ করে ঃ

—তাই বলে আর কেউ খাবার জল নেবে না ? দিনরাত চানই করবা তুমি ?

বুড়ি লাফ দিয়ে ওঠে।

—বুঝলি, তোদের মতো রিফুজী হয়ে আসি নি। গোবিন্দ মুন্সীকে কড়কড়ে টাকা গুণে দিইছি। দিনরাত কলে থাকবো। ভাড়া দিইছি। মাগ্না আসি নি।

পটলার মেজাজও চড়ে ওঠে ওইসব কথায়।

এমনিতে লোকটা সুবিধের নয়। আশেপাশের মানুষগুলো এ ক্ষেত্রে তবু বুড়ির মেজাজের প্রতিবাদ করে।

আর ব্যাপারও অনেক দূর গড়ায়, লোকগুলোও মরিয়া হয়ে উঠেছে ওই বিপদে। সব গেছে তাদের। তাই বোধহয় ভগবানের উপর জমে ওঠা রাগের জ্বালাটা মানুষের উপরই ঝাড়তে আসে। পটলা ধাক্কা দিয়ে ওর কলসীটা সরিয়ে দিয়ে নিজের বালতিটা বসিয়ে গর্জায়।

—একটিকথা বললে তোমাকে তুলে ওই বানের স্রোতে ফেলে দোব।

—এ্যাঁ। এতবড় কথা! বুড়ি লাফ দিয়ে ওঠে।

শেষকালে পটু কেরানী এসে ওদের ঝগড়াটাকে সামলায়—যেতে দাও দিদিমা।

নিতু ডাক্তারও এসে পড়ে। বলে সে :

—আজ সবাই আমরা সমান হয়ে গেছি খুড়িমা, সকলের কথাই ভাবতে হবে। যাও।

বুড়ি অবশ্য এত সহজে যাবার নয়। সেও তখন নীতিজ্ঞান আর ভবিষ্যতের ধ্বংসের নির্দেশ দিতে দিতে সরে গেল।

অবশ্য মণে বেনে জানে ওদের তার কাছেই আসতে হবে। তাই মায়ের ওই হেনস্থাটা দেখে মুখে কিছু বলে না। বলে,

—যাও মা! কি আর করবে বলো।

বাগ্দীপাড়ার পটল তখনও ফুঁসছে। লোকটা মাথা ঠাড়ো আর গোঁয়ার।

সারাদিন কাল বাঁধে খেটেও কিছু করতে পারে নি। সবই গেছে—তাই যেন রাগটা তার পড়তে দেরি হয়।

তাছাড়া পটল গ্রামের মানুষগুলোর চেয়ে সবদিক থেকেই নিজেকে বুদ্ধিমান বলে ভাবে। লোকটা কৌশলী আর ফিকিরবাজ। লম্বা চেহারা—মাথার সামনে খানিকটা টাক মতো; কয়েক বছর আগে সে যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিল। সেই সুবাদে পাঠানকোট জম্মুর ওদিক ছিল, পরে ও চাকরিও তার বরাতে সয় নি।

পটলা বলে—যুদ্ধে জিতে গেলাম। ব্যস, তাই চলে এলাম। দরকার হয় আবার যুদ্ধে যাবো।

লোকে অবশ্য অন্য কথা বলে। পটলার নাকি হাতটান স্বভাব। সে মিলিটারীতে গিয়েও ওই সব ছ্যাঁচড়ামি করেছিল। ফলে চাকরি গেছে। পটলার মিলিটারী আমলের বিবর্ণ কয়েকটা প্যাণ্ট জামা রয়ে গেছে। আর আছে দুটো মেডেল; কোথা থেকে কিভাবে সংগৃহীত তা গ্রামের লোক জানে না। পটলা সেই মেডেল দুটো

সেপটিপিন দিয়ে জামায় ঝুলিয়ে মাঝে মাঝে হাটতলায় যায় আর পাকিস্তানী যুদ্ধের সময় একাই যে বাজিমাৎ করেছিল সেইকথাই শোনায় আশপাশের গ্রামের লোকদের কাছে।

সে ভাবে তার নিজের একটা পদমর্যাদা আছে এদের কাছে। বাগ্দীপাড়ার লোকজনের কাছে পটলা একজন মাতব্বর। তাই আজকের জল নেবার ব্যাপারে পটল এইখানে ওদের নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে। যুদ্ধ জয় করে খুশী হয়েছে সে। কে বলে,—বুড়ি এক লম্বর শয়তান হে, বেশ করেছো পটল।

পটল মিলিটারী কায়দায় ওদের থাকা-টাকার ব্যবস্থা তদারক করছিল।

সে বলে—বুঝলে। কারো দাপট আমি সহ্য করি না। সেবার ক্যাম্পে মেজর সাহেব হুকুম দিলেন—বড়কা খানা বন্ধ। সবাই মন-মরা। আমি সটান গিয়ে সাহেবকে স্যালুট করে বললাম, ই—ক্যায়সে হোগা সাহেব? কুছ কসুর হ্যায় তো ও জওয়ানকো কোর্ট মার্শাল করো? বড়কাখানা কাহে বন্ধ্ হোগা?

পটল যুদ্ধের গল্প ফেঁদেছে, আর সেও যে একজন কেউকেটা ছিল সেইটাই জানাচ্ছে।

হঠাৎ সৌরভীর হাসির শব্দে ওরা ফিরে চাইল। দজ্জাল মেয়েটাও শুনেছে ওর কথা। পটল হাসির শব্দে ওর দিকে চাইল।

সৌরভী বলে ওঠে—বাপ মারে নি টিকটিকি তার ব্যাটা গুলন্দাজ। কি পটলা, খুব তো বীর, তা কাল সন্ধ্যা থেকেই তো পালিয়ে এসেছিস শুনলাম বাঁধ থেকে। সেখানে তো তোকে দেখলাম না? এখানে জুটে এখন থেকেই বখেয়া পাকাচ্ছিস?

সৌরভীর কথায় অনেকেই হাসি চাপবার চেষ্টা করে।

পটলা ফোঁস করে ওঠে—কে বললে? এ্যাঁ? লড়ে এলাম। পটলা অনেক গুলী-বোমা-ট্যাঙ্ক দেখেছে, এতো তুচ্ছ। তাই জানায় —একহাত লড়ে এলাম তো।

সৌরভী হাসছে। ওর আদুড় গায়ে শাড়িটা অগোছালো।

পটলা বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটার দিকে ওর নজর অনেকদিনের। ভেবেছিল সৌরভী ও তার এই সব বীরত্বের কথা শুনে একটু সহজ হবে। কিন্তু মেয়েটা মহা ধড়িবাজ। পটলা সরে গেল।

—চল হে, রিলিফ-টিলিফের ব্যবস্থার দরকার। ব্লক অফিসার কোথায় দেখি। না হয় প্রেসিডেন্টকে ধরতে হবে।

কাদের চীৎকার শুনে ওরা চাইল। বাগ্দীপাড়ার বিশে, গয়ানাথ আরও দু'চারজন এগিয়ে আসে ঢিবির ধারে। ওর নিচে থেকেই জলের শুরু। স্রোত বয়ে চলেছে। সামনের বাঁশবন—ডোবা—পুকুর আর চেনার উপায় নেই পথটা ঢেকে গেছে, বোধহয় সাঁতার জল ওখানে।

এদিক-ওদিক থেকে দিনের আলোয় কাদের চীৎকার ভেসে আসে গয়ানাথ দৌড়ে যায় জলের দিকে। ও হাঁক পাড়ে।

—শীগ্‌গির, শীগ্‌গির পটলা—এ্যাই বিশে! নেমে পড়—লোক-গুলোকে ধর, ভেসে যাচ্ছে যে।

ঝপ ঝপ শব্দে গামছা সামলে বিশে আর গয়ানাথ আরও দু' একজন লাফ দিয়ে পড়ে জলে।

পটলা অবশ্য ওসব ভেজালে নেই। সে হাঁটুজল অবধি নেমে চীৎকার করে। টান—জোরে ধর! দড়িটা।

তরুণ মাস্টার ইস্কুলের কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে সকাল থেকেই বের হয়েছে ওই জলের মধ্যে। আশপাশের কলাগাছ কেটে ভালো করে বেঁধে ভেলা করেছে তখুনিই। আর ত্রিদিববাবুর আখের গুড় জ্বালানী বড় কড়াইও বের করেছে তারা। গোলমতো কড়াইগুলোর দুপাশে খড় বেঁধে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে; ওরা তাই দিয়ে এখান ওখানে জলবন্দী মানুষগুলোকে উদ্ধার করে আনছে।

গুড়ের বড় কড়াই-এ বসানো ছেলেমেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে ওরা

আসছিল। প্রবল স্রোত বয়ে চলেছে—ওই স্রোতে কড়াই ঠিকমতো বেয়ে আনা যায় না, তবু আসছে তারা।

তেমনি একটা কড়াই কিছু লোকজন সমেত স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। ওরা সেটাকে সামলে রাখতে পারছে না, একপাশের খড় খুলে গিয়ে কড়াইটা স্রোতের টানে লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে চলেছে।

ওপাশেই বুড়ো শিবের দীঘির জলে তো তুফান চলেছে। ওরা কোনোমতে একটা বাঁশকে আকড়ে ধরে চীৎকার করছে। ফেরবার পথ নেই—সামনে দীঘির বিস্তারে পড়লে তলিয়ে যাবে ওটুকু আশ্রয়।

মেয়েছেলেগুলোও চীৎকার করছে। ঢিবি—ওই বাড়িগুলোই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। ওরা আসছিল ওইখানেই। তরুণ পিছনের ভেলা থেকে লগি মারতে মারতে দেখেছে ব্যাপারটা। সে হাঁক পাড়েঃ

—একটা দড়ি। দড়ি ছুঁড়ে দে ওদের দিকে।

বিভূতি মাস্টার—চামেলি—ত্রিদিব মুখুয্যে—গোবিন্দ মুন্সী আরও অনেকে ওই ঢিবি থেকে দেখছে, ওরাও ভয় পেয়ে গেছে। সামনে একটা চরম সর্বনাশ ঘটতে চলেছে।

—হেঁই বাবা বুড়ো শিব। রক্ষা করো বাবা!

কে আর্তনাদ করে। মানুষগুলো চরম বিপর্যয় আর নিশ্চিত মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছে।

তবু ওই স্রোতের মধ্যে সাঁতরে চলেছে গয়ানাথ—বিশে আর তরুণ। চামেলি শিউরে ওঠে। ত্রিদিববাবুও এসে পড়েছে।

দড়িটাও ধরে ফেলেছে ওরা, কোনোমতে টেনে স্রোতের উজানে ওই হতভাগ্য মানুষগুলোকে নিরাপদ আশ্রয়ে আনল। ঠাণ্ডায় হিম-জলে মানুষগুলো কাঁপছে।

মৃত্যুভয়ের ব্যাপারটা চুকতে ত্রিদিব মুখুয্যে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তার ভাবনা ওই লোকগুলোর জন্য নয়, বড় কড়াইটার জন্যই।

সে বলে—কড়াইটা ডুবতো আর একটু হলেই। এ্যাঁ পঞ্চাশ টাকা জলে যেতো! একটা কড়াই এর দাম জানিস বাবা?

সৌরভীও ভিড়ের মধ্য থেকে জবাব দেয়:

—কড়াইটার কথাই ভাবলা পেসিডেন? মানুষগুলোর পরানের দাম বুঝি নাই? ধন্যি যা হোক—কত টাকা খাবা গ? হেঁই বাবা!

কথাটা পটুর গায়ে লাগে। হুজুরের সম্বন্ধে এসব কথা ভালো লাগে না তার।

পটু কেরানী ধমকে ওঠে বিরক্তি ভরে—তুই থাম দিকি? সব তাতেই তোর কথা!

—গায়ে লাগলো বুঝি গ! সৌরভী হাসছে খলখলিয়ে।

হঠাৎ ঐ জলে ভেজা লোকগুলোকে আবার বেরুবার জন্য তৈরি হতে দেখে শুধায় সে—আবার যাবেন নাকি মাস্টার মশাই?

তরুণের অবসর নেই। ভোর থেকেই সে কিছু ছেলেদের নিয়ে ওই ভেলা আর কড়াই সম্বল করে বের হয়েছে। যেভাবে হোক ওই বানে ভাসা মানুষগুলোকে বাঁচাতে হবে।

একদলকে এখানে পৌঁছে দিয়ে আবার বের হচ্ছিল তারা। সৌরভীর কথায় তরুণ জবাব দেয়—যেতে হবে বৈকি। এখনও অনেক লোক আটকে আছে এখান ওখানে। ভূষণদের সগুষ্ঠি উঠে আছে চালের উপর। ঘর পড়লেই ওরাও ভেসে যাবে, ওদিকে বেনেপাড়া—মোড়লপাড়ার অবস্থাও তাই।

গুপী বলে—ভূষণের বাড়ির কাছে তো নদী বইছে গ! যাবার কোনো পথই নাই।

তরুণ জানায়:

—তবু ওখানে যেতেই হবে গুপী। দড়ি বেশী করে নে। দুটো তিনটে কড়াই ভেলা পর পর যাবে ওদিকে।

সৌরভী বলে—একটুন চা খেয়ে যাও। আমি এখুনিই আনছি'গ, আর দু'গাল মুড়ি পাইতো আনবো।

মেয়েটা দৌড়ল।

তরুণের কাল রাত্রি থেকে কিছুই খাওয়া জোটে নি। পরিশ্রমে ভাবনায় আর হিমজলে ওরা কাঁপছে। একটু চা হলে ভালো হোতো।

মণে বেনের গুটকি বৌটা এরই মধ্যে উনুন ধরিয়ে একটা বড হাঁড়িতে গরম জল চাপিয়ে চা বিক্রি শুরু করেছে কুড়ি পয়সা কাপ দরে। জলে ভেজা লোকগুলোর অনেকেরই চা জোটে নি। ওরা বাধ্য হযে তাই কিনছে নগদ পয়সা দিয়ে।

সৌরভী একটা মগ হাতে এগিয়ে আসে—চা দাও দিকি—চার কাপ।

—পয়সা দে! মণে বেনে ওকে দেখেই ফ্যাঁচ করে ওঠে।

সৌরভী ওকে একটা আধুলিই বের করে দেয় খুঁট থেকে। মণে বলে—আটআনা? চার কাপের দাম আশি পয়সা। পয়সা ফ্যাল —নিয়ে যা।

সৌরভীর চোখের সামনে ওই জলে ডোবা লোকগুলোর কথা মনে পড়ে। এই বিপদে ওরা জীবনপণ করে লোককে বাঁচাচ্ছে—তুলে আনছে কত জায়গা থেকে, আর সেই বিপদের সুযোগ নিয়ে মণে ব্যবসা করে চলেছে।

সৌরভী বলে—আর পয়সা নাই গ! দাও—ওদের একটু চা দিই। দেরি করো না। ওই লাও। লোকগুলোন জলে জলে কালিয়ে গেছে। আবার বেরুচ্ছে, একটু চা পেলে ভালো হয়।

মণে দত্ত ঐ সব ধর্মকর্ম বোঝে না। মণের মা-বুড়িই জবাব দেয়,

—দাও বললেই কি দেওয়া যায় লো?

এমন সময় পটু কেরানীকে আসতে দেখে মণে দত্ত ওই চাতালের সামনের ভিড় সরিয়ে বলে,

—বসেন গো কেরানীবাবু। চা সেবা হোক একটু ?

পটু অবশ্য সেই মতলবেই এসেছিল। সৌরভীর দিকে চোখ পড়তে বলে,

—তুই এখানেও এসেছিস ?

মণে শোনায় ঃ

—শুধু এসেছে ? বলে কুড়ি পয়সা চায়ের দাম বড্ড বেশী নিছো। বলেন কেরানীবাবু আপনিই বলেন, কতো মেহনতের জিনিস ; তাছাড়া এই ডাওরিতে চা-চিনি-দুধ—জোটে কোথাও ? এত কষ্টে লোকের উপকার করবো তাও কথা শুনতে হবে ?

সৌরভী বোধহয় জবাব দেবার জন্য মুখিয়ে উঠেছে, কিন্তু দেখে তরুণবাবুরা চায়ের জন্য অপেক্ষা না করে আবার ওই জল-বৃষ্টিতে ভেলা নিয়ে বের হয়ে গেল।

সৌরভীর মনে হয় মণে দত্ত যেন শয়তান, ওর সবতাতেই ব্যবসার চেষ্টা ; পটু কেরানীকে বেশ ঘন করে দুধ দিয়ে ভালো চা এক কাপ এগিয়ে দেয় মণি।

সৌরভী শূন্য ঘটি হাতে ফিরে গেল। মণে খদ্দের হাত ছাড়া হতে দেখে শুধায়।

—চা নিবি না ?

সৌরভী জবাব দেয় ঃ

—না। চায়ের আর দরকার নাই। যাদের জন্য চা নিতে এসেছিলাম তারা আবার চলে গেল জলেজলেই। ওই যে গ। ওদের জন্যেই এসেছিলাম।

—মণে ভাসমান ভেলাগুলোর দিকে চেয়ে দেখে। একটু কোথাও যেন বাধে ওর। সৌরভী বলে,

—বান হয়ে দেশরাজ্যি ডুবে যেয়ে ওদের হয়েছে জ্বালা, আর লাভ হয়েছে তোমাদেরই গ। বেশ কামাচ্ছো দু'পয়সা।

পটু কেরানীই আগ বাড়িয়ে বলে—বড় মুখ তোর।

—তাই ছাখেন কেরানীবাবু। মণে দত্ত পটু কেরানীর কাছেই বিচার চায়।

সৌরভী অবশ্য রায়টা শোনার জন্য দাঁড়ায় না, চলে গেল সে ঠমক তুলে।

মণি দত্ত এরই মধ্যে ছোটখাটো দোকান সাজিয়ে ফেলেছে। বৃষ্টি নামতে কি ভেবে মণি দত্ত মালপত্র ওরই মধ্যে শহর থেকে এনেছিল। আর তারপরই এই ব্যাপার বেধেছে। তাই দরও আকাশে তুলেছে সে। গিরিশ বেদান্ততীর্থকে দেখে সে চাইল। ওর কথায়,

মণি শোনায়—চিড়ে! চিড়ে কিন্তু চার টাকার কমে দিতে পারবো না খুড়ো মশাই।

গিরিশ বেদান্ততীর্থ কাল থেকেই খান নি। এই সময় রান্না করারও কোনো উপায় নেই। তাছাড়া উপকরণেরও অভাব। সাত তাড়াতাড়িতে প্রাণ নিয়ে নাতি বৌমার হাত ধরে বের হয়ে এসেছেন সামান্য কিছু জিনিস নিয়ে। তাই ভেবেছিলেন এ-বেলাটা চিড়ে দিয়ে সারতে হবে। কিন্তু দর শুনে হকচকিয়ে যান। অস্ফুট কণ্ঠে বলেন তিনি ঃ

—চার টাকা! দু'টাকার জায়গায়—চার টাকা ? বল কি মণি ? এতো দর বাড়িয়েছো ?

মণি দত্ত অন্য কাউকে জবাবই দিতো না। বেদান্ততীর্থ গ্রামের সম্মানী লোক, তার বেলা দর কমানোর ব্যাপার দূরের কথা, জবাব দিচ্ছে এই ঢের, এমনিভাবেই মণি জানায় ঃ

—এর কমে পারবো না খুড়ো মশাই। বেশী মাল তো নেই।

পটু কেরানী দেখছে গিরিশ বেদান্ততীর্থকে, লোকটা নিজের গুমোর নিয়েই থাকে। আজ তার এই অবস্থা দেখে পটুও খুশি হয়েছে।

বেদান্ততীর্থ কি ভাবছেন।

নাতি ফটিকের, বৌমার কথা মনে পড়ে। ওরাও উপবাসী

রয়েছে। নিজের তবু উপবাস দেওয়া অভ্যাস আছে। তাছাড়া মনে হয় যেভাবে জীবন শুরু করেছিলেন—তার শেষ পাদ যে এত যন্ত্রণা আর ক্লান্তিতে ভরে উঠবে এ কথা সেদিন কল্পনাও করেন নি। বৃদ্ধের দু'চোখে জমাট বেদনার ছায়া নামে। শুকনো গলায় বলেন বেদান্ততীর্থ অনেককষ্টে :

—দাও। আধ কেজি দাও। আর একপো গুড়। তারপর দেখা যাক কি হয়।

সামনে ওদের নিশ্চিত উপবাস।

পটু কেরানী আশ্বাসের সুরে বলে—কাল পরশুর মধ্যেই রিলিফ এসে যাবে খুড়ো মশাই। তরুণই বলছিল ও নাকি এস-ডিওকে খবর পাঠিয়েছে।

বেদান্ততীর্থ ওর দিকে চাইলেন।

বললেন তিনি—অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে দিনাতিপাত করতে হবে? ভালো।

বেদান্ততীর্থ জীর্ণ চাদরের খুঁটে চিড়ে গুড় নিয়ে চলে গেলেন ওই লোকভর্তি ঘরগুলোর দিকে।

মণি দত্ত তখন খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত।

—চাল! ডাল আছে গ!

কে শুধোয়—আলু পেঁয়াজ?

মণি দত্তের এমন মরসুম বিশেষ মনে পড়ে না। দু'গুণ থেকে তিনগুণ দাম তুলেছে। তাই বিকিয়ে যাচ্ছে, পড়তে পাচ্ছে না। মণির মেজাজটা ভালোই আছে।

পটু কেরানী গলা নামিয়ে বলে—এক কেজি সরষের তেল' দিবি মণে।

এক কেজি সরষের তেলের এখনকার দর দশ-বারো টাকা; কিন্তু সস্তায় ওকে দিতেই হবে। তাই মণি পটু কেরানীকে শোনায় :

—তা দিচ্ছি বাবু। তবে রিলিফের নৌকা যদি আসে ডোমজুড়

থেকে কিছু মালপত্র গস্ত করে আনতে হবে গ। একটু বলে দেবেন। নাহলে এসব আনবো কি করে ?

অর্থাৎ তিনগুণ লাভের বাজার থাকতে থাকতে মণি কমিয়ে নিতে চায়।

পটু কেরানী বলে—তা হবে। মালপত্র আনাতে হবে বৈকি। আমি বলে দোব। দে দিকি তেলটা !

জলের ধারে ধারে দাঁড়িয়ে লোকজন কলরব করছে। ওদের হাতে লাঠি, বাঁশ, কোঁচ ! পুকুর, দীঘি, বিল ভেসে গেছে ; ভেসে আসা পুরনো বড় বড় রুই কাতলা মাছগুলো ওই খোলা জলে দাপাচ্ছে। মাঝে মাঝে চিতেন দেয় তীর-ভূমির কাছে এসে বড় দু'একটা মাছ।

ওরা কলরব করে—ওই যে। ওই !···ওই খানে !

দমাদ্দম লাঠি পড়ছে জলে, কে ধারাল কোঁচ-এর ফলা দিয়ে বিরাট মাছটাকে গেঁথে ফেলেছে। মাছটা দাপাচ্ছে, ভিড় জমে যায়।

কেউ অন্য একটা মাছের পিছনে হানা দিয়েছে। বড় মাছটা কোঁচের ফলায় গাঁথা পড়ে দাপাচ্ছে।

ওরা কলরব করে।

—কই রে। দেখি ! কতো বড় মাছ !

পটু কেরানীও ভিড় ঠেলে গিয়ে হাজির হয়েছে। গোবিন্দ মুন্সীও এসেছে। তার দিন ভালোই চলেছে।

গোবিন্দ বলে,

—মাছ ভাজাটা মন্দ খাচ্ছি না হে পটু ! অন্য সময় বলে কিনা দশটাকা কিলো—এখন ? লে মাছ ! অবশ্যি তেল অভাবে স্রেফ রোস্ট করেই চালাচ্ছি।

গোবিন্দ মুন্সী টেনে টেনে হাসছে।

—মাছের ছড়াছড়ি। ছাখ কতো মাছ।

—খাস নি ! খাস নি বাবা ! এতো মাছ খাস নি্। বিমল ডাক্তার হাঁ হাঁ করে ওঠে।

বিমল ডাক্তার ঢুকছে হন্তদন্ত হয়ে। নামোপাড়ার পাশেই তার বাড়ি। সেই স্থান বর্তমানে জলের তলায়। এইখানে এসে উঠেছে ; ডাক্তারী পাস করার ব্যাপারে সে নেই, নিজেই বলে।

—আমি বাবা হ্যামার ব্রাণ্ড। হাতুড়ে হে।

কিন্তু লোকটা এমনিতেই ভালো—সাতে-পাঁচে নাই। হোমিও-প্যাথির জয়গান প্রচারেই ব্যস্ত। ওই যেন তার জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান।

বিমল ডাক্তার বলে—পেট নামবে বাছাধনরা। রোজ রাত্রে এক ডোজ করে নাকস্ থার্টি নিদেন খাবি।

গোবিন্দ মুন্সী ততক্ষণে একটা মাছ হাতিয়েছে। সে বলে ওঠে ঃ

—নাকস্-এর বাবাকে জয় করেছি ডাক্তার। ভাইনাম প্যাডি। দেখো দু'ঢোক পেঁদিয়ে—রাজ্যিসুদ্ধ হজম করে ফেলবে। ওসব নক্স ফক্স কিচ্ছু লাগবে না।

বিমল ডাক্তার খুশী হয় না। লোকগুলোর কোনো কাজই নেই। এই বদ্ধ দ্বীপের মতো ঠাঁইটুকুতে আটকে পড়ে তারা এখন মাছের নেশায় সব হারাবার শোক ভুলেছে।

—ওই যে। দাপাচ্ছে হে।

ওই ভিড়ের মধ্যে ফটিকও এসে জুটেছে। তার নজর মাছের দিকে।

অনেকেই মাছ ধরছে, সেও যদি একটা পায় ভালোই হয়।

কদিনে ছেলেটার দেহের বর্ণ অনেক ম্লান হয়ে গেছে। চুলে তেল জোটে নি। উস্কোখুস্কো হয়ে গেছে মাথাটা। ঠিক মতো খাবারও জোটে নি কাল থেকে। ফটিককে দেখে চেনা যায় না। বিশ্রী হয়ে উঠেছে ওর চেহারা দুদিনের মধ্যে।

একটা মাছ! ওটা আজ তার খাবারই হবে। ফটিকের খিদে আর ইচ্ছে দুটোই বেড়ে উঠেছে।

হাঁটুজলে মাছটা সোজা এসে পড়েছে, ফটিকও জলের মধ্যেই ধরে ফেলে সেটাকে। ছোট হাত দুটো ওর কানকোর মধ্যে ঢুকে গেছে। দাপাচ্ছে মাছটা ; ফটিকও সামলাতে পারে না বড় মাছটাকে।

পটু কেরানী তীরে দাঁড়িয়েছিল। ও দেখছে ওই মাছ ধরার ব্যাপারটা। মোটাসোটা থলথলে দেহ, মাছগুলোকে কায়দা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তীরে দাঁড়িয়েছিল সে। হঠাৎ ফটিকের মাছটা দেখে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে মাছটা ছোঁ মেরে তুলে নেয়। ফটিক কেঁদে ওঠে—আমি ধরেছি! আমার মাছ—

পটু গর্জায়—ধ্যাৎ, ছোঁড়া! দোব এক থাপ্পড়। বলে কিনা আমার মাছ! এটা কত করে ধরলাম আমি।

ফটিকও ছাড়বে না। জলে-কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। সেও মাছটাকে আঁকড়ে ধরেছে। পটু এক ঝটকায় ওকে জলে ফেলে দিয়ে গজরায়।

—ডেঁপো ছেলে কোথাকার।

বিমল ডাক্তার এসে ওকে কোনো রকমে তোলে। ফটিক কাঁদছে। অনেকেই বলে দু'চার কথা। মাছটা নাকি ফটিকই ধরেছিল আগে। ফটিকও তারস্বরে জানায় সেই কথাটা।

বিজয়া গোলমাল শুনে এগিয়ে আসে। তখন লোক জমে গেছে। পটু কেরানী চকচকে মাছটা তুলে নিয়ে ভিড় ঠেলে চলে যাবার মুখে বিজয়াকে দেখে একবার চাইল মাত্র। দাঁড়াল না সে। বিজয়া ওকে দেখল।

ফটিক তখনও কাঁদছে—আমার মাছটা নিয়ে গেল, মারল আমাকে ওই লোকটা।

বিজয়া ছেলের দিকে চাইল। সুন্দর ছেলেটা জলকাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে, চুলগুলো ভিজে—মুখখানায় কি দারিদ্র্যের

ছাপ আঁকা। সেই সুন্দর ছেলেটা দু'দিনের এই বিপর্যয়ে কেমন বুনো হয়ে গেছে।

ক'দিন ধরে বিজয়া অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে করে অধৈর্য হয়েছিল। ছেলেটাকে ওই অবস্থায় দেখে এগিয়ে এসে ওর কান ধরে সজোরে গোটাকতক চড় বসিয়ে দেয় রাগের বশে। তার সারা মন জ্বলে উঠছে। বিজয়া বলে,

—হতচ্ছাড়া ছেলে। ডুবে মরতে পারো নি? মাছ ধরতে এসেছিলে? কেন এসেছিলি এখানে? কেন?

নির্দয়ভাবে প্রহার করে চলেছে বিজয়া, ওর চাপাপড়া সব ব্যর্থতা আর যন্ত্রণা যেন ওই শাসনের সুরে প্রতিশোধের মতোই ফুটে ওঠে। সব রাগ ফুটে ওঠে ছেলেটার উপর।

অতর্কিত প্রহারে ফটিক অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। মা! মাগো!···

বিজয়ার মুখেচোখে ফুটে উঠেছে কি নিষ্ঠুর হিংস্রতা। তার সব দুর্ভাগ্য যেন ওকে কেন্দ্র করেই এসেছে। বিজয়ার মনে হয় ওই ফটিক তার কোন চিরকালের শত্রু, ওকে তারই জবাব দিতে চায় সে। তাই রাগে অন্ধ হয়ে ছেলেকেই আঘাত করে চলেছে।

ফটিক কোনোদিন মায়ের এই মূর্তি দেখে নি। সব কিছুই বদলে গেছে তার চোখের সামনে। কাল থেকে খেতেও পায় নি; তবু সেই কথাটা ভুলেছিল সে এই খেলায়; মাকে আজ গায়ে হাত তুলতে দেখে ফটিক চমকে উঠেছে। ওই আঘাতগুলো শুধু তার দেহেই নয় —মনেও কোথায় আরও গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

মা কখনও এভাবে তাকে মারে নি। এই দুঃখকষ্ট যন্ত্রণাকে ও কখন দেখে নি। তার উপর মায়ের এই ব্যবহার তার মনে এনেছে দুঃসহ হাহাকার।

আজ মাও বদলে গেছে।

ফটিকের কান্নার শব্দটা বেদান্ততীর্থের কানে যেতেই বৃদ্ধ চমকে

উঠলো। হাতের পুঁথি ফেলে নেমে এসে ওদিকে ব্যাপারটা দেখে এগিয়ে যান। বিজয়া ওঁকে দেখে নি।

বেদান্ততীর্থ বলে ওঠেন :

—বৌমা ! ছিঃ বৌমা।

ওঁর ডাকে চমকে ওঠে বিজয়া ; এতক্ষণে তার জ্ঞান ফেরে। চারদিকে অনেকেই তাকে দেখেছিল ওই অবস্থায়। মাথার ঘোমটা খুলে গেছে—চোখেমুখে ফুটে উঠেছে কি বন্য ভাব। ফটিক মার খেয়ে কাঁদছে ! ··সর্বাঙ্গে ওর কাদা, ময়লা ছেঁড়া জামা-প্যাণ্টপরা ও যেন কোনো হতভাগ্য একটা ছেলে।

ও বিজয়ারই সন্তান ! ওকে দু'দিন খেতে দিতে পারে নি। শোবার ঠাঁই নেই ; এতটুকু আশ্বাস নেই। অথচ তাকে নির্দয়ভাবে মেরেছে বিজয়া।

বেদান্ততীর্থের ডাকে বিজয়ার চমক ভাঙে।

মাথার ঘোমটা তুলে সে চলে গেছে। দুচোখ ছাপিয়ে জল আসে। বিজয়া যেন অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়বে তাই এখান থেকে পালাচ্ছে তার অপমান আর লজ্জা ঢাকবার জন্যই।

ফটিক কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। দাদু বলেন,

—চল। ভিতরে চল। এভাবে কাদা মেখে ভিজে থাকতে নেই।

তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ফটিক। বলে সে,

—ওই লোকটা, ওই মোটা মতো লোকটা আমাকে জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হাত থেকে মাছটা কেড়ে নিল !

ব্যাপারটা দেখেছিল বিমল ডাক্তার, সে বলে—ওই পুটু ! ভেরি ব্যাড—ভেরি ব্যাড।

অনেকেই বলে—পুটু অমনিই গ', সবারই হরে হম্মে খায়।

বেদান্ততীর্থও ব্যাপারটা বুঝেছেন। এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদই করেন না তিনি। প্রতিবাদ করার মতো জোরও তার নেই। ফটিককে

কাছে টেনে নিয়ে ওর ভিজে মাথা চাদরের খুঁট দিয়ে মোছাতে থাকেন। ফটিক বলে চলেছে কান্নাভিজে স্বরে,

—মা কেন মারলো ?

মায়ের আঘাতটা তার মনের অতলে বেজেছে গভীরভাবে। তাই এ কান্নার যেন শেষ নেই। বেদান্ততীর্থও ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পান না। তবু মনে হয় একটা কঠিন অত্যাচার আজ প্রকট হয়ে রূপ নিয়েছে। সেই অত্যাচার-এর প্রতিরোধ তাঁর জানা নেই।

ছেলেটা কাঁদছে ঘেংড়ে ঘেংড়ে। কান্নার সামর্থ্যও তার নেই। বৃষ্টিতে ভিজে কাপড়টা স্যাপ স্যাপ্ করছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া হাঁকে যেন চালের উপর থেকে ছিটকে ফেলে দেবে ওই মানুষ দুটোকে। ভূষণ বলে,

—ভালো করে চালের বাতা-টাতা ধরে থাক বৌ ; ছেলেটাকে না হয় আমাকে দে !

মিনুর দু'চোখ জলে ভরে আসে। বাচ্চাটা কঁকিয়ে কাঁদতে চায় ; বুকে দুধ নেই ; খাবারও নেই। নিজেদেরও কাল থেকে কিছুই জোটে নি। এমন উপোস তাদের মাঝে মাঝে দেওয়া অভ্যাস আছে। কিন্তু ছেলেটা শুকিয়ে গেছে, চোখগুলো ঠাণ্ডায় বুজে আসছে ওর।

ও জানে এমনি করে এই বৃষ্টিতে পড়ে থাকলে ও শেষ হয়ে যাবে। ঝড়ের দাপট থেকে একটু পিদিমকে যেভাবে আড়াল করে রাখে সেইভাবেই আগলে রেখেছে ওই ছেলেটুকুকে। কিন্তু মনে হয় একটা দমকা হাওয়ায় সেটুকু নিভে যাবে।

মিনু বলে—কোনো রকমে যাওয়া যাবে না শিবতলায় ?

ভূষণ চারিদিক চেয়ে দেখে ; বাঁধ ভেঙে তখনও প্রবল বেগে নামছে গেরুয়া জল।

ওই হানামুখ বেড়ে গেছে অনেকখানি।

জলস্রোত বয়ে চলেছে। ওদিক থেকে আসার কোনো উপায় নেই। গাছের ডাল—খড়ের চালা বয়ে চলেছে স্রোতের টানে। ওর রুদ্রগর্জন ওঠে আকাশ বাতাসে।

—ওগো!

স্রোতের টানে যেন তাদের চালটা নড়ছে। আশপাশের গোয়ালঘর—অন্য একটা ঘর পড়ে গেছে। বিরাট মাটির স্তূপগুলোই কোনোমতে জলস্রোতকে আটকে রেখেছে। না হলে এতক্ষণ ঘরের চালাটা ভেসে যেতো ওদের নিয়ে।

ভূষণ চমকে ওঠে। সামনের আমগাছের ডালে একটা শকুন এসে বসেছে। বিরাট ডানা থেকে জল ঝরছে। গাছের ডালে বসে ডানা মেলে সেটা জল ঝাড়ছে গা থেকে আর চীৎকার করছে কর্কশ শব্দে।

—হেই ঠাকুর! ওগো, ওটাকে তাড়াও গো!

ওই শকুনির গা থেকে ঝরা জল এসে পড়ছে ওদের সামনে। কি যেন অমঙ্গল আর সর্বনাশের দূত হয়ে এসেছে শকুনিটা, ওর লাল দু'চোখে নীরব মৃত্যুর পরোয়ানা। শকুনটা স্থির দৃষ্টিতে ওদের দেখছে।

মিনু বুক দিয়ে বাচ্চাটাকে আগলে রেখেছে। ছেলেটা নেতিয়ে পড়েছে। ওর গা ঝরা জল খোকনকে না লাগে। ভূষণ চেয়ে দেখছে, চীৎকার করার সাধ্যও নেই।

—খোকন!

মিনু ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ভূষণ বলে—এমনি করে থাকতে পারবি না বৌ, তুই থাক। আমি সাঁতরে যেমন করে হোক পাড়ায় গিয়ে তোকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি।

মিনু চমকে ওঠে। তবু লোকটা পাশে থাকলে সে ভরসা পায়। পিছনে ওই রুদ্র দামোদর। চারিপাশে বন্যার কলকল্লোল তার মাঝে ভূষণকেও ছাড়তে ভরসা হয় না। সাঁতার জল আর তেমনি স্রোত। কোথায় কি বিপদ হবে কে জানে!

মিনু অস্ফুটকণ্ঠে বলে—না, না। তুমি যেয়ো না।

ঝটপট শব্দে শকুনিটা ডানা ঝাপটে তার নিজের অস্তিত্বটুকু ঘোষণা করছে আর স্থির দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে আছে। লম্বা ঠোঁটটায় এখনও রক্ত লেগে আছে ওর। ওই রক্তলাল ঠোঁটটা কেমন বীভৎস। মিনু আর্তনাদ করে ভীতকণ্ঠে।

—ওটাকে তাড়াও। তাড়াও!

শকুনটা যেন হাসছে ওর দিকে চেয়ে।

—এই যে!···এ···এখানে···!

ওদের দেখতে পেয়েছে তরুণ আরও কয়েকজন। কিন্তু স্রোত ঠেলে কড়াই নিয়ে এতখানি পথ বেয়ে আসার সাধ্য তাদের নেই। হানা মুখের সামনে দিয়ে পার হয়ে আসতে হবে তাদের। জীর্ণ ভেলাটা কাঁপছে থরথরিয়ে ; একটা দুটো লগি পুঁতেও ঠেলা যায় না। ভেলাটা ছিটকে সরে যাচ্ছে বার বার। ওরা কাছে আসতে পারছে না।

দূর থেকে ভূষণ চীৎকার করছে। চীৎকার নয় ও যেন করুণ কাতর আর্তনাদই। কিন্তু এদের করার কিছুই নেই। ওই ভেলাটাকে কোনো কঠিন নিয়তি যেন বার বার কঠিন হাতে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে।

তরুণ বলে—পারবি না তোরা ভূষণদের তুলে আনতে?

লগি ঠেলে ঘেমে নেয়ে উঠেছে ছেলেরা। ভেলাটা সরে এসেছে অনেক দূরে।

পিতু বলে—নৌকা হলে পারতাম দাদা। ইতে হবে নাই। ক'টিমানুষকে ওই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে আসতে হবে তাদের ওই চালের উপর।

কিন্তু কোনো পথই দেখে না তারা। স্তব্ধতার মাঝে ওঠে কলকল্লোলের শব্দ—আর ভেসে আসে ভূষণের চীৎকার।

এগোতে গিয়ে ভেলাটা স্রোতের বেগে থরথরিয়ে কাঁপছে, এ স্রোতে এগোতে পারছে না।

ভূষণ বলে—ওরা আসছে বৌ। দেখবি ঠিক এসে যাবে। নিয়ে যাবে আমাদের। ডাক্তারও আছে। ওষুধ পাবি সেখানে। খোকন সেরে উঠবে। খাবার পাবি—দুধও দেবে ওরা ছেলেটাকে।

তরুণদের ভেলাটা স্রোতে টানে দূরে সরে যাচ্ছে। তরুণ বুঝেছে এবারও ওই ভূষণদের উদ্ধার করতে পারল না, তারা ওইখানে ওই ভাবে পড়ে রইল।

মিনু কাঁপছে ওই একরত্তি বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। দু' চোখ মেলে চেয়ে থাকে—কান পেতে শোনে ওদের নিয়ে যাবার জন্য কখন ওরা আসবে। সব ছাপিয়ে ওই বাঁশবনের বুক থেকে, নদীর দিক থেকে হু-হু শব্দ ওঠে। ক্রুদ্ধ গর্জন উঠছে দিনরাত।

গাছের ডালে ঝটপট শব্দে শকুনটা নড়ছে, ওদের দিকে চেয়ে আছে শ্যেন দৃষ্টিতে। মিনু ওর নজর থেকে খোকনকে বুকে জড়িয়ে আড়াল করে রাখে। কতক্ষণ!

আর কতক্ষণ তাদের এইভাবে থাকতে হবে জানে না। শীতে ভয়ে আর অনাহারে ক্লান্ত হয়ে আসছে, মনে হয় এক সময় চালের ঢালু পিঠ বেয়ে গড়িয়ে পড়বে ওই হিম জলের স্রোতে সে বাচ্চাটাকে নিয়ে।

—দু'মুঠো চিবো বৌ। ভূষণ কোঁচড় থেকে চাল বার করে কতকগুলো ওর হাতে দেয়।

শুকনো চালগুলো জলে ভিজে গেছে। এত বিপদ—এমনি সর্বনাশা ধ্বংসের মাঝেও তবু বোধহয় বাঁচতে চায় মানুষ। তাই মিনু চিবুতে থাকে ভিজে পান্‌সে চালগুলো।

বিস্বাদ—পান্‌সে ঠেকে চাল ভিজেগুলো। নুন নেই। বিশ্রী লাগে।

মিনু তবু যেন কি দুর্বার বাঁচার আগ্রহ নিয়ে চালগুলো চিবুচ্ছে। ওই শস্যকণা থেকে ওরা যুঝবার জন্য শক্তির শেষ কণিকাটুক আহরণ করতে চায় আর পথ চেয়ে থাকতে চায়।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষগুলোর আর নড়বার সামর্থ্যও নেই। পর পর দুদিন ধরে তরুণের খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম নেই। কিন্তু তবু অনেক কাজ করারই বাকী রয়ে গেছে। ভূষণদের আনতে পারে নি, আরও অনেকেই ওপাড়ার গাছের উপর—না হয় চালে রয়ে গেছে। দেখেছে তাদের দুরবস্থা। দু'একদিনের মধ্যে তাদের উদ্ধার করতে না পারলে ওই মানুষগুলো একে একে গাছ থেকে জলেই পড়ে যাবে—ভেসে যাবে। ত্রিদিববাবু শুধোন তরুণকে।

—কোনো রিলিফ, সরকারী লোকজন কেউ আসেন হে?

তরুণ ওই দিকে চাইল। ওই ত্রিদিববাবু দিব্যি আরামেই রয়েছে। ও জানে না বাইরের সব খবর। তরুণ ক্লান্ত চাহনি মেলে লোকটাকে দেখছে। ও জানায়ঃ

—না। এখনও কিছু আনতে পারে নি। তবে খবর দিয়েছি, বোধহয় এসে পড়বে।

ত্রিদিববাবু খাওয়াদাওয়া সেরে হুঁকো টানছিল; তার অবশ্য অসুবিধে কিছু হয় নি তেমন। বড় বাড়ির দোতলায় থাকেন, তাঁর তো টাকারও অভাব নেই। এখনও গোলাভরা ধান মজুত রয়েছে। বন্যা তা'র বিশেষ কিছুই করতে পারে নি ওদের তুলনায়। পুটু কেরানীও হুজুরের বাড়িতেই থাকে। পুটুই জবাব দেয় বিজ্ঞের মতো।

—সরকারী ব্যাপার—বুঝলে না মাস্টার, তোড়জোড় করতেই দিন বয়ে যাবে।

পুটুর খাওয়াটা জোর হয়েছে। মাছের মুড়িঘণ্ট-ভাজা-ঝাল বেশ জমেছে, তাই কয়েকটা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে একটু সামলে নিল গুরু-ভোজনের চাপটা। নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় পুটু, দিবানিদ্রা দেওয়া তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস, ওটার নড়চড় যেন না হয়।

বিভূতি মাস্টার এরই মধ্যে চারটি চালডাল সিদ্ধ করে নিয়েছে।

মলিনাও দেখেছে ব্যাপারটা। তরুণ কাল থেকে খায় নি। তাই বলে সে—তরুণকে ডাক না চামেলি, বাছা জলেজলেই রয়েছে। তবু একমুঠো খেয়ে যাক।

চামেলিরও কথাটা মনে হয়েছিল, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি। তাই মায়ের কথায় খুশী হয় সে মনে মনে। তবু ইচ্ছে করেই উৎসাহ দেখায় না। চুপ করে থাকে।

মলিনা বলে—যা বাছা, ডেকে আন তরুণকে।

চামেলি যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেই এগিয়ে গেল তরুণের সন্ধানে।

চামেলি দেখেছে তরুণকে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান ওই ছেলেটি ইস্কুলে মাস্টারী নিয়ে এখানে এসেছিল কয়েক বছর আগে। তাদের বাড়িও গেছে, বিভূতি মাস্টারকে সেও শ্রদ্ধা করে। চামেলিও চিনেছে তরুণকে নতুন করে এই ক'দিনে।

চামেলিকে এখানে আসতে দেখে তরুণ ওর দিকে চাইল। ইতিমধ্যে কিছু চাল-ডাল যোগাড় করে ছেলের দল বোর্ডিং-এর বাইরে একটা চালায় বড় কড়াই-এ খিচুড়ি চাপিয়েছে। তবু যারা এসেছে এখানে তাদের একহাতা করে দিতে পারবে ওই খিচুড়ি, নিজেরাও খাবে।

ওইখানেই চামেলি তরুণকে দেখে এগিয়ে আসে। ওর লজ্জা করে। ফর্সা রং, পরনে আধময়লা একটা ডুরে শাড়ি। হাতে কাঁচের চুড়ি কগাছা, এর বেশী আভরণ তার জোটে নি। তবু চামেলির মুখে একটা কোমল শ্রী রয়ে গেছে—কচি পাতায় যেন নরম সবুজভাব মাখানো।

বিমল ডাক্তারও রয়েছে। সে দেখছে চামেলিকে।

তরুণ ওকে এখানে দেখে একটু অবাকই হয়। ওকে শুধোলো।

—কি ব্যাপার?

চামেলি বলে—মা আপনাকে একবার যেতে বললেন।

—তোমার মা!

তরুণ তখন লোকজনদের নিয়ে কথা বলতে ব্যস্ত। কি ভাবে দুটো দিন পার করা যায় সেই ভাবনা তার। ইতিমধ্যে জায়গাটা নোংরায় ভরে উঠেছে। বিমল ডাক্তার বলে চলেছে ওই ছেলেদের :

—ওদের একটু সাবধান হতে বলো ভায়া, না হলে এই জলবন্দী ঠাঁইটুকু নোংরা ময়লায় ওরা ভরিয়ে দেবে। তার ফলে কোনো অসুখ-বিসুখ শুরু হবে। বিশেষ করে ইঁদারা আর টিউবওয়েল-এর সম্বন্ধে টেক কেয়ার। আমি বলতে গেলাম—ওরা শুনলেই না।

তরুণও কথাটা ভাবছে। এদিকের ব্যবস্থাও দেখতে হবে। বিমল কথাটা খারাপ বলে নি। তরুণ তাই বলে—সত্যিই। ওদের সকলকেই সাবধান করে দিতে হবে।

চামেলি তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে তরুণের খেয়াল হয় শুধোয় সে,—কি ব্যাপার ?

—মা ডাকছেন। চামেলি জানাল।

—অ। কেন ? তরুণ তবু কথা বাড়ায়।

চামেলি অবাক হয়। লোকটার খিদে-তেষ্টাও নেই। মনে মনে রাগও হয়। ও বোধহয় বোকাই, নিজের জীবন বিপন্ন করে কেউ এসব করে ? কই, ত্রিদিববাবু কেরানীবাবু—মণি দত্ত এরা তো এগোয় নি। যত দায় ওরই। ও তো এখানের কেউ নয়, তবে এত দায় ওর কেন ?

বলে উঠে চামেলি—ঠিক জানি না। মা বললে ডেকে আন।

কে জানে খাবার কথা বললে ও বোধহয় যাবে না, তাই এড়িয়ে গেল। তরুণ বুঝতে পারে না, তাই বলে সে,

—চলো শুনে আসি কি আদেশ করেন।

তরুণ ইস্কুলবাড়ির ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। নোংরা-বদ্ধপরিবেশ দু'দিনেই জায়গাটা যেন নরকে পরিণত হয়েছে। জলে কাদায় জ্যাব জ্যাব করছে বারান্দা।

ঘরগুলো মানুষের ভিড়ে ভরে উঠেছে। ভিজে কাপড়-কাঁথা-তালাই-হাঁড়িকুঁড়ি-বস্তা রাজ্যের মালপত্র তবু ওরা এনেছে। কোনো-মতে ওরই মধ্যে আশ্রয় পেয়ে নিজেদের মধ্যেই যত পুরোনো ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াও শুরু করছে। এতদিন ফারাক ফারাক ছিল, এখন গায়ে গায়ে এসে ঝগড়া বেড়ে উঠেছে। তারই আওয়াজ ওঠে।

মণি দত্তের মা প্রত্যেক দিনের মতোই বৌটার পিছনে লেগেছে। খনখনিয়ে ওঠে বুড়ির গলা।

—অলো অ ভালোখাগী, বলি এত দেমাক্ কিসের লা? মণে বলে কতো করে দু'পয়সা আনছে, আর তুই কি না বিলিয়ে দিবি? তোর বাপের ধন পেয়েছিস?

বৌএর অপরাধ সে গরম দু'খানা রুটি ফটিকের হাতে দিয়েছিল। ছেলেটার জ্বর জ্বর করছে। বুড়ো বামুন কোথাও দু মুঠো জোটাতে পারে নি। ,চিড়ে ভিজে দেবে ছেলেটাকে—তাই ছেলেটাকে ডেকে রুটি দু'খানা দিয়েছে আর পড়বি তো পড় বুড়ির চোখেই। বুড়ি খড়ের নুড়োর মতো ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলছে। ওই ব্যাপারে তাই দপ্ করে জ্বলে উঠেছে।

দত্ত বৌ বলে—দু'খানা রুটি বই তো নয়? ছেলেটার জ্বর তাই দিলাম।

বুড়ি জ্বলে ওঠে:

. —দু'খানা রুটি। এঁ্যা, বলি দুখানা রুটি এতই ফ্যাল্না যে বিলিয়ে দিতে হবে কুকুর-বেড়ালকে? ওরে আমার দাতার বিটী রে? ওই বিটলে বামনা আর বৌটা কি কম শয়তান, নাতিকে এখন থেকেই ভিক্ষে করা শেখাচ্ছে?

বিজয়া এদিকে আসছিল। তারও মনমেজাজ ভালো নেই। ছেলেটার জ্বরজ্বর করছে। ওরই উপর আজ ঘা কতক মেরেছে তাকে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে কোনোদিনই ওর গায়ে হাত তোলে নি। আজ ওই বানে তার সেই মমতা-মাতৃত্ব সব যেন

মন থেকে মুছে গেছল ক্ষণিকের জন্য তাই ফটিকের নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে।

বাছাকে এতটুকু গরম দুধও দিতে পারে নি। ওই জ্বরের উপর চিড়ে ভিজেও খেতে চায় নি ফটিক। তাই বিজয়া গিয়েছিল ত্রিদিব মুখুয্যেদের বাড়িতে। ওদের গরু-বাছুর সবই আছে, দুধও হয় অনেক। যদি একটু দুধ পায় ছেলেটার জন্য তাই গেছল ওদের কাছে।

শত অভাবেও কোনোদিন কারোও কাছে হাত পাতে নি। আজ এই বিপদের দিনে ছেলেটার জন্য একটু দুধের সন্ধানে যেতেই বাধ্য হয়েছে সে।

সাজানো সংসার মুখুয্যেদের; রান্নার জন্য লোকজন আছে। গিন্নী আর বৌদির খাওয়া হচ্ছে। এসময় বিজয়ার যেতেও ইচ্ছে করে না। তবু যেতে হয়।

মুখুয্যে গিন্নী বৌদের নিয়ে খেতে বসেছে। রামশাল চালের ভাত, তরকারী মাছ, ওদিকে উনুনে দুধ ফুটছে বড় কড়াই-এ। হঠাৎ বিজয়াকে এই সময় শুকনো মুখে চুপে চুপে ওদের উঠানে এসে দাঁড়াতে দেখে মুখুয্যে গিন্নী আর বৌদের চোখে চোখে কি যেন ইশারা হয়ে যায়। বিজয়ারও সেটা নজর এড়ায় নি।

ভেবে ছিল ফিরেই যাবে, কিন্তু পারে নি। ফটিকের কথা মনে পড়ে। তবু একটু গরম দুধ পেলে হয়তো খাবে; মারধোর দিয়ে মায়ের মন বেদনায় ভরে উঠেছে। তাই এই নীরব অপমান সয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকে।

মুখুয্যে গিন্নী শুকনো কণ্ঠে শুধোয়—কি বাছা? এ সময়ে হঠাৎ?

বিজয়া ওর দিকে চাইল। কিছু পাবার আশা নিয়ে কোথাও যায় নি সে, তাই আজ কথাটা জানতেও বিশ্রী লাগে। তবু বিজয়া কোনোমতে বলে:

—খুড়িমা, ফটিকের জ্বর জ্বর করছে, তাই ভাবলাম একটু দুধ যদি পেতাম—তবু বাছার খাওয়া হতো।

মুখুয্যে গিন্নীর মুখখানা চকিতের মধ্যে কঠিন হয়ে ওঠে। বিজয়াও দেখছে সেটা।

ওই স্কুলবাড়ি আর নাটমন্দিরে যারা এসে রয়েছে তারা যে ওদের চেয়ে অনেক ইতর শ্রেণীর দুর্ভাগা ভাগ্য বিতাড়িত মানুষ, সেটা ওরা ধরে নিয়েছে। মুখুয্যে গিন্নী বলে ওঠে চাঁছাছোলা গলায়।

—দুধ ! বাছা এতলোক তো এসেছে—তাদেরও ছেলেপুলে আছে, সবাই যদি দুধের জন্যে আসে, আমরা দিই কোত্থেকে বাছা, বলো ?

বিজয়ার মুখখানা কি তীব্র বেদনায় রাঙা হয়ে ওঠে। ওর গালেই যেন কে সজোরে একটা চড় কষেছে। মনে হয় বৌ-মেয়েরা সকলেই হাসছে ওর এই অপমানে। বিজয়া লজ্জায় কুঁকড়ে আসে।

হাতের বাটিটা কাপড়ের নিচে ঢেকে নেয়। ওদের জানাতে চায় দুধ নিতে সে আসে নি। মুখুয্যে গিন্নীর চোখ ঘুরছে ভাঁটার মতো। বিজয়ার বাটি লুকানো দেখেছে সে। তাই বলে ঃ

—ওই বাটিটা কি তুমি এনেছিলে বৌ ? তোমার বাটিই যদি হবে তবে লুকোচ্ছ কেন ?

বিজয়াকে ও বোধহয় বাটি চুরির দায়েই ধরবে। বিজয়া বাটিটা বের করে অতিকষ্টে বলে ঃ

—হ্যাঁ খুড়িমা এটা আমাদের বাটি।

বিজয়ার সব আত্মসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে গেছে। এবার সে জানায় সত্যি কথাটা। বিজয়া বলে—যদি একটু দুধ পেতাম, সেটা নিয়ে যাবার জন্যে বাটিটা এনেছিলাম।

বিজয়ার কণ্ঠস্বর বুজে আসে কি বেদনায়।

—অ ! মুখুয্যে গিন্নী একটু হতাশই হয়। তবু দম নিয়ে মাছের মুড়ো চুষতে চুষতে ঝি কে বলে ঃ

—বাটি ঘটি-থালা-একটু সামলে রাখিস ঝি ; মাজবি আর হেঁশেলে তুলে তালা দিবি। যা দিন-কাল পড়েছে। কই গা ছোট বৌমা, তুমি একটু দই নাও বাছা শেষপাতে।

বিজয়ার পায়ের নিচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে, ওদের প্রাচুর্যের সংসারে তার মতো লক্ষ্মীহীনার আসা ঠিক হয় নি। অপমান! মুখুয্যেদের চোখে মানসম্মানই নেই—তার আবার অপমান কি!

মুখ নিচু করে বিজয়া সরে এল ত্রস্ত পায়ে। ও বের হয়ে আসতে পারলে বাঁচে। অপমানে-লজ্জায় মাটিতে নুইয়ে পড়েছে সে। ওকে যেতে দেখে মুখুয্যে গিন্নী মাছের মাথা চোষা বন্ধ করে গজরায়।

—আপদ! দরজায় খিল দিয়ে রাখ মানি। যে সে হুট করে যেন ভেতরে না আসে।

শূন্যহাতে বিজয়া উঠে আসছে বারান্দা দিয়ে। আজ ছেলেটাকে উপোসই দিতে হবে। একমাত্র সন্তান—তাকে এতটুকু খেতে দিতে পারে নি, অথচ তাকে আজ চোরের মার মারছে। নিজের কাছেই তার জবাব দেবার কিছু নেই, হু হু করে দু'চোখ ঠেলে জল আসে।

মণে দত্তের মা তখনও কোট ছাড়ে নি। চীৎকার করে চলেছে —মর্ মর্! ভিক্ষে করে খেয়ে বাঁচার চেয়ে মরণ ভালো।

হঠাৎ বারান্দায় মণে দত্তের মায়ের ওই খ্যানখ্যানে গলা শুনে দাঁড়াল বিজয়া।

মণের বৌটা বুড়িকে কি বলতে চাইছে, আর বুড়ি তত চীৎকার করছে। শেষকালে বুড়ি অধৈর্য হয়ে বৌটাকে সরিয়ে দিয়ে ফটিকের দিকে এগিয়ে আসে।

ফটিককে বৌটাই ডেকেছিল, ওই তাকে রুটি দুটো দিয়েছে। তখনও সেই রুটি দু'খানা ওর হাতে ধরা, সরে আসতে পারে নি ফটিক। হঠাৎ বুড়ি এগিয়ে এসে ফটিকের হাত থেকে মুচড়ে রুটি দু'টো কেড়ে নিয়ে গজরায়ঃ

—হাভেতে ভিখারীর জাত—মরতে পারিস না? দিন-রাত ছোঁক ছোঁক করে ঘুরছে। মর-মর।

বিজয়া বারান্দার মুখে এসে পড়েই ওই ব্যাপারটা দেখে চমকে ওঠে। মণে দত্তের বুড়ি মা ওর ফটিকের হাত থেকে রুটিটা কেড়ে নিয়ে গর্জাচ্ছে। বিজয়ার সারা মনে একটা চমক খেলে যায়, অজান্তেই বিজয়া হেঁকে ওঠে ঃ

—ফটিক!

ফটিক চমকে উঠেছে। মাকে এইখানে দেখবে ভাবে নি সে। ও দেখছে মায়ের চোখমুখ কঠিন—ভাব লেশহীন। সকালের মারের ভয়টা এখনও ভাঙে নি। মাও দেখেছে হাত থেকে রুটি কাড়াটা।

ফটিক বলে—আমাকে উনি ডেকেছিলেন মা, আমি রুটি নিই নি···ওরা দিয়েছিল। রুটি আমি চাই নি মা।

ভয়ে ওর ডাগর দু'চোখ বয়ে জল নামছে।

বিজয়া বুড়ির দিকে চাইল। বুড়ি তখনও বৌকে শাসাচ্ছে খ্যানখ্যানে গলায় কঠিন স্বরে ঃ

—খবরদার বলে দিলাম দাতব্য করবি তো মুখে পোড়া কাঠ গুঁজে দূর করে দোব। মর-মর! শ্যাল-কুকুরের দল।

—ফটিক।

বিজয়া ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ওকে চলে আসতে বলে। আজ সে ওকে মারতে পারে না। ছেলেকে সে মায়ের হতাশ স্নেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে, কঠিন যন্ত্রণাময় পৃথিবীর মাঝে ওইটুকু তার সম্বল—তাই দিয়ে বিজয়া ছেলেকে ঘিরে রাখে। কাঁদছে ফটিক। বিজয়া বলে আশ্বাসের স্বরে।

—কাঁদিস না বাবা। তুই তো নিজে যাস নি ওখানে। চল। ছিঃ, কাঁদতে নেই।

বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল তরুণ সেও এই দৃশ্যটা দেখেছে। তার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। এত সর্বনাশের মুখেও মানুষ যেন পশুই

রয়ে গেছে। চামেলি পিছনে ছিল, সে এটা দেখে নি তাই তরুণকে দাঁড়াতে দেখে বলে :

—চলুন।

—হ্যাঁ, চল।

তরুণ সহজ হবার চেষ্টা করে তবু ওর চোখের সামনে ফটিক আর বিজয়ার মুখ ভেসে ওঠে বার বার।

বুড়ি তখনও চীৎকার করে চলেছে—আবার ডাঁট দেখানো হচ্ছে। ঢের দেখেছি এমন ডাঁট! বামুন! ভারি আমার বামুন রে? ভিখেরী বল! ভিখেরী!

বুড়ির জিব বোধ হয় সুড়সুড় করছে, তাই বকে চলেছে সে।

সামান্য উপকরণ। সানকিতে খানিকটা গরম খিচুড়ি আর আলু-পেঁয়াজ ভাজা। ঠিক ভাজাও নয়, কারণ তেল নেই—ছেঁচকি বলা চলে। চামেলি এর মধ্যে আসন পেতে দিয়েছে। তরুণের দিকে খাবার এগিয়ে দিয়ে মলিনা বলে :

—কাল থেকে খাওয়া হয় নি, কিছু মুখে দাও বাবা।

তরুণ অবাক হয়।

—এসব কোত্থেকে জোটালেন এই বান বাদলার মধ্যেও?

মলিনা বলে,

—কিই বা পেয়েছি। সব গেল, এখন দিন চলা ভার। সামনে পুজো।

তরুণ ওর দিকে চাইল। আকাশ তখনও মেঘে মেঘে ঢাকা, বৃষ্টিও পড়ছে। ওর মনে হয় কোনোদিনই আর শরতের সোনালী সকাল আসবে না তার হলুদ সোনালী আলোর রং মেখে, দিগন্ত-প্রসারী মাঠের সবুজ ধানগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে, সাদা উত্তরীয়ে শুচিতা নিয়ে প্রকৃতির উছল যৌবনও আর কোনোদিন ফুটে উঠবে না।

ওর শস্যরিক্ত বুকে জেগে থাকবে শুধু মাত্র বিষক্ষতের মতো দাগগুলো, শ্মশানের শূন্যতার মাঝে শীর্ণ বুভুক্ষু মানুষ নামক কোনো প্রাণীর দল ঘুরে বেড়াবে তাদের সব কিছু হারিয়ে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফটিকের মুখখানা। দু'টুকরো রুটির জন্যে আজ ওদের মান-সম্মান সব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এর নামই জীবন—যার জন্যে মানুষ বেঁচে থাকে সব যন্ত্রণা স'য়ে। কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমান বেদনায় বিকৃত ; চেতনা বোধটুকুও ধীরে ধীরে ক্ষয়ে আসছে, ফুরিয়ে যাবে একদিন। তরুণ আজকের এই সর্বনাশের মধ্যে এই কঠিন সত্যটা অনুভব করেছে।

—খাও বাবা ! মলিনা বলে।

তরুণ খাবার চেষ্টা করে। গরম সেই খিচুড়ীর স্বাদটা ওর হিম দেহের কোষে কোষে কি তৃপ্তি আনে।

কাদের চীৎকার কানে আসে। বাঁশবনের ওদিকে জীর্ণ ঘরের ধসে পড়া চালের উপর মানুষগুলো বসে আছে। জলে ভিজে আর হিমে ওদের ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে মৃত্যুর কালো ছায়া নেমেছে। চারিদিকে বন্যার কলকল্লোল আর অট্টহাসির পৈশাচিক বিভীষিকা।

—বাবু—বাবু গ—বাঁচাও—ও !

ওই সর্বনাশা ধ্বংসের মাঝে ভূষণ আর তার স্ত্রীর সেই অসহায় কান্নাটা এখনও তরুণের কানে বাজছে। ছোট বাচ্চাটা কঁকিয়ে যেন কাঁদছিল। স্রোত ঠেলে এত চেষ্টা করেও কিন্তু ওরা যেতে পারে নি। প্রবল স্রোত ওদের বার বার ফিরিয়ে দিয়েছে। ও যেন ধ্বংস আর মৃত্যুর জগৎ, ওখানে মানুষকে ঢুকতে দেবে না সেই রুদ্র শ্মশান ভৈরবের দল।

ওই ভূষণই দু'দিন ধরে বাঁধে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিল, আজ তারা হেরে গেছে। হারিয়ে যেতে বসেছে। তাদের সে উদ্ধার করে আনতে পারে নি।

—নাড়াচাড়া করছো যে ? খাও ! রান্না ভালো হয় নি ?

মলিনা জানে না তরুণের মনের অতলের সেই যন্ত্রণাটাকে, তাই সে নিজের রান্নার দোষ বলেই মনে করে।

তরুণ কুণ্ঠিত স্বরে বলে।

—না, না। রান্না কেন খারাপ হবে। এই তো খাচ্ছি।

তার মনের যন্ত্রণাটা এদের সামনে প্রকাশ করতে পারে না সে। চামেলি ওর দিকে চেয়ে আছে কালো ডাগর দু'চোখ মেলে। তরুণ ওর চোখে কি নিঃশব্দ বেদনার ছায়া দেখেছে। বোধহয় তার জীবনের শূন্যতার প্রতিচ্ছবিই এই ধ্বংসের মাঝে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই শূন্যতা সে চামেলির চোখে এর আগে দেখে নি।

আজ চারিদিকে তরুণ দেখেছে সেই বেদনাকেই, যা এতদিন লুকোনো ছিল প্রকৃতির সবুজ স্নিগ্ধতার অতলে—পাখিডাকা গ্রাম্য বাতাসের সুরের আড়ালে। এই চরম বিপদের মাঝে সব রিক্ততা নিয়ে শুধু প্রকাশ পেয়েছে নগ্নরূপে ওদের প্রত্যেকের মুখে-চোখে-ব্যবহারে সেই বেদনা।

তরুণ কোনোরকমে খাওয়া সেরে বের হয়ে এল।

মলিনা জানায়—রাতে দু'খানা রুটি খেয়ে যেয়ো বাবা। ওখানে কিই বা খাবে!

দু'খানা রুটি! কথাটা কানে যেতে তরুণ চমকে ওঠে। ওই দুখানা রুটিকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু ঘটতে দেখেছে। একটু আগে দু'খানা রুটির জন্য একজনের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে ওরা, মানুষের এই দৈন্যগুলো আর স্বভাবের প্রকৃত রূপ এমনি বিপর্যয়ের মাঝেই ধরা পড়ে।

তবু ব্যতিক্রম আছে। তরুণ জানায়—আবার হাঙ্গামা করবে কেন?

মলিনা বলে—হাঙ্গামা কি বাবা?

চামেলি বলে ওঠে—গরীবের ঘরে এসব কেন ভালো লাগবে মা। ওঁর যদি অসুবিধা থাকে উনি আসবেন কি করে?

তরুণ হাসছে—হ্যাঁ। ওখানে আমার জন্যে রাজভোগ সাজানো আছে কি না? কি বল?

মলিনা মেয়েকে থামিয়ে দিল—থাম তুই চামেলি।

একটা গোলমালের শব্দ ওঠে। ক্রমশ সেই চাপা স্বরের গুঞ্জরণ চীৎকারে ফেটে পড়বে। তরুণও শুনেছে সেটা।

হঠাৎ বিভূতিবাবুকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইল। বিভূতিবাবু তার খোঁজেই এসেছেন। তরুণকে এখানে দেখে বলেন,

—তোমাকেই খুঁজছিলাম তরুণ, ওরা—ওই লোকজনরা ক্ষেপে উঠেছে, কাল থেকে ওরা খেতে পায় নি। শশী মোড়লই ওই ত্রিদিব মুখুয্যেকে কথাটা জানায়। অবশ্যি ভালো কথাই। আপনি কিছু চাল আমাদের খাতায় লিখে রেখে দ্যান, আপাতত দিন চালাই—পরে সবই শোধ করে দেবো; শশী মোড়ল আর নবীন সাঁপুই বলেছে অবিশ্যি আমরা জামিনদার থাকবো।

তরুণ কথাটা শুনছে। শশী মোড়ল, নবীন সাঁপুই গ্রামের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন চাষী, জমিজারাতও বেশ আছে তাদের। সৎ লোক। তারা এই প্রস্তাব দিয়েছিল ত্রিদিববাবুকে।

তরুণ বলে—তা প্রেসিডেণ্ট কি বললেন?

বিভূতিবাবু জানান—উনি দেবেন না। উল্টে নাকি বলেছেন—এখান থেকে ওরা সবাই চলে যাক! এখানে তার জায়গায় ওই ভিড় জমানো চলবে না।

—তাই নাকি! তরুণ ভাবতে পারে না এই সময় এত লোক কোথায় যাবে। ত্রিদিববাবু একথা বললেন কি ভাবে তাও জানে না।

চমকে ওঠে তরুণ।

সারা গ্রাম জলের নিচে, কতো মানুষ এখনও ভাসছে। কতক মরে গেছে—আরও মরবে। তারপর আসবে মহামারী-মন্বন্তর। এরা সামগ্রিক বিপর্যয়ের মাঝেও নিজের কথাই ভাবতে পারে।

চীৎকার শোনা যায়। কারা মারমুখী হয়ে উঠেছে। তাদেরই ক্রুদ্ধ গর্জন সব ছাপিয়ে ওঠে। একটা সোরগোল উঠছে।

বিভূতিবাবু বলেন—তুমি একটু দেখো বাবা! একি কাণ্ড বলো দিকি?

তরুণ বের হয়ে গেল ওইদিকে।

বারান্দায়—দোতলার ঘরগুলোয় মেয়েছেলেরা ভীত-ত্রস্ত হয়ে দেখছে। নিচের ওই মাঠের সামনে একপাল মানুষের কঙ্কাল যেন কি আক্রোশে জেগে উঠেছে। চোখে-মুখে তাদের হিংস্রতার জ্বালাটা প্রদীপ্ত।

ওই পটল বাগ্‌দীও দলে আছে। পরনে সেই বিবর্ণ মিলিটারী প্যান্ট আর ব্লাউজ-এর মতো জামাটা, তার থেকে রং ওঠা ফিতে দিয়ে আটকানো সেই মেডেল; পটলই চীৎকার করছে হাত-পা নেড়ে ওই জমায়েতের সামনে।

—কেন দেবে না? ভালো কথায় না দিলে আমরাও ছাড়বো না। বলে কিনা গেট আউট! এ কি মুখুয্যের এলাকা—পাবলিকের জায়গা হে। কারো কথায় যাবো না।

পটলা আইনের কথা বলে আর তাই দিয়ে লোক ক্ষেপায়।

তবু শশী মোড়ল ওদের থামাবার চেষ্টা করছে। সে বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক। এসময় গোলমাল এড়াতে চায় সে।

পটলা তত লাফাচ্ছে।

—ঘেরাও করে রাখবো ওই পেসিডেনকে।

ত্রিদিববাবু অবশ্য কথাটা ওই রকমই বলেছিলেন, তবে কিছু দিতেও রাজী ছিলেন তিনি। বিশেষ করে শশী মোড়ল, নবীন সাঁপুই যখন বলছে। কিন্তু তার আগেই ওই পটলা কিছু চ্যাংড়ার দলবল নিয়ে গোল পাকায়।

পুটু কেরানীও দেখেছে ব্যাপারটা। সে ত্রিদিববাবুর কাছেই দাঁড়িয়ে কি ভাবছে।

যারা সত্যিই অভাবে পড়েছে, তাদের চেয়েও দাবি ওই ফিকিরবাজ পটলারই বেশী ; ত্রিদিববাবুর কথা শেষ না হতেই সে চীৎকার করে ওঠে। লোকটির বদবুদ্ধিগুলো আছে। আর নানা কারণ অকারণে সে দল পাকাতে ওস্তাদ। তার দলে লোকও কিছু আছে তারই মতো। পটল সাধারণ মানুষগুলোকে সহজেই তাতিয়ে তোলে। তাই লোকও জুটে গেছে আজ বেশ কিছু। আজও পটলা তেমনি গোল পাকিয়ে নেতা সেজেছে। ওরা যেন জোর করেই কিছু অঘটন বাধাবে।

তরুণ ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। ত্রিদিব মুখুয্যে ওকে দেখে একটু ভরসা পায়। শশী মোড়ল, নবীনও এগিয়ে আসে।

মণে দত্ত সকাল থেকেই চুটিয়ে ব্যবসা করেছে। এই গোলমালে পটলার দল বোধহয় তার উপরই হামলা করবে—এই ভয়ে মণিও দরজা বন্ধ করে এক কোণে এসে দাঁড়িয়ে হাওয়া বুঝছে। এমন সময় তরুণ এসে পড়েছে।

তরুণ দেখে ওই পটল-এর দলকে। লোকগুলো বাঁধেও যায় নি এক কোদাল মাটি ফেলতে, গ্রামের কোনো কাজেই ওরা থাকে না, থাকে শুধু দল পাকাতে আর অকাজ করতে। পটলই নেতা সেজে হাত তুলে চীৎকার করছে তখনও।

—আমাদের দাবি মানতে হবে।

তরুণকে দেখে পিছনের অনেকেই ওই চীৎকারে আর গলা তোলে না, যদিও বা দু'একজন গলা মেশায়, তাও দাবির স্বপক্ষে তেমন জোরালো নয়। ত্রিদিব মুখুয্যে তরুণকে দেখে বলে,

—তুমিই বিহিত করো মাস্টার। কথা হচ্ছিল শশীর সঙ্গে আমার, ওরা মাঝ থেকে এসে গোল পাকালো। আমি বলি নি ওদের চলে যেতে এখান থেকে। ওরা মিছে কথা বলছে। কি হে মোড়ল ?

শশীও সমর্থন করে সেটাকে।

পুটু কেরানীও এগিয়ে আসে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে জানায়ঃ

—কি ভাবে কাজটা করা যায় তারই কথা হচ্ছিল। তা ওরা কি ওসব শুনবে ?

পটল বাধা দেয়—ওসব বুঝি না, চাল আমাদের চাই। দিতে হবে।

তরুণ দেখছে ওকে। এখানেই ও কাল থেকে এসে উঠেছে। রাতে ওই সর্বনাশের মধ্যেও কোত্থেকে মদ এনে গিলেছে পটলা।

একবারও ভেলা নিয়ে লোকজনকে সাহায্য করতে বের হয় নি। মাছ ধরেছে আর মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে পটল। ভূষণের কথা মনে পড়ে। লোকগুলো এখনও মৃত্যুর মুখে পড়ে আছে। ওদের কথা এরা ভাবে না। এসেছে আন্দোলন করতে। পটল তখনও চীৎকার করছে।

—চাল দিতে হবে!

কিশোরী ধাড়াও রাতের অন্ধকারে এসে জুটেছিল এখানে। পুটু কেরানীর অনেকদিনের বন্ধু। অবশ্য দুজন সম্পূর্ণ আলাদা ধাতের। পুটু হিসেবী-সঞ্চয়ী লোক। ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করে। বিষয়-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। সারা জীবনটাকে নানা বিধি-নিষেধের বেড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তবে একটা দোষ তার আছে। সেটা ওই নারীমাংসের প্রতি লোভ।

আর কিশোরী সম্পূর্ণ অন্য-ধাতের। সারা জীবনটা তার বেহিসেবী খরচায় ভরা, কোনো সম্বল নেই—আশ্রয় নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা ওসবের জন্য তার বিন্দুমাত্র মোহও নেই। ভেবেছিল দু'এক-দিনের মধ্যে ফিরে যাবে কলকাতায়। নোতুন পালা ধরেছে তাদের দলে—তার মহড়া আছে। কিন্তু এমনিভাবে আটকে পড়বে ভাবে নি।

কিশোরী বেলা অবধি শুয়ে ছিল, এটা তার দীর্ঘদিনের অভ্যেস।

ওই গোলমাল শুনে জানলা থেকে দেখছিল নাটকটা, সকলের ভূমিকাই ঠিক ঠিক অভিনয় হচ্ছে। হঠাৎ তরুণ আসতে নাটক যেন জমে ওঠে। সব দর্শকের হাততালি সেইই বোধহয় কুড়িয়ে নেবে।

কিশোরী কাল রাতে গোবিন্দ মুন্সীর ওখানে দু'পাত্র প্রসাদ পেয়েছিল। এখন তার নেশাও ছুটে গেছে।

ওই অবস্থাতে এসে শিবমন্দিরের চাতালে দাঁড়াল কিশোরী। আদ্দির কল্‌কাদার পাঞ্জাবিটা লাটপাট হয়ে গেছে। ওতে লেগেছে কাদার বিবর্ণ ছাপ ; বাহান্ন ইঞ্চি কঁচি ধুতিও লোটাচ্ছে।

কিশোরী ধাড়া বলে ওঠে—সাবাস পটলা। এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বল। বাঁধা কেলাপ। জনতার রায়, না তোর নিজের 'ডায়ালগ্‌' বাবা ? তবে বেড়ে বলেছিস কিন্তু। বাহবা—কি বাহবা।

সকলেই ওর দিকে চাইল। সৌরভীও দেখছিল ব্যাপারটা। পটলাকে চেনে সে, জানে ওর স্বভাবের কথা। লোকটা দালালি করে দিন চালায় আর বাজে কথা বলে লোকদের ঠকায়। এখানেও ঠিক সেই মতলবই বের করেছে।

সৌরভী হেসে ফেলে—ঠিক বলেছো গ, পটল ঠিক ন্যাতা হবেই।

পটল বাধা পেয়ে অপ্রতিভ হয়ে গেছে। সেও বুঝেছে তার চালাকি ধরা পড়ে গেছে। প্রথম চোটেই যদি লোকজন নিয়ে মুখুয্যের চালের বস্তা লুট করতে পারতো—হয়ে যেতো কিছু। দেরি করতেই নানা ফ্যাকৃড়া জুটে গেছে। পটলার মেজাজ বিগড়ে ওঠে। সৌরভীর কথায় তাই থমকে ওঠে পটল—এ্যাই। তুই চুপ কর।

কিশোরী বলে—অল রাইট। বাবা পটলচন্দর, নামোপাড়ার লোকজন এখনও জলবন্দী হয়ে রয়েছে, তুমিতো হিরো—মিলি-টারীতেও ছিলে শুনেছি।

পটল সায় দেয়—দশ বছর ছিলাম।

কিশোরী ভারি গলায় নাটকীয় ভঙ্গীতে শুধোয় :

—ভিক্টোরিয়া ক্রশও তো পেয়েছো দেখছি না? ওই যে সব

মেডেল ফেডেল রয়েছে। তা বাবা ওকি যাত্রার দলের সেনাপতির পাওয়া মেডেল না অন্য কিছুর জন্য পেয়েছে ওসব ?

লোকজন হাসছে ওর কথায়। পটলও বুঝতে পারে ব্যাপারটা। ওই কিশোরী ধাড়া আসর নিয়েছে। পটলার ফাঁকা আওয়াজ ফুরিয়ে গেছে। তবু বলে সে—ওয়ার মেডেল বাবু! ফ্রণ্টে ছিলাম কি না।

—বাঃ! কিশোরী ধাড়া বলে ওঠে :

—তা'লে আর একবার বীরত্ব দেখাও পটলচন্দর। ওই ভেলা নিয়ে নামোপাড়ার জলবন্দী দুচারজনকেও রেসকিউ করে আনো তোমার লেফটেন্যাণ্টদের নিয়ে। এক বস্তা চাল ত্রিদিব মুখুয্যে না দেয় আমি দোব। হাম দেঙ্গে। রাজী ? ব্যস, লড়ে যাও।

কলরব থেমে গেছে ওর কথায়। ক্রমশ একটা গুঞ্জরণ ওঠে জনতার মধ্যে। পটলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ও বুঝেছে কিশোরী তাকে এইবার কোণঠাসা করে এনেছে। আর সকলেই তাকে দেখছে। ওই খরস্রোতা জলের বিস্তারের দিকে চেয়ে দেখছে পটল, তার সারা দেহ হাত-পা ঘামছে। নিজেকে সত্যিই অসহায় বলে বোধ হয়। তার সব শক্তি ওই আন্দোলনের জোরও কমে গেছে। কিশোরী ধাড়া ভরাটি গলা তুলে কম্যাণ্ড করে।

—অ্যাটেনশন। ফরওয়ার্ড মার্চ—লেফট-রাইট, লেফট-রাইট—

কোনো নড়াচড়া নেই। পটল কাদার মধ্যে চুপ করে চোপসানো বেলুনের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

কিশোরী ধাড়া হাসছে ঠা ঠা শব্দে। ওদের সব স্বার্থপর-ভীরু আর লোভী স্বরূপকে সে যেন ওই হাসির আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

শেষকালে তরুণবাবুর কথাতেই ত্রিদিববাবুও রাজী হন চাল দিতে। রোজ দু'বস্তা হিসাবে চাল এখানে রান্না হবে সকলের জন্য, আর সে চাল তিনি এমনিই দেবেন। ধার হিসেবে নয়। সকলেই খবরটা শুনে খুশী হয়।

তরুণ কথাটা জানিয়ে বলে পটলের দলকে।

—তোমাদের সেই রান্নার কাজে খাটতে হবে, খেতে পাবে মজুরী হিসাবে। সমর্থ কোনো লোককে রিলিফ দেবার সাধ্য আমাদের নেই। খাটো—খাও। কাজ দোব।

কিশোরী ধাড়া বলে ঃ

—ভেরি গুড। আর বাবা পটলচন্দর, ফুটপাথে কেনা রাংতার মেডেলগুলো ঝুলিয়ে বেড়িয়ো না। ওগুলো যেন আর না দেখি।

সৌরভী বলে ওঠে—ওগুলো যে ওরা গয়না গ, গয়না জান না ?

হাসির সাড়া পড়ে।

পটল নীরব রাগে ফুঁসছে। সব চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে গেল। ওর গালে যেন কয়েকটা চড় কষেছে ওরা নির্মমভাবে। ধূর্ত লোকটা তখনকার মতো চুপ করে সরে এল।

ত্রিদিব মুখুয্যে কোনোরকমে পার পেয়ে সরে এল, তবু ক্ষতি তার বেশই হয়েছে। এই আক্রাগণ্ডার দিনে এত চাল বের হয়ে যাবে। অবশ্য বুঝেছে কিছু না দিলে ওই ধানের মরাইগুলোও আর থাকবে না। উত্তেজিত জনতা তার সব কিছু লুট করে নেবে। তাই সামান্য কিছুর বিনিময়ে সে বৃহত্তর আরও কিছু পেতে চায়! এই ধান গুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তার জন্য কিছু সে ব্যয় করছে মাত্র।

ত্রিদিববাবু জানে এবছর ফসল হবে না—সামনের মাস থেকেই চালের দর উঠবে, চাই কি পাঁচ টাকা কিলো হবে। তখন এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে। সাত-পাঁচ ভেবে রাজী হয়ে বাড়ি ফিরছে ক্ষুব্ধ মনে ত্রিদিব মুখুয্যে।

পুটু কেরানীও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। ত্রিদিববাবুর এই বিপদে সেই-ই যে এক মাত্র সঙ্গী, সেই কথাটাই জানাতে চায়। তাই পুটু আশ্বাস দেয়—ওর জন্য ভাব্‌বেন না স্যার। যাক্‌ না কিছু।

পুটু বলে চলেছে।

—কানে জল দিয়ে রাখছি স্যার, দেখবেন ওসব দ্বিগুণ করে টেনে আনবো। যাক্ না ক'বস্তা চাল। তারপর দেখবেন কতগুণ ফিরে আসে।

ত্রিদিব মুখুয্যে ওর দিকে চাইলেন। পুটু এমনিতে ধুরন্ধর আর কৌশলী। তাই ওর এই কথাটা মনে ধরে। তবু শুধোল :

—কি করে আসবে হে পুটু ?

পুটু মাথা মাথা নাড়ে।

—দেখবেন। আর ওই পটলা, ওই তরুণ মাস্টারকে একহাত দেখে নোব স্যার !

—তরুণ মাস্টার ! ওর নাম এই আন্দোলনে পুটুকে জড়াতে দেখে মুখুয্যে একটু অবাক হয়। কিন্তু পুটুকে একেবারে অবিশ্বাসও করতে পারে না, কারণ এসব ব্যাপারে তাকে পুটুর উপরই নির্ভর করতে হয়। ত্রিদিববাবুর এও একরকম নীতি। তাই পুটুকে এই ব্যাপারে তরুণকে জড়াতে দেখে ওর দিকে চাইল।

তরুণ মাস্টারের সম্বন্ধে অবশ্য ত্রিদিববাবুর ধারণা কেমন ছায়া-ছায়া মতো। ত্রিদিববাবু চুপ করে রইল। লোকে অনেকেই জানে ত্রিদিববাবু কোনো সাতপাঁচে থাকে না, যতো গোল বাধায় ওই পুটু কেরানীই। পুটু নানাভাবে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে চাপ দিয়ে নয়তো কৌশলে।

অবশ্য ত্রিদিববাবু আড়াল থেকে ও সবই জানে, আর কিছু প্রণামী পুটুও দেয় ওকে। ফাঁক থেকে ত্রিদিববাবু নিপাট ভালোমানুষটি সেজে থাকে। পুটুর কথায় তাই বলে—তরুণ মাস্টারও জুটেছে ওদের সঙ্গে ? কিন্তু এদিকে তো দেখলাম অন্যরকম ?

পুটু জানায়—এটা দেখাতে হয় মুখুয্যেমশায়, আসলে এরা সব একরকমই।

হাসছে পুটু ! তার কথার মূলে যে কঠিন সত্য নিহিত রয়েছে,

এটা সেও জানাতে চায়। ত্রিদিববাবু তরুণের সম্বন্ধে ছ'চারটে কথা শুনেছেন, মনে হয়, সত্যি হতেও পারে। তরুণ ওদের এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে রয়ে গেছে—ঠিক তারই মতো। ত্রিদিববাবু তাই ভাবছে।

গোবিন্দ মুন্সীও দেখছিল ব্যাপারটা। সে ও-সব গোলমালে থাকে না, আর তার কিছু এমন নেই যে ওরা হানা দেবে। সবই গেছে, তবু ভাবছিল গোবিন্দবাবু গোলমালটা যদি বাধে ভালোই হয়। তাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে নেমে এসেছে। কিন্তু সব কেমন ফস্‌ফাস হয়ে গেল। মিইয়ে গেছে সবাই।

সৌরভীকে সামনে দেখে গোবিন্দ মুন্সী বলে—যাচ্চলে! কি হল রে ?

সৌরভী বলে বাঁধানো দাঁতে খামচানি সার গো ; মগের মুলুক কিনা ?

হাসছে গোবিন্দ—লয়তো কি বাবা ? দেশ ভেসে গেল—মানুষগুলো শেষ হয়ে গেল, কেউ কোথাও নাই। এঁ্যা, বলি একি দেবতার রাজ্যি ? বুঝলি সৌরভী। দানব—সব দানবের ভিড়ে ভরে গেছে বাবা।

বৃদ্ধ বেদান্ততীর্থ নেমে এসেছেন, তিনিও দেখেছেন ব্যাপারটা। বৈষয়িক মানুষ তিনি নন, নইলে সেদিন বানে ডোবার আগে কিছু জিনিসপত্র অনেকের মতোই সরাতে পারতেন ; তা পারেন নি, শুধুমাত্র কিছু পুঁথিপত্র আর কুলদেবতা ওই শালগ্রাম শিলা সম্বল করে পুত্রবধূ আর নাতির হাত ধরে সব ছেড়ে এসে উঠেছেন এখানের এই নরকে।

তিনি ভেবেছিলেন মানুষের সমাজেই যাচ্ছেন, সেখানে আশ্রয় পাবেন, ছ'মুঠো যা হোক কিছু জুটবে।

কিন্তু সেই ধারণা তাঁর বদলে গেছে এই ছ'দিনেই। হয় মানুষের

স্বভাবও বদলে গেছে। আজ কেউ কারোও জন্যে ভাবে নি। এতগুলো মানুষ সামগ্রিক এমনি প্রচণ্ড বিপদেও এক হতে পারে নি। ভিন্ন ভিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবু দু'চারজন যারা ভাবে আরও অন্যমানুষগুলোর জন্য, তাদের সংখ্যাও কম। আর দেখেছেন বেদান্ততীর্থ তাদের এই স্বার্থপরের দল মানে না। সেই ভালো মানুষগুলোর সামর্থ্য সীমিত। হয়তো নেই। তাই সকলের দুর্ভোগই বেড়েছে মাত্র।

কোনো সাহায্যই তিনি পান নি, গ্রহণও করেন নি। দেখেছেন কিভাবে এই দু'দিন তাঁর নাতি বৌমা কাটিয়েছে, নিজের কথা ছেড়েই দিলেন। সারা দিন ফটিকের কিছু খাওয়া জোটে নি। বেদান্ততীর্থ শুনেছেন বিজয়ার অপমানের কথা; ফটিকের হাত থেকে দু'খানা রুটিও ওরা কেড়ে নিয়েছে, তাকে দেয় নি। ভিখারীর মতো অপমান করেছে ছেলেটাকে।

বৃদ্ধ গিরীশ বেদান্ততীর্থ জীবনের শেষ পাদে এসে মানুষের এই কঠিন স্বার্থপর রূপটাকে দেখে বেদনায় শিউরে উঠেছেন। আজ দেখেছেন ওদের লোভ লালসায় ভরা অন্যরূপকে। এমন সময় গোবিন্দ মুন্সীর ওই কথাটা শুনে সত্যি বলেই মনে হয়।

বুড়ো গোবিন্দের কথায় বলেন,

—যথার্থ দানবের রাজ্য বাবা; নাহলে এত বড় সর্বনাশের পরও মানুষ এতটুকু বদলায় নি। বরং আরও কঠিন আর হিংস্র হয়ে উঠেছে। আর এর দামও তাদের দিতে হচ্ছে গোবিন্দ, আরও মূল্য দিতে হবে।

সৌরভী শুনছে বেদান্ততীর্থের কথা ওই দজ্জাল মেয়েটার মনে হয় এই কথাটা সত্যি তার জীবনেও। সেখানে শুধু অমানুষের ভিড়।

গোবিন্দ মুন্সী মেজাজে থাকে। আজও কিছু ধান্যেশ্বরী জুটেছে। ওই বেদান্ততীর্থকে এখানে দেখে খুশী হয় নি সে। সৌরভীকে কিছু কথা বলার ছিল। তার মাঝখানে বুড়ো এসে পড়েছে।

গোবিন্দ বুড়োর দিকে চাইল। লোকটাকে সে এড়িয়ে চলে, হয়তো এইবার শাস্ত্র স্মৃতি পুরাণের দোহাই পাড়বে। সৌরভীর লালসাভরা দেহটার দিকে ওর নজরই বেশী; বুড়োর কথায় কান দিল না। বুড়ো বেদান্ততীর্থ শুধোয়ঃ

—বিমল কোথায় হে, তোমাদের বিমল ডাক্তার ?

সৌরভী বুড়োর গলার স্বরে একটু অবাক হয়। তাই শুধোলো সেঃ

—কেন ঠাকুর মশাই! ডাক্তারকে খুঁজছেন কেন ?

—কাল থেকে ফটিকের জ্বর, আজ দেখছি বেশ বেড়েছে।

আরও কি যেন বলতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু পারেন না। অভাব আর যন্ত্রণার কঠিন নগ্নরূপটা তাঁর সারা মনকে হতাশার যন্ত্রণায় ভরে তুলেছে, বিবর্ণ করে দিয়েছে। বুড়োর কোটরাগত দু'চোখ জলে ভরে আসে সেই ভাবনায়। সৌরভীর তা নজর এড়ায় না। ওইই বলে—ওই তো ডাক্তার রয়েছে হোথায়। আমি ডেকে দিই।

বেদান্ততীর্থ বলে—থাক বাছা, আমি যাচ্ছি।

নিজেই এগিযে গেলেন বেদান্ততীর্থ, নিজেকে আজ অত্যন্ত অসহায় বলে বোধ হয়।

সৌরভী ওই বৃদ্ধকে শ্রদ্ধা করে।

দেখেছে সাত্ত্বিক নির্লোভ একটি মানুষ। সদানন্দময়। কোনোদিন ওঁকে এইভাবে মুষড়ে পড়তে দেখে নি—আজ দেখেছে অসহায় বৃদ্ধের দু'চোখ ছাপিয়ে জল নেমেছে কি বেদনায়।

সৌরভী বলে—বট বিরিক্ষিরও শোক বাজে গ' মুন্সীমশায়।

গোবিন্দ কি ভাবছিল। ওই মেয়েটার কথায় গোবিন্দ হকচকিয়ে ওঠে।

—এ্যাঁ! শোক! বট বিরিক্ষি কেন বাবা—এই তো চন্দন গাছ রইছি আমি, মনে ধরলো না ? এই সুরো—

আলো-আঁধারির সিঁড়ি পথটায় ওরা দু'জনে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবিন্দের নেশাজড়ানো মনে কোনো বিকৃতি নেই, ও তেমনি স্বপ্নের ঘোরেই রয়ে গেছে, তাই সৌরভীর দেহে খুঁজেছে নেশার সাড়া।

সৌরভী অবাক হয়,

—কি লোক গো তুমি? মানুষ না জানোয়ার?

আবছা অন্ধকারে কাকে আসতে দেখে গোবিন্দ চাইল। সৌরভীর হাতখানা ওর হাতে। সৌরভী ওটা ছাড়িয়ে নিতে চায়।

লোকটা কাছে আসতে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলোর আভাসে চেনা যায় ওকে, কিশোরী ধাড়া ফিরছে যেন যাত্রার আসর থেকে হাততালি কুড়িয়ে। সে আসছিল। ওদের তুজনকে দেখে বলে,

—ভালো আছো বাবা গবু শ্লা, নেশার আমেজটাকে মাঠে মেরে দিয়েছে। দাও না তু'ঢোঁক পেঁদিয়ে দিই বদাম্ বদাম্ করে।

গোবিন্দের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে গলায় ঢেলে মুখ মুছে বোতলটা ফিরিয়ে দিয়ে কিশোরী ধাড়া বলে চলেছে—

উইশ ইউ গুড লাক্—নীরো। বুঝলে বাবা হোয়াইল রোম বার্নড্—নিরো ফাইডল্! রোম জ্বলুক—তুমিও ব্যায়লা বাজাও বাবা। চালাও পান্সী বেলঘরিয়া।

চলে গেল কিশোরী।

সৌরভীও শুনেছে কথাগুলো। ঠিক তার মানে বুঝতে না পারলেও জেনেছে ওকে সে নেহাত পয়সার লোভে দেহ বেচা মেয়েদের দলেই ফেলেছে, আর এই বিপদের মাঝে—মৃত্যুর মাঝে সেও যেন সেই ঘৃণ্য বেসাতি সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।

সৌরভী রেগে উঠেছে। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে সৌরভী গোবিন্দকে।

—পথ ছাড়। এততেও মরণ হয় না : এতো শ্যাল কুকুর মরে আমি মরি না?

কি তীব্র সচকিত বেদনায় ওর তু'চোখ জলে ভরে আসে। গোবিন্দও অবাক হয়—যা চলে!

ও ঠিক এই যন্ত্রণাটাকে বুঝতে পারে না, বোঝার মতো মানসিক প্রস্তুতিই তার নেই—ছিল না কোনোদিনই। তাই সৌরভীকে বদলে যেতে দেখে সে বিরক্ত হয়েছে মাত্র। মেয়েটা চলে গেল।

—ধ্যাত্তেরি। সতীপনা!

গোবিন্দ মুন্সী খিস্তি করে আপনমনেই।

সব মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছে ওই বুড়ো বেদান্ততীর্থ এসে, বাকী চার ঘুলিয়ে দিয়েছে কিশোরী।

গোবিন্দ ক্ষুণ্ণমনে গলায় খানিকটা মদ ঢেলে সতেজ হয়ে উঠল।

বৈকালের দিকে আবার ছড়ানো কালো কালো মেঘগুলো জমাট বাঁধে আকাশে, ওদের যাবার নাম নেই, যেন মৌরসী পাট্টা নিয়ে একদল কালো দৈত্য নীল আকাশকে ঘিরে রেখেছে—হাওয়ার দাপট বাড়ে। এতক্ষণ ধরে নিরাশ্রয় বানে ভাসা মানুষগুলো তবু নানা সমস্যা নিয়ে কলরব করছিল, কিন্তু এই প্রকৃতির করাল রুদ্ররূপে আবার ওরাও ঘাবড়ে গেছে। তাই চুপ করে গেছে মানুষগুলো কি ভয়ে।

ক্রমশ ফিকে, তারপর জমাট অন্ধকার নামছে। কেরোসিন তেলও নেই, যা আছে তাতে দু' একটা বাতি জ্বালা যাবে। মণি দত্ত মাথা চাপড়াচ্ছে। নিদেন যদি দু'চার টিন কেরাসিন তেল বেশী করে কিনে রাখতো তবু এই মওকায় কিছু লাভ করতো, তাও নেই। নগদ লাভটা নিজের ভুলের জন্যই হাতছাড়া হয়ে গেল তার।

অন্ধকারে বেদান্ততীর্থ চুপ করে বসে আছেন। বিজয়া ছেলের মাথায় হাত বোলাচ্ছে। ফটিকের গাটা বেশ গরম, চোখ দুটো জ্বরের ঘোরে লালচে হয়ে উঠেছে। সুন্দর দুরন্ত ছেলেটা একদিনের জ্বরে নেতিয়ে পড়েছে।

বিজয়া ওকে ডাকছে।

—ফটিক! বিজয়ার সারা মনে তীব্র অনুশোচনার গ্লানি।

ছেলেটাকে সে নির্দয়ভাবে মেরেছে, এখনও কপালটা ফুলে রয়েছে। সারাদিন ওকে কিছুই খেতে দিতে পারে নি, এতটুকু দুধ—দু'খানা রুটি তাও দেবার সামর্থ্য তার নেই; শুধু অপমানই সয়েছে। চারিদিকে ওদের জমাট অন্ধকার ঢাকা অরণ্যানী। প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতা নিয়ে ওদের চারিদিকে যারা রয়েছে তারা মানুষ নয়, অন্য কোন প্রাণী।

এই মৃত্যুপুরীর অন্ধকারে মা আর ছেলে কি চরম আতঙ্কে শিউরে উঠেছে, তবু বিজয়া ওকে অভয় দেয়।

—ভালো হয়ে উঠবি বাবা। ফটিক মায়ের হাতখানা ধরে ওই স্পর্শটুকুতে যেন কি আশ্বাস খোঁজে। ফটিকের এখানে ভালো লাগে না। দেখেছে ওই মোটা পুটু, ওই ঝগড়াটে বুড়ি, আরও অনেককে। এখানের মানুষগুলো ভালো নয়, তাই ফটিক শুধোয়,—কবে বাড়ি যাবো মা? এখানে ভালো লাগছে না। এরা বিশ্রী।

বিজয়া তা জেনেছে। ছেলের কথায় অসহায় মায়ের দু'চোখ জলে বুজে আসে।

বাড়ির অস্তিত্বও তার নেই।

বেদান্ততীর্থ চুপ করে বসে ওদের কথা শুনছেন। নীরব আশাহত মন বেদনায় মুচড়ে ওঠে। সেই ঘর, শান্ত সবুজ ফুলফোটা পরিবেশ আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে তাঁর জীবনের মতোই, শুধু ক্ষত-বেদনায় আর যন্ত্রণায় তা বিকৃত আর বিবর্ণ। কি অপরিসীম শূন্যতায় সেই স্মৃতিগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে।

স্ত্রী গেছে, একমাত্র কৃতী সন্তানও অসময়ে চলে গেল; তবু আবার ঘর গড়েছিলেন তিনি ওই নাতির মুখ চেয়ে। সে ঘরও তলিয়ে গেছে। বৃদ্ধ ছিন্নমূল বনস্পতির মতো প্রচণ্ড আঘাতে লুটিয়ে পড়েছেন, শাখা-শ্রয়ী পাখিগুলো ঝড়ো আকাশে ভীত আতঙ্কিত কলরব তোলে। বাতাসে ওঠে বুকফাটা আর্তনাদ। বেদান্ততীর্থ সেই বজ্রাহত বনস্পতির মতোই স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

তবু বিজয়া বলে ফটিককে ঃ

—হ্যাঁ, বাড়ি যাবো বৈকি। বান সরে যাবে। আবার কাশফুল ফুটবে, উঠোনের শিউলি গাছের পাতা ছেয়ে ফুটবে সাদা ফুলগুলো। পূজোর সময়—

ফটিক বলে ঃ

—এবার একটা ভালো জামা দিতে হবে মা, জামা আর প্যান্ট প'রে দাত্বর সঙ্গে চাটুজ্যেদের বাড়িতে পূজো দেখতে যাবো। ঢাক বাজবে।

শরতের সবুজ ধান গাছের ছোঁয়াভরা শিহরলাগা দিগন্ত—গ্রাম-গ্রামান্তরের দিক থেকে ভেসেআসা ঢাকের গুরু গুরু শব্দ, হলুদ আলোভরা কাশবন সব মিলিয়ে শিশুমনে কি ব্যাকুল আনন্দ আনে। গ্রামের পথে পথে সে দেখেছে তার মনের চোখে নিজের নোতুন জামাপরা ছবিটা ; সেটার অস্তিত্ব বাস্তবে পরিণত হয়েছে তার অতৃপ্ত শিশুমনে।

এই কল্পনা করে ফটিক তার অসুখের যন্ত্রণাকে ভুলেছে।

বিজয়া ছেলের ওই মলিন মুখে হাসিটুকু দেখেছে।

বিজয়া জানে ঐ স্বপ্ন হয়তো এবার সত্যি হবে না। তবু আশ্বাস দেয়। —তাই যাবে বাবা। নোতুন জামাও হবে পূজোতে।

—আর অনেক লুচি খাবো কিন্তু, লুচি সন্দেশ পরমান্ন।

বুভুক্ষু উপবাসী শিশু সেই স্বপ্নকল্পনা নিয়েই তৃপ্ত হতে চায়। বেদান্ততীর্থ শিউরে ওঠেন।

মহাভারতের যুগ থেকে বহু যুগান্তরের পরও নিঃস্ব রিক্ত অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের সন্তান অশ্বত্থামার কথা মনে পড়ে। দুধ দেবার সামর্থ্য ছিল না ব্রাহ্মণের। পিটুলি গোলা জলকেই দুধের সত্যে পরিণত করেছিল ; সেই অশ্বত্থামার মতোই আজও কোন হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ-শিশু শুধুমাত্র স্বপ্নকল্পনায় তার লুচি সন্দেশের তৃপ্তি অনুভব করে খুশী থাকতে চায়।

অশ্বত্থামা তাই বোধহয় চিরন্তন সত্য,– সে মরে নি, সে অমর হয়ে ঘরে ঘরে দুঃসহ দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করে বেঁচে আছে ওই ফটিকের মতো।

বিজয়া ওকে আশ্বাস দেয়—তাই খেও বাবা।

ছেলের গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বিমল ডাক্তারও দেখে গেছে।

বলে সে—ওষুধপত্তর তেমন তো আনতে পারি নি মা, যা আছে তাই দিয়েই দেখতে হবে, ভয় নেই।

বিমল ডাক্তার ওকে সান্ত্বনা দিয়ে দু'পুরিয়া ওষুধ রেখে গেল। বেদান্ততীর্থ চুপ করে সবই দেখেন—যেন নিস্পৃহ নিরাসক্ত দর্শক, তাঁর সামনে ঘটছে, তবু মনে হয় বাস্তবে তাঁর যেন কোনো অস্তিত্ব নেই। অন্ধকার কূলহীন কোন কালান্তরের তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

—বৌ! অন্ধকারে ফিসফিসিয়ে ওঠে ভূষণের গলার স্বরটা।

মানুষের কণ্ঠস্বর এ নয়, কোনো প্রেতাত্মার মতো তারা বসে আছে মৃত্যুর অন্ধকার জগতে। কোথাও আলো নেই, বৃষ্টি একটু থেমেছিল। দিনের আলোয় ওরা দেখেছিল ওই মানুষগুলোকে তাদের দিকে আসতে, তরুণবাবু ও ছেলেদের নিয়ে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দুর্বার স্রোত তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। ওরা এগোতে পারে নি। এই স্রোতের কাছে বার বার হার মেনে ফিরে গেছে তারা। ভূষণ আর মিনি ওই বাচ্ছাটিকে নিয়ে পড়ে আছে।

অন্ধকারে একটা সাড়া ওঠে—ক্ষীণ কাতরানির স্বর। চমকে ওঠে মিনু। খোকন যেন কাঁদছে। ফিসফিসিয়ে ওঠে সে।

—খোকন।

পরক্ষণেই মনে হয় খোকন নয়, কাঁদছে শকুনটা—অন্ধকারে ওর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়, বোধহয় কোনো ছেলেই কাঁদছে। শকুনটা

নেবার উপায়ও রাখে নি। যেন দম বন্ধ হয়ে আসে চামেলির। তাই ওই বদ্ধ পরিবেশ ছেড়ে চামেলি এই ছাদে এসে দাঁড়ায়।

একটা ঘরে মা-বাবা নিজে রয়েছে। আশপাশের ঘরগুলো লোকের কলরবে—ঝগড়ার শব্দে—ছেলেদের চীৎকারে কলকল করছে। এই বন্দী মানুষগুলোর স্বভাবে আজ কোথাও এতটুকু বু ধর্য আর নেই। যা টিকে আছে তা হচ্ছে নীচতা আর জঘন্য তার গুলো।

চায়। শর ঘরের মণির বাঁজা বৌটাকে দজ্জাল শাশুড়ী বকছে কদর্য নেই। বে বুড়ির গলার বাদ্যি আর থামে না। বৌটাও জবাব দেয়, কোনো উত্তাপ ওঠে আর চেঁচায়ঃ

মিনু চমকে ও তোর বাঁজা তালগাছ কোথাকার? হিজড়ে সে আগলে রাখবে ও সোয়ামীও তাই ছোঁয় না।

ঘুমোচ্ছে সে। ঘুমুক! বেচা ছেলের মুরোদ আছে? ও একটা মাদী।

মিনু খোকনকে মৃদু মৃদু চাপড়াচ্ছে।

একটা ছবি ভেসে ওঠে। শান্ত চাঁদওঠা আঙিনায় ক'দিনে নিয়ে বসতো, তারাফুল ছিটোনো আকাশ। ঝড়ো হাওয়া চন্দ্র। আলোমাখা বাঁশবনে সুর তুলেছে, রান্নার উনুনে কাঠ জ্বলছে, সেই আগুনের লাল আভাটুকু অন্ধকার রান্না ঘরে কবোষ্ণ ভাব এনেছে। হরিসভা থেকে খোল কর্তালের শব্দ মেশে বাতাসে। শান্ত রাত্রি, সুন্দর রাত্রি। মিনু সেই ছবিগুলোর কথা ভোলে নি।

ভাত! গরম ভাতের কথা মনে পড়তে চমকে ওঠে মিনু; মনে হয় ক'দিনই তারা কিছু খায় নি। পেটের ভিতর নাড়িগুলো পাক দিচ্ছে, সারা শরীরের দেহকোষ সেই আহার্যের স্বপ্ন দেখছে অন্তহীন প্রতীক্ষা নিয়ে। ভাত! কি যেন স্বপ্ন দেখছে মিনতি। কলাই গুঁড়ো মাখা ভাত তার সঙ্গে পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কার স্বাদ-এর কল্পনা কতো দিন কত মিষ্টি নিশ্চিন্ত সন্ধ্যার আভাস আনে।

—মিনু! অ মিনু!

অশ্বত্থামা তাই বোধহয় চিরন্তন সত্য,— সে মরেনি, সে অমর হয়ে ঘরে ঘরে দুঃসহ দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করে বেঁচে আছে ওই ফটিকের মতো।

বিজয়া ওকে আশ্বাস দেয়—তাই খেও বাবা।

ছেলের গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বিমল ডাক্তারও দেখে গেছে।

বলে সে—ওষুধপত্তর তেমন তো আনতে পারি নি মা, যা আছে তাই দিয়েই দেখতে হবে, ভয় নেই।

বিমল ডাক্তার ওকে সান্ত্বনা দিয়ে দু'পুরিয়া ওষুধ রেখে ... সে বেদান্ততীর্থ চুপ করে সবই দেখেন—যেন নিস্পৃহ নিরাসক্ত ...রাশার তাঁর সামনে ঘটছে, তবু মনে হয় বাস্তবে তাঁর যেন কো... একটি চরম নেই। অন্ধকার কূলহীন কোন কালান্তরের তীরে এ... তিনি।

...গার গলার স্বরও

..., ও বলে,

... আর একটা রাত বই তো

—বৌ! অন্ধকারে ... সামলে বস।

মানু... পায়ের কোনো সাড় নেই, ভুলেই গেছে যে খোকন আ... কোলে রয়েছে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে। অন্ধকারে কোলের ...শুর মুখও দেখা যায় না।

রাতের অন্ধকারে চামেলি এসে ছাদে দাঁড়িয়েছে। জলবন্দী মেয়ে-ছেলে-পুরুষ ওই বাড়িটায় গিশগিশ করছে। বদ্ধ ঘরে আলো হাওয়া ঢোকে না, আর তেমনি স্যাঁতসেঁতে।

গোবিন্দ মুন্সীর পুরোনো বাড়িগুলো মেরামত করার সাধ্য আর নেই, তাই চুনবালি খসে গেছে। নোংরা বাড়িটা, তাকে আরও নোংরা করে তুলেছে এই মানুষগুলো। দিনরাত ওরা চীৎকার আর ঝগড়া করছে। জলকাদার দাগ বারান্দায় ঘরে। ময়লা কাঁথা, ভিজে কাপড়ের ওই ময়লার জমাট গন্ধ বাতাস ভারি করেছে, নিঃশ্বাস

নেবার উপায়ও রাখে নি। যেন দম বন্ধ হয়ে আসে চামেলির। তাই ওই বদ্ধ পরিবেশ ছেড়ে চামেলি এই ছাদে এসে দাঁড়ায়।

একটা ঘরে মা-বাবা নিজে রয়েছে। আশপাশের ঘরগুলো লোকের কলরবে—ঝগড়ার শব্দে—ছেলেদের চীৎকারে কলকল করছে। এই বন্দী মানুষগুলোর স্বভাবে আজ কোথাও এতটুকু মাধুর্য আর নেই। যা টিকে আছে তা হচ্ছে নীচতা আর জঘন্য স্বরূপগুলো।

পাশের ঘরের মণির বাঁজা বৌটাকে দজ্জাল শাশুড়ী বকছে কদর্য ভাষায়। বুড়ির গলার বাদ্যি আর থামে না। বৌটাও জবাব দেয়, বুড়ি তত জ্বলে ওঠে আর চেঁচায়ঃ

—মরণ হয় না তোর বাঁজা তালগাছ কোথাকার? হিজড়ে মাগীকে ঘরে এনেছিলাম, সোয়ামীও তাই ছোঁয় না।

বৌটা ফুঁসে ওঠে—তোর ছেলের মুরোদ আছে? ও একটা মাদী।

—কি বললি?

এমন সময় লাফ দিয়ে ঘরে ঢোকে মণি দত্ত। ওর ক'দিনে রোজগারপাতি মন্দ হয় নি। তাই মেজাজটা গরম হয়েই ছিল। তারপর বৌএর কথা শুনে জ্বলে ওঠে বীরপুরুষ মণি দত্ত। বৌটাকে ধরে বেদম ঠাঙাতে থাকে। চুলের মুঠি ধরে ফেলেছে। বৌটা ছাড়াবার চেষ্টা করে।

মণে চীৎকার করে—খুন করেঙ্গা মাগীকে। শেষ করে দেবো। মরদ কিনা তাই দ্যাখ!

লোকজন জুটে যায়। পটলাও এসেছে, বিমল ডাক্তার ছুটে আসে খুনোখুনি ব্যাপার দেখে। রথের মেলার মতো ভিড় জমে যায় ওই নিচের বারান্দায়!

চামেলি ওই সব গোলমাল থেকে সরে এসেছে।

অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে আসছে; ওদিকে কাদের দেখে দাঁড়াল। এখানে আলো বিশেষ নেই, কারণ গাঁয়ে কেরাসিন তেলও ফুরিয়ে

এসেছে। অন্ধকারে একদল প্রাণী হারিয়ে গেছে—তাই ওদের অন্তরের অতল থেকে সেই চিরন্তন দানবীয় প্রাণীটা মাথা তুলেছে আদিম লালসা নিয়ে।

অন্ধকারে ওই ছায়ামূর্তি দুটো যেন নিবিড়ভাবে মিশে গেছে। ওদের দু'চোখ জ্বলছে। ফিসফিসানি কথাগুলো আর হাসির টুকরো ওদের বিচিত্র মনের লালসার রূপ নিয়ে জেগে উঠেছে সুপ্তিমগ্ন অন্ধকারে।

থমকে দাঁড়িয়েছে চামেলি, এই হাসি টুকরো কথাগুলোর অর্থ না-বোঝা না-জানার গণ্ডী পার হয়ে কি আদিম প্রবৃত্তিকেই জাগিয়ে তোলে। আজও অন্ধকারে চামেলি পুটু কেরানীকে চিনতে পারে।

পুটু কেরানীর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে চামেলি, মেয়ে মহলে ও আতঙ্কের বস্তু। আজ আদিম অন্ধকারে পুটুর সেই পরিচয়টাকে নগ্নভাবে প্রকাশিত হতে দেখে চামেলি শিউরে উঠেছে। পুরুষ আর নারীর এই অন্তরালের বুভুক্ষার জ্বালা তার কুমারী মনে ভয় আর লজ্জামেশানো অনুভূতি আনে।

আবছা অন্ধকারে সে চিনতে পারে ওই মেয়েটিকে। পুটুর অফিসে ও দেখেছে তাকে। কিন্তু এখানে দেখবে ভাবে নি।

তাদের গ্রামেই থাকে ও। গ্রামসেবিকা মনোরমাকে সেও চেনে।

পুটু বলে চলেছে,—দু' একদিন সবুর করো মনো—তারপর সব হবে।

—ছাই হবে। মনোরমা বিরক্তি ভরে বলে।

পুটু কেরানী ওকে কাছে টেনে নেয়। মেয়েটার গোলগাল মাংসল চেহারা, পুটু তার দেহটাকে কি নিবিড় চাপে পিষে ফেলতে চায়।

চামেলি এই দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে। এই নির্লজ্জ কামনার প্রকাশটাকে এভাবে সে এর আগে কোনোদিন দেখে নি।

মনোরমা কোনো প্রতিবাদই করে না, হাসছে মেয়েটা। দুচোখে

ওর কি নেশার সাড়া, আর পুটু কেরানীও সেই নেশার আগুনে মেতে ওঠা ফড়িং-এর মতো এগিয়ে চলেছে একটি আলোকশিখার দিকে।

চামেলির বুক কাঁপছে। তার কাছে পুরুষ নারীর গোপন সম্পর্ক সম্বন্ধে আলো আঁধারির অজানা রহস্য মেশানো একটা। ধারণা ছিল, সেটা ছিল অনেক সুন্দর আর বর্ণময়। সেই রঙীন ছবিটাকে ঘিরে আর একজনের ছায়াও জেগেছিল, সেই তরুণকে মনে পড়ে। ও যেন সেই স্মৃতির আলোয় রাঙানো একটি সত্তা।

কিন্তু রঙীন বর্ণালীর জগতে কে এক পোঁচ কালো কালির পোঁচড়া বুলিয়ে ছবিটাকে বিকৃত-বিবর্ণ করে তুলেছে।

চামেলি অজানা ভয়ে কাঁপছে, শিউরে উঠেছে কি ঘৃণায়।

অন্ধকারে ওই মোটাসোটা কালো মেয়েটার চোখে হয়তো ভালোলাগার নেশা, ও পুট কেরানীর ওই অত্যাচারটাকে মেনে নিয়েছে—কিছু সুবিধা না হয় টাকার জন্যই। অন্ধকারে ওদের উত্তেজিত নিঃশ্বাস-এর ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শোনা যায়; দেখা যায় না সেই মূর্তি দুটোকে—অন্ধকারে ওরা যেন তালগোল পাকিয়ে একটা বিকৃত পাশবরূপে পরিণত হয়েছে।

চামেলি চুপি চুপি পালাচ্ছে ভয়ে, ওপাশ দিয়ে সে ছাদে উঠে এসে দাঁড়াল।

মুক্ত হাওয়ার ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় ওর উত্তেজিত দেহের অণুপরমাণুগুলো শান্ত হয়, দিগন্তপ্রসারী জলের রুপোলী বিস্তারে আঁধার কেমন বিকৃত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বাতাসে ওঠে জলস্রোতের গর্জন।

চামেলি ছাদের আলসেয় মাথা রেখে দাঁড়াল। বিস্তীর্ণ ছাদ। বড় বাড়িটা অন্ধকারে এই রাত গভীরে একটা অতিবৃদ্ধ স্থবির জানোয়ারের মতো পড়ে আছে, আর ওর অন্তর গভীরে চলেছে কতো

দানবিক জঘন্য কাণ্ড। লোভ-লালসা আর কান্নার দীর্ঘশ্বাসে ভরা এর বুক ; বাইরে শুধু ধ্বংস আর ভিতরে ওর পচনধরার যন্ত্রণা। একটা ছেলে খিদেয় কাঁদছে, ওর মায়ের গর্জন শোনা যায় অন্ধকারে।

—যমের বাড়ি যা, এত খেয়েছিস এখনও খিদে মিটল না পাপের ?

মার খেয়ে মণি দত্তের বৌটা তখনও কাঁদছে ঘ্যান ঘ্যান করে।

ওদিক থেকে অন্ধকারে কার ভরাটি গলার আবৃত্তির সুর ভেসে আসে সব কান্না আর কলরব ছাপিয়ে।

কিশোরী ধাড়ার গলা। চামেলি কান করে শোনে ওর আবৃত্তিটা। বোধহয় কোনো নাটকের অংশ আবৃত্তি করছে সে।

ধীরে মিশে কাল,
অনন্তের কোলে—
কতোদিন, কহো কতোদিন আর
রহিব বসিয়া।
শুষ্ক অস্থি অক্ষরূপে
করি সঞ্জীবিত—রেখেছি যতনে,
এই বজ্রে কুরু চূড়া পড়িবে খসিয়া।
অন্ধকার, কারাগারে বন্দী পিতা
গান্ধার ঈশ্বর ;
শত ভাই মোর, কহো কতদিন আর ?

অন্ধকারে ওই বিচিত্র শব্দগুলো কি বুক চাপা যন্ত্রণা নিয়ে রাতের হাহাকারভরা বাতাসে মিশেছে, জলবন্দী শত শত মানুষের মুক্তি প্রতীক্ষার কোন যন্ত্রণা ফুটে ওঠে ওই আবৃত্তিতে, চামেলির মনে হয় কি চরম সর্বনাশের প্রতীক্ষায় তারা জাগর রাত্রির অতন্দ্র প্রহর গুণে চলেছে।

অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। চামেলির ভয় হয়।

—কে! পিছনেই কার পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে চামেলি।

ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে আসছে। ওর চোখে-মুখে কি বীভৎসতা মাখানো, হাতটায় রক্তের দাগ, লোকটা ওকে চমকে উঠতে দেখে বলে,

—আমি! এ্যাই চিনতে পারছো না?

চামেলি চিনেছে লোকটা একা এই ধ্বংসপুরীর প্রেতাত্মার মতো রাতের অন্ধকারে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পা দুটো একটু টলছে। চোখ লাল টকটকে।

চামেলি দেখেছে ওর দু'চোখে কি তীব্র জ্বালা, ওই জ্বালা দেখেছিল সে অন্ধকারে পুটু কেরানীর চোখে। হাসছে লোকটা।

চামেলি ভয় পেয়েছে। তবু অস্ফুট স্বরে বলে

—আপনি!

লোকটা জড়ানো গলায় বলে,

—ঠিক ধরেছো। একটু শিকারের সন্ধানে বের হয়েছি রাতের বেলায়।

গোবিন্দ মুন্সী হাসছে খিক্‌খিক্ শব্দে। অন্ধকারে ওর পা টলছে—মুখে বিশ্রী গন্ধ ওঠে। নেশায় চুর হয়ে আছে লোকটা। ওর হাতে দেখা যায় দুটো পাখি ঝুলছে। ওদের ঘাড় মটকানো; ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে পাখি দুটোকে, তখনও ঝটপট করছে দু'এক বার আধমরা পায়রাগুলো।

গোবিন্দ মুন্সী বলে—মাংসের সন্ধানে বের হয়েছিলাম, মানে বুঝলে ওটা আমার চাই। নালে নেশাই জমে না।

চামেলি ওই বিচিত্র লোকটাকে দেখছে।

গোবিন্দ মুন্সী বলে চলেছে জড়িত স্বরে ওই পাখিগুলোকে দেখিয়ে —মাংস খুব ভালো এগুলোর। শ্লা কিশোরীটাও জুটেছে, তাই এসেছিলাম এদিকে। রাতের অন্ধকারে গোলা পায়রাগুলো দেখতে পায় না, দু-একটাকে ধরে বধ করি, বুঝলে চামেলি। বাপ ঠাকুর্দারা ভেবেছিলেন একদিন সব চলে যাবে, জমিদারী, খাজনা আদায় সব।

তাই নেশার মুখে মাংসটা যাতে বংশধর খেতে পায় তাই এতো বড়ো তাজমহল বানিয়ে রেখেছিল। রাজ্যের গোলা পায়রা এসে বাসা বেঁধেছে—এন্তার দুষ্কম্মো করছে, আর ডিম পাড়ছে বাচ্চাও হচ্ছে। আম্মোও রাতের অন্ধকারে দু-একটা করে বধ করে সেবা লাগাচ্ছি।

চামেলি লোকটাকে সহ্য করতে পারে না। রাতের সেই শান্ত রূপটি কি কদর্যতায় ভরে উঠেছে; চামেলি বলে ওকে।

—সরুন, নিচে যাবো।

গোবিন্দ মুন্সী মেয়েটাকে আগেই দেখেছিল, চামেলিকে সুন্দরী বলা চলে। রূপযৌবন দুটোই ওর আছে আর প্রাচুর্য নিয়েই ওটা ওর দেহের কানা কানায় উপচে উঠেছে।

কোথায় একটা রাতজাগা পাখি ডেকে সরে গেল। জলকল্লোলের গর্জনে মিশিয়ে আছে অনেক কান্না।

গোবিন্দ মুন্সী ওর দিকে চাইল। তার নেশা জড়ানো চোখে আরও কিসের নেশা জাগে।

সৌরভী যেন ধেনো পচুই, এর তুলনায় চামেলি বোতলভরা বিদেশী মদ—গোলাপী আভায়, টলটল করছে। ওকে দেখে অন্ধকার নির্জনে মানুষটা নেশায় মেতে উঠেছে। ওর চোখ দুটো জ্বলছে, চামেলি সরে দাঁড়ালো।

গোবিন্দ বলে,

—কোথায় যাবে? ওই নিচেকার বন্ধ গুদোম ঘরে? তার চেয়ে ওই যে দোতলায় ঘরটায়—দিব্যি আলো হাওয়া আছে; আর বুঝলে, ঘরখানা মাইরী ভারি সুন্দর! চল না একটু? কোনো ভয় নাই—দুটো কথাবার্তা বলব, মাংস খাও তো?

ভয়ে চামেলি শিউরে ওঠে। অন্ধকারের এই মানুষগুলোকে এত কাছ থেকে কোনোদিন দেখে নি, আজ ওদের দেখছে। যত দেখছে ততই ঘৃণায় ভরে উঠছে সারা মন। মানুষগুলো কদর্য কোন জীবে পরিণত হয়েছে। এইটাই ওদের আসল পরিচয়।

চামেলি সরে যাবার চেষ্টা করে। গোবিন্দ এগিয়ে এসেছে আরও কাছে। ওর মুখে মদের গন্ধ, চোখ দুটো লালচে—হঠাৎ হাতের সেই আধমরা শিকার দুটো পাখিকে ফেলে দিয়ে তাজা অন্য শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়। চামেলিও ওর মনোভাব বুঝতে পেরেছে। এবার কঠিন হয়ে উঠেছে মেয়েটা। বেশ চড়া গালায় বলে,

—পথ ছাড়ুন।

গোবিন্দ মুন্সী হাসছে। ও নিপাট ভালোমানুষের মতো বলে চামেলিকে ঃ

—রাগ করছো কেন ? দুদণ্ড হাওয়ায় একটু গপ্‌পো করবে বই তো নয়।

চামেলির হাতখানা ধরেছে লোকটা, চামেলির সারা দেহে একটা অসহ্য জ্বালাকর ভাব—ওর দেহের সব রক্ত যেন মাথায় উঠেছে।

ডানপিটে মেয়েটা একপা পিছিয়ে গিয়ে ওই মদ্যপ গোবিন্দ মুন্সীর গালেই সপাটে একটা চড় কসে দেয়।

অতর্কিত আঘাতে গোবিন্দ মুন্সী চমকে ওঠে,

যা বাব্বা ঃ আরে এ্যাই। এ্যাই। সাংঘাতিক মেয়ে তো ! এ্যাই।

চামেলিও এই অবকাশে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিঁড়ির ঘরের দিকে এগিয়ে গেল, গোবিন্দ মুন্সী গালে হাত বোলাচ্ছে—মেয়েটা দেখতে সুন্দর হলে কি হবে—হাতের জোর আছে। তাকে পাত্তাই দিল না।

গোবিন্দ হতাশ হয়ে ওর গতিপথের দিকে চেয়ে মনে মনে নিষ্ফল আক্রোশে গর্জাচ্ছে।

অন্ধকারে কার হাসির শব্দ শুনে ফিরে চাইল গোবিন্দ। একটু চটে উঠেছিল সে, তাই ভরাটি গলায় শুধায়—কে ?

—আমি গো। আমি সৌরভী। তা শিকার ফসকে গেল, নয় ?

মেয়েটা হাসছে খিলখিল করে।

—চোপ। চোপ! খানকী মাগী কোথাকার?

গোবিন্দ হুঙ্কার ছাড়ে।

সৌরভী রুখে দাঁড়িয়েছে। সে বলে,

—গোবিন্দবাবু, অনেক তো করেছো এসব। আর কেনে গ', এবার সব গেছে—তাই বলছিলাম সম্‌ঝে চলো।

গোবিন্দ মেয়েটাকে দেখছে।

গোবিন্দ বাইরে এখনও ঠাটবাট বজায় রাখবার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু যতই চেষ্টা করুক ওর অভাব দৈন্যটাকে ঢাকতে সে পারে নি। বরং সেটা আরও প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে।

জমিজায়গা যা ছিল সে-সব গেছে ত্রিদিববাবুর হাতে। এখন টিকে আছে এই বাড়িটা, সেটাও মেরামতের অভাবে ধসে পড়ছে।

গোবিন্দ মুন্সীর ছেলে বাইরে কোথায় চাকরি করে। স্ত্রী অনেক আগেই মারা গেছে। গোবিন্দ মুন্সী ছেলের কাছেও টিকতে পারে নি। কারণ বৌমা শ্বশুরমশায়ের এই নেশার বাতিকটাকে সহ্য করতে পারে নি। সেখানে গিয়েও মদ খেয়ে বেটর মাতামাতি করতো।

তাই চলে আসতে হয়েছে সেখান থেকেও, এই ভিটেতে একা লোকটা পড়ে আছে।

গোবিন্দ মুন্সী সৌরভীর কথায় একটু কি ভাবছে। এখন ভাবনা তার মনেও মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। খুব কষ্ট হয় আর ভয় হয় লোকটার। তাই সেই ভয় ভাবনাগুলোকে চাপবার জন্যই মদ গেলে সে। সৌরভী জানায়—ওই ভালো মেয়েগুলোকে খারাপ করতে যেও না মুন্সীমশায়, তোমার ও হাল খারাপ হয়ে যাবে।

ও যেন শাসাচ্ছে। গোবিন্দ মুন্সী চুপ করে গেল মরা কবুতর দুটো তুলে নিয়ে।

সৌরভী দেখছে আজ ওই মাতাল লোকটার সেই স্পর্ধাটা।

চামেলিকে চেনে সৌরভী, শান্ত নিরীহ মেয়েটা। আজ চরম

বিপাকে পড়ে ওরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ি ঘর আশ্রয় সব গেছে।

তবু সম্মান নিয়ে ও যেন বাঁচতে দেবে না তাদের ওই লোভী ঘেয়োকুকুরের দল।

অন্ধকারে একটা তারাও দেখা যায় না। আকাশ শুধু আঁধার কালো হয়ে উঠেছে। বাতাসে মিশেছে ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ দাবড়ানির শব্দ, নদীর জলকল্লোল তখনও থামে নি।

সৌরভীর মনে হয় তাকে ও ওরা বাঁচতে দেয় নি।

তার এই রূপ যৌবনই কাল হয়েছিল। সেদিন জানতো না মেয়েটা যে এভাবে স্রোতে গা ভাসিয়ে বাঁচা যায় না। বাঁচতে গেলে পায়ের তলে মাটি চাই থিতু হবে তাকে। একটা ঘরের আশ্বাসও চেয়েছিল সে।

কিন্তু তা হতে দেয় নি ওই মানুষগুলো।

ত্রিদিববাবু, গোবিন্দ মুন্সী আরও কতো মুখ আধারে ভিড় করে আসে। মন ছাপিয়ে ভেসে ওঠে একজনের কথা।

আধারে পায়ের শব্দ ওঠে।

—তুই! এখানে? কিশোরী ধাড়া এগিয়ে আসে।

সৌরভীর চোখদুটো কি নীরব বেদনায় চক চক করে ওঠে। ওই সব ভেসে যাওয়ার কূলে দাঁড়িয়ে হারানো কোন দিনগুলোকে স্মরণ করে মেয়েটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কিশোরীই সেদিন বলেছিল—এখান থেকে পালিয়ে যাবো সৌরভী তোকে নিয়ে।

কিশোরীর কথায় সেদিন চমকে উঠেছিল সৌরভী। সারা মন দিয়ে ওকে ভালোবেসেছিল মেয়েটা। কিন্তু কিশোরীর কোনো কাজকম্মোও নাই। তাই সেদিন হেসেছিল সৌরভী—তারপর? দিন চলবে কিসে গ?

কিশোরী বলেছিল—যেভাবে হোক চলে যাবে।

সৌরভী সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে মেনে নিতে পারে নি।

আজ কিশোরী ধাড়া নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো টাকা রোজগার করে। কিন্তু সৌরভী বুঝেছে সেদিন ওকে অবিশ্বাস করেছিল সৌরভী। ওকে ঠকিয়েছিল আজ নিজেও ঠকেছে।

কিশোরী ধাড়া জানে না ওর মনের ভাবনার কথা।

সৌরভীর চোখে জল দেখে অবাক হয় কিশোরী।

—বাঃ! ক্রাইং? কি ব্যাপার রে? এতো চোখের জল কেন বাবা?

সৌরভীর মনে হয় ওই লোকটাও আজ বদলে গেছে। আগেকার দিনগুলোর সব স্মৃতি ওর মন থেকে নির্বাসিত। সৌরভীর সেখানে মৃত্যু ঘটেছে। সৌরভী বলে—

সেকথা কোনোদিন জানতে চেয়েছো তুমি? ··

হাসছে কিশোরী—জেনে লাভ কি বল? তাই জানতে চাই না।

—তুমি পাথর হয়ে গেছ গো, মানুষ আর নও।

সৌরভী কথাগুলো বলে সরে গেল, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিশোরী ধাড়া অবাক হয়ে ওর পথের দিকে চেয়ে থাকে, বিড়বিড় করে সে।

—যাঃ চলে! এগেন হ্যাট ঝকমারি বিজনেস? গুলি মারো বাবা।

সে কোনোরকমে এগিয়ে চলল তার সাময়িক আস্তানার দিকে।

কবুতর মাংসের রান্না চাপিয়েছে গোবিন্দ মুন্সী। ভিজে বাতাসে তার খোসবু উড়ছে।

ছাদের ভিজে বাতাসে সেই গন্ধটা ভেসে আসে।

চামেলির দু'চোখ ফেটে জল নামে। অভাব দারিদ্র্য তার চেনা, ওগুলোকে সহ্য করতে পারে সে। কিন্তু এমনি অপমান সে কোনোদিন দেখে নি। এর আঘাত যে কতো তীব্র, কতো গভীর এটা চামেলি আজ অনুভব করেছে।

এতদিন এই গোবিন্দ মুন্সী ত্রিদিববাবুদের সে দূর থেকে দেখেছে, পুটু কেরানীকেও দেখেছিল, কিন্তু এত কাছে থেকে ওদের সে দেখে নি।

মণি দত্তকে দোকানে বসে থাকতে দেখতো, কিন্তু ওরা যে এমনি ধরনের জীব তা জানা ছিল না। পটলাকে দেখতো সে, গলায় মেডেল ঝুলিয়ে আটচালার সামনের পথে—না হয় হাটতলায় দল বেঁধে শোভাযাত্রা করে যেতো, দেশের লোকদের ভালোর জন্যে পটলা নাকি ওই মানুষগুলোকে নিয়ে দল বেঁধেছে। সমবেতভাবে তারা পল্লীর কল্যাণ করবে। তাদের আজ ভালোভাবে চিনেছে। চামেলির কাছে মানুষগুলোর নোংরা নগ্ন ছবিটাই আজ সত্য হয়ে উঠেছে।

কল্যাণ! মঙ্গল! কথাগুলোর মানে বুঝতে পারে চামেলি; ততদূর পড়াশোনা তার আছে। সব কিছু নিয়ে ওই মানুষগুলো বেঁচেছিল। কিন্তু এমনি বিপর্যয়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাদের দেখেছে ক'দিন, যত দেখেছে ততই শিউরে উঠেছে।

চামেলির সারা গায়ে একটা জ্বালাকর অনুভূতি জাগে। ঘিন্‌ঘিন্‌ করছে। মাতাল লোকটার ছোঁয়া তার গায়ে। গোবিন্দ মাতাল হয়ে তাকে অপমান করতে এসেছিল। ওরা ভাবে সব মেয়েকেই কিছু টাকা ধরে দিলেই ভোগ করা যায়।

কুকুর! ও যেন ঘেয়ো একটা কুকুর। ওরা সবাই।

পুটু কেরানীকে সেই সিঁড়ির ঘরে অন্ধকারে দেখেছিল ওই মেয়েটার সঙ্গে। কথাটা ভাবতেও সারা গা কি বিজাতীয় ঘৃণায় রি রি করে ওঠে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হয় চামেলির। রাতের অন্ধকার নয়—লোভ পাপ আর আদিম মানুষের সব জঘন্য লালসার এই নির্লজ্জ প্রকাশ তার নিষ্পাপ মনে একটা ভয় আর ঘৃণাকে জাগিয়ে তুলেছে। এ ভয়কে সে আগে জানতো না। আর বিশ্রী লাগে যে দিনের আলোয় আবার অন্য মানুষে পরিণত হয় এরা।

ওই অন্ধকারের হিংস্র আদিম মানুষগুলোই সমাজের বুকে

প্রতিপত্তি নিয়ে বাস করছে। চামেলিদের সেখানে কোনো ঠাঁই নেই। শুধু ওদের আঘাত আর অপমান সয়েই বেঁচে থাকতে হবে তাদের।

রাতের ঝড়ো হাওয়া কাঁপে আধ-ডোবা বাঁশবনে, জলের শব্দও রয়েছে সঙ্গে। ক্লান্ত মানুষগুলোর সব গেছে। কঠিন নির্মম প্রকৃতি তাদের সব কেড়ে নিয়ে এই অনিশ্চিত অকূল যন্ত্রণাভরা কোনো নদীর অসীমে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। কোনো আশ্রয় নেই। ভবিষ্যৎ নেই —সম্ভাবনা নেই।

সামনে ওদের মৃত্যু, চারিদিকে ওদের অবক্ষয় আর পচে ওঠা নরকের পূতিগন্ধ। চামেলি তেমনি কোনো দুঃখের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

—তুমি!

তরুণ ফিরছে ইস্কুলবাড়ি থেকে। সারাদিন তার আজও জলে জলে কেটেছে। সাল্‌তি নিয়ে নিজেই গিয়েছিল এখান থেকে চার মাইল দূরের ব্লক অপিসে। খাবার নেই, জিনিসপত্র নেই, এর মধ্যেই জ্বর, পেটের অসুখ শুরু হয়ে গেছে। বন্দী মানুষগুলো শূয়রের মতো ভিড় করেছে—গাদাগাদি করে আছে এখানের এই ছোট জায়গা-টুকুতে। ওদের জন্য ওষুধ চাই। কলেরা বসন্তের ভ্যাকসিন দিতেই হবে। আর চাই খাবার।

দু'একটা নৌকা না হয় বোট ও যদি পেতো এখনও দূরের জলবন্দী অসহায় মানুষগুলোকে উদ্ধার করে আনতে পারতো। তরুণ জানে ভূষণের মতো অনেক পরিবার এখনও গাছের ডালে, ঘরের চালে কোনোমতে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝে টিকে আছে। কিন্তু তারাও এইবার শেষ হয়ে যাবে।

মাথার ওপর এই বৃষ্টি—ঠাণ্ডা হাওয়ার সাপটা আর অনাহারে ক'দিনই বা টিকে থাকবে তারা!

তাই তরুণ নিজেই গিয়েছিল ওই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরেছে। ওরা আশা দিয়েছেন, যেভাবে হোক খাবার, ওষুধ এসব পাঠানো হবে। দু'একটা বোটও আনাবে। তারই আবেদন নিয়ে গেছল মহকুমায়।

তরুণ এগিয়ে আসছে, এক ফালি টর্চের আলোর সামনে চামেলিকে দেখে দাঁড়ালো। ওকে একলা এই জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুধোয় সে ঃ

—তুমি! এত রাত্রে এখানে?

চামেলি তরুণকে এখানে দেখবে ভাবে নি।

শিব মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছিল চামেলি, ওপাশেই ঢিবির নিচে জলের বিস্তার—অতল জল। শিবতলার দুধসাগর ভেসে গেছে। সেখানে তুফান বইছে। তরুণ তারই মাঝ দিয়ে সালতি চালিয়ে এসে নামল।

চামেলির চোখমুখ থমথমে, ওর ডাগর কালো চোখের পাতায় জল টলটল করছে, তরুণ ওকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়েছে।

চামেলি ওকে জানাতে পারে না সেই অপমানের কাহিনী, ওদের লোভ আর নীচতার কথা। তাতে নিজের গায়েই কাদা লাগবে। সহজ হবার চেষ্টা করে সে। চামেলি জানায় ঃ

—ঘরের ভিতরে গুমোট-গরম; তাই বাইরে ফাঁকায় দাঁড়িয়েছিলাম।

তরুণ বুঝতে পারে চামেলি তার কাছে আসল কথাই চেপে গেছে।

মেয়েটি ওর সান্নিধ্যে এসে আবার নিজের মনের হারানো সেই স্বাচ্ছন্দ্যটুকু ফিরে পায়। চামেলি সহজভাবে কলকলিয়ে ওঠে কি খুশীতে। সে শুধোয় তরুণকে।

—এত দেরি হ'ল ফিরতে? চলুন খাবার বোধহয় ঠাণ্ডা জল

হয়ে গেছে। জানেন তো কাঠ-কয়লাও নেই'। এবার ভিজিয়ে খেতে হবে চাল ডাল।

হাসছে তরুণ বলে—তাই হয়তো হবে, কিন্তু এবেলায় আবার কেন হাঙ্গামা করতে গেলে? কোনোরকমে মুড়ি চিড়ে যা হয় খেয়ে নিতাম।

চামেলি ওর দিকে চাইল।

তরুণ কঠিন সংযত একটি মানুষ। সে কারোও সাহায্য নিতে চায় না, কুণ্ঠাবোধ করে। আর অন্যদের ও দেখেছে পাতচাটা ঘেয়ো কুকুরের মতো ছোঁক ছোঁক করে ঘুরছে আঁস্তাকুড় নোংরার সন্ধানে। তরুণ তাদের তুলনায় অন্য জাতের মানুষ। ওরা দূরে দূরেই থাকতে চায় সব সান্নিধ্য···বাঁধন এড়িয়ে। চামেলি নিজের মনে এইটা বুঝতে পারে। তবু চামেলি ক্ষুব্ধস্বরে বলে,

—কিই এমন হাঙ্গামা, আমাদের তিনজনের জন্যে তো যাহোক কিছু করতে হয়, আলাদা করে রান্নাও হয় নি। অবশ্যি আপনার যদি ইচ্ছে না থাকে আমাদের জোর কি থাকবে বলুন?

তরুণ চামেলির দিকে চাইল। ওর দু চোখে জল টলটল করছে। এত লোকের মাঝে ওই একটি মানুষই তার পথ চেয়েছিল কি ব্যাকুলতা নিয়ে; তরুণের মনে এতগুলো লোকের সমস্যার কথাই সব আলোটুকুকে ঘিরে রেখেছিল। নিজের কথা ভাবে নি সে, ভাবনার সময়ও তার নেই।

বিদেশ থেকে সামান্য চাকরি নিয়ে এসেছে, এখানে তার আপনজনও কেউ নেই যে তার পথ চেয়ে থাকবে। তার জন্য ভাববে আজ তার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে চামেলিকে।

হঠাৎ আজ তরুণের মনে কোথায় বিচিত্র একটা সুর ওঠে। চামেলির মুখ চোখে রাগ আর অভিমান ফুটে রয়েছে। বলে সে,

—আমরা গরীব, আমাদের ওখানে খেলে আপনার সম্মানে বাধে বোধ হয়?

—না, না। কি বলছো। চলো—যাচ্ছি।

তরুণ ওকে খুশী করার জন্যেই কথাগুলো বলে।

চামেলি ওর দিকে চাইল। ও এগিয়ে যায়। তার মনে এই ভাঙনের মাঝে ও কি সুর ওঠে। বিচিত্র এই সুর। মনের অতলে এর নিবিড় একটু স্পর্শ কি আশ্বাস আনে, চারিদিকে ধ্বংস মৃত্যু আর সর্বনাশ। তারই মাঝে চামেলি কি স্বপ্ন দেখছে। ভালোলাগার স্বপ্ন—এইটুকুই যেন তার একমাত্র আশ্বাস। অনেক অন্ধকারে একটা তারা জ্বলছে।

রাত্রি কতো জানে না বিজয়া।

ঘরে আলো নেই, অন্ধকার চারিদিক। জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশের অস্তিত্বটুকু চোখে পড়ে—তাও কালো মেঘে ঢাকা ; কোথাও এতটুকু তারার ঔজ্জ্বল্য নেই। বাতাসে ভেসে আসে জলস্রোতের খলখল শব্দ, রুদ্র দেবতা যেন অট্টহাসি হাসছে বিভীষিকার রাজ্যে। বেদান্ততীর্থ ঘরের ও কোণে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

—খোকন। বিজয়া ডাকছে ফটিককে।

সাড়া দেবার সামর্থ্য ছেলেটার নেই। দুরন্ত দামাল ছেলেটা দু'দিনের জ্বরে আর না খেতে পেয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে।

বিজয়া ওর গায়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মা ! মাগো ! অস্ফুট আর্তনাদ করে ফটিক জ্বরের ঘোরে।

বিজয়া নিজেকে এত অসহায় বোধ করে নি কোনোদিন। জীবনে সে সবচেয়ে আপনজনকে হারিয়েছে কয়েক বছর আগে, সেই নিদারুণ যন্ত্রণার ছবিটা সে ভুলতে চেয়েছিল বার বার ; ফটিককে নিয়ে আর তার ছোট্ট সংসারের ভাবনায় সেই সর্বনাশা বেদনাকে ভুলেছিল সে।

কিন্তু আজ এই ধ্বংসপুরীর মাঝে—এমনি দুর্যোগের রাতে মনে

হয় বিজয়ার এতবড় পৃথিবীতে সে একা। চারিদিকে অন্ধকারের মাঝে ঝড়ো হাওয়ার উদ্দাম গর্জন, এই ছোট্ট দীপশিখাটুকুকে সে আঁচল আঁড়াল দিয়ে চলেছে। একে সে নিভতে দিতে পারে না। এই তার একমাত্র অবলম্বন, আশ্বাস। তার কোনো সঙ্গী নেই, সম্বল নেই, সে একা, নিঃস্ব আর পরিত্যক্ত।

তার একমাত্র সন্তানকে সে খেতে দিতে পারে নি, দিতে পারে নি এতটুকু খাবার, দুখানা রুটি, একটুকু দুধ। ওরা তাদের সব কিছু কেড়ে নিয়ে ঠেলে দিয়েছে উপবাস আর নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

—খোকন! বাবা আমার। খোকন?

বিজয়ার ব্যর্থ মাতৃহৃদয় ছেলের ওই যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠে। তার রোগেও চিকিৎসা করতে সামর্থ্য নেই, কোনো উপায়ও নেই তার। বিজয়ার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

—বাবা! বিজয়া অসহায় স্বরে বেদান্ততীর্থকে ডাকছে।

বৃদ্ধ দরজার পাশে চুপ করে বসে আছেন, নীরব দর্শকের মতো দেখছেন সব কিছুই, তাঁর করার কিছুমাত্র নেই। মনে হয় এই সব নাটকীয় ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে জীবন রঙ্গমঞ্চে, আর এই নাটকে তাঁর ভূমিকা শুধুমাত্র দর্শকেরই।

তবু বেদনাবোধ করেন। তাঁর যুক্তিবাদী তার্কিক মনের সামনে এই বন্যার্ত মানুষগুলোর লোভ লালসা আর নীচতার পঙ্কিল ছবিটা কঠিন সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। একে ও অস্বীকার সাধ্য তার নেই।

নিজে এই অপমান সহজভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বৌমাকে দেখেছেন মুষড়ে পড়তে। বিজয়ার ওই ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বৃদ্ধ একটু বিচলিত হন, কিন্তু তাও ক্ষণিকের জন্যই। অনেক আঘাত এসেছে তাঁর জীবনে একটার পর একটা। সেই বিচ্ছেদের বেদনাই বেদান্ততীর্থের মনে এনেছে অপরিসীম সহনশীলতা। সব কিছুরই শেষ দেখতে চান তিনি।

ঈশ্বর! ঈশ্বর নামক কোনো বিচিত্র অনুভূতিতে তাঁর বিশ্বাস

পরিণত হয়েছে অসার অনিত্যতায়। দুঃখের পসরাই বয়ে চলেছেন তিনি, অনেক কিছু পেয়েছিলেন, মনে হয় সব হারিয়ে নিঃস্ব শূন্য হয়েই বিরাট পূর্ণতার প্রসাদ আসবে তাঁর জীবনে।

বাইরের সব আশ্বাসগুলো হারিয়ে গেলেই মানুষ তখন অন্তর সত্তার অন্বেষণ করে, সত্যকে স্বীকার করে নেয়।

বেদান্ততীর্থ মনে মনে এমনি নিরাসক্ত হবার চিন্তাই করে চলেছেন। বিজয়ার ডাকে। স্থির কণ্ঠে বেদান্ততীর্থ বলেন—কি মা?

ভাবলেশহীন উত্তেজনাবিহীন সেই কণ্ঠস্বর।

বিজয়া বলে,—খোকনের জ্বরটা বেড়েছে বাবা। কথা বলছে না ও।

গভীর রাত্রি। চারিদিকে বন্যার জলের কলকল্লোল, বৃষ্টি নামা দুর্যোগের রাত। ওষুধ নেই, পথ্য নেই। একটা শিশু দুঃসহ যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। আজকের দুঃসহ তমসার অতলে অপরিসীম বেদনায় সে বিবর্ণ, তার বিষে জর্জরিত আর নীল হয়ে উঠেছে। মানবিকতার সামনে এই তার ভবিতব্য।

শান্তকণ্ঠে বেদান্ততীর্থ বলেন।

—মাথায় জলপটি দিয়ে বাতাস কর বৌমা, আর বিমল ডাক্তারের ওষুধ যা আছে ঠিকমতো দাও। কাল দেখা যাবে সকাল হোক।

আশ্বাসের সুরে বলেন তিনি—কাল সকালেই দেখবে জ্বর মগ্ন হয়ে গেছে। কোনো ভাবনা করো না মা।

বেদান্ততীর্থের নিজেরই বিশ্রী লাগে, এ কথার মূলে কোনো সত্য আছে কি না জানা নেই তাঁর। তবু মনে হয় এই কথা ছাড়া বলার আর কিছু নেই। করারও নেই। তাই সহজভাবেই এই কথাটা বলেন।

সব কিছুকেই মাথা পেতে মেনে নিতেই হবে। এখন তারই প্রস্তুতি।

পটলার ঘুম আসে নি। কিছুদিন থেকে পটলা গ্রামের মালো-পাড়ায়-বাগদীপাড়ার মাতব্বর সেজে উঠেছিল।

ত্রিদিববাবুও বোর্ডের ইলেকসনের সময় পটলাকেই বলেছিলেন,—কাজকর্ম কর ভোটে। আর তোদের মধ্য থেকে একজন ক্যানডিডেটও ঠিক করে দে। তাকে ভোটে দাঁড় করাবো।

পটলা খুশী হয় ওর কথায়।

পটলার ইচ্ছা ছিল নিজেই ভোটে দাঁড়াবে, কিন্তু নানা কারণে সেবার তা হয়ে ওঠে নি। অন্য সকলে তাদের পাড়ার বসন্তকেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর ঐ ব্যাপারের জন্য পটলাও বেশ কিছু টাকা আদায় করেছিল। তাছাড়া ওই মূর্খ লোকগুলোর সব কিছু লোন—রিলিফের ব্যাপারে পটলাই এগিয়ে এসেছে। ত্বএকলাইন বাংলায় মকসো করতে পারে। দেশ বিদেশ ঘুরেছে। এমনিতে চাল্ পুরিয়া, মাঝেমাঝে কলকাতায় ঘুরে এসে পাড়ার লোকদের বলে—অমুক মন্ত্রীর কাছেই গেলাম।

তারাও বিশ্বাস করে। পটল নানারকম দরখাস্ত, তদ্বির ইত্যাদি করে টাকা বের করে দিয়েছে বিডিও অফিস থেকে তাদের জন্য। বিনিময়ে সে পেয়েছে কিছু টাকা। এইভাবেই পটল চালাচ্ছে।

আজ পটলা চটে উঠেছে ওই ত্রিদিববাবুর ব্যবহারে। তাকে ওরা মানে নি, উল্টে প্রকাশ্যে তাকে ওরা অপমান করেছে। পটলার অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। সে দলবলের সামনে তেমনি নেতাই থাকতে চায় ওদের ঠকিয়ে। তবু চাল কিছু আদায় করেছে সে আন্দোলন করে এই কথাটা জাহির করতো সে, কিন্তু এরা তার স্বরূপ জেনে ফেলেছে। তাই আজ ওকে চরম অপমান করেছে। রাগে ফুলছে পটলা।

খাওয়া মেলে নি—টাকা পয়সাও নেই। তার নিজের খরচা আছে। তাছাড়া এই জলবন্দী মানুষগুলোর মধ্যে মদ কোথাও পাবার সম্ভাবনা নেই। তবু পয়সা পেলে হয়তো চড়াদামে গোবিন্দ

মুন্সীর ওখানে মিলতে পারে। কিন্তু টাকা। টাকার কোনো সন্ধান এখানে নেই।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে। নিজেও দেখেছে পটল ব্যাপারটা। অন্য কোনো পথ না পেয়ে এই পথটাই ধরবে আজ।

মণি দত্ত ওই বাইরের দিকে দোকানের মতো একটা ঘর নিয়ে মালপত্র তুলে ক'দিনেই এখানকার বাসিন্দা হয়ে গেছে। পটলার মনে পড়ে ওই টাকার কথা। মণি এখন বেশ পয়সা কামাচ্ছে। মণি দত্তের তহবিল দোকানেই থাকবে নিশ্চয়।

তাই রাতের অন্ধকারে পটলা এগিয়ে যায়; পটলা জানে কোথায় ওর টাকা পয়সা থাকে। তাই পটলা মণি দত্তের দোকান ঘরে হানা দিয়েছে সাবধানে। এই অন্ধকারে মানুষগুলো নেতিয়ে পড়েছে। এই উপযুক্ত সময়। মণির দোকানের সাবেক দরজার তালাগুলোও কোন্ আদ্যিকালের। একালে এত চাবিতেও খোলে না; পটলা এদিক ওদিক চাইছে। লোকজন কেউ বিশেষ নেই এইদিকে। খেয়াল হয় পটলার ওপাশের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ আছে। চাবি খুললেও দরজা খোলা যাবে না। ভিতরে লোক আছে বোধহয়।

একটু ঘাবড়ে যায়। মণি দত্ত ভয়ানক ধূর্ত। তাই তাদের ঠকাবার জন্য বাইরে তালা লাগিয়েছে। আসলে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ।

পটলা থামলো। এতদূর এগিয়ে আর ফিরে যাবে না। শেষ চেষ্টাই করবে। চারিদিকে লোকজনও কেউ নেই।

মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে যে যেখানে ঠাঁই পেয়েছে সেইখানেই। পটলা চারিদিকে কান খাড়া করে শোনে।

জলের শব্দ আর বাতাসের সাপট ভেসে আসে। সাবধানে একটা লোহার সরু শিক দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে চাপ দিতেই পুরোনো হুড়কোটা খুলে যায়।

—কে।

ভিতর থেকে দরজাটা খুলে বের হয়ে আসে একটা ছায়ামূর্তি,

পটলাকে দেখে লোকটাই পালাবার চেষ্টা করছে অন্ধকারে, পটলাও তৈরি ছিল না। হঠাৎ দরজা খুলে ধাবমান লোকটার পিছনেই দেখে মণি বেনের বাঁজা বৌটা বের হয়ে আসছে। তার কাপড়-চোপড় অগোছালো ; গায়ে জামা নেই। বলিষ্ঠ মাংসল বৌটার চোখেমুখে কি আতঙ্কের ছায়া।

মেয়েটাও এমনি আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না। পটলা ধরে ফেলেছে ছায়ামূর্তিটাকে। আবছা আলোয় জাপটে ধরা লোকটাকে দেখে চমকে ওঠে পটলা। চুরি করতে এসে পটলা নিজেই অন্য কোন চোরকে ধরে ফেলেছে। কিন্তু চোর ব্যক্তিটিকে দেখে অবাক হয় পটলা।

—আপনি স্যার! এ্যাঁ—এখানে! পটলা দেখছে ধরাপড়া ব্যক্তিটির মুখে বিবর্ণ ছায়া। বৌটাও ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ত্রিদিববাবু এভাবে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে ভাবে নি, আর ধরেছে পটলাই। মেয়েটাও আটকে পড়েছে। ভয়ে লজ্জায় সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে, শোঁ শোঁ ওঠে হাওয়ার গর্জন।

পটলা বলে—আপনি স্যার।

ত্রিদিববাবুর বাক্য বন্ধ হয়ে গেছে। পটলা বলে।

—তালে লোকজন জড়ো করি পেসিডেনবাবু! একবার দেখুক সবাই আপনার লীলাখানা! এ্যাঁ মণি দত্তের বৌটাকেও দেখুক সবাই। এমন জমাটি ব্যাপার!

পটলা হাসছে। চুরি করতে এসে আজ ভালো মাল পেয়েছে।

ত্রিদিববাবু চমকে ওঠে। কি ভুলই না করেছে সে। ভাবে নি এমনি বিপদ আসতে পারে। তাই ধরা পড়ে গিয়ে ত্রিদিববাবু বলে ফিসফিসিয়ে :

—এসব কি বলছিস পটলা ?

পটলা অন্ধকারে হাসে, হাসিটার শব্দ ওঠে না। অন্ধকারে ওর লালচে ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে মুলোর মতো দাঁত বের হয় মাত্র।

ত্রিদিববাবু পকেট থেকে দু'খানা দশটাকার নোট বের করে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে—যা। মিষ্টি খাবি।

পটলা মৌকা পেয়েছে। এত সহজে এমন দাঁও সে ছাড়তে রাজী নয়। আজ সে খোদ ত্রিদিববাবুকেই হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। ওই লোকটাকে হাতে রাখা দরকার। এখন ও তার হাতেই থাকবে। পটলা আমতা আমতা করে।

—এত কমে কি হবে স্যার ?—যাক, রাতের বেলায় এই নিলাম। তবে বায়না দিলেন মাত্তর। পরে একটু পুষিয়ে দিতে হবে।

ত্রিদিববাবু বলে—তাই হবে রে।

পটলা চুরি করতে এসেছিল টাকা পয়সার জন্য, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় চোর ধরতে পেরেছে আজ রাত্রে। ত্রিদিববাবু তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চায় ও আশ্বাস দেয়।

—তাই হবে বাবা। সর, পথ ছাড়।

ত্রিদিববাবু কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচলো।

বাঁটকুলে বাঁজা বৌটাও এই ফাঁকে সরে গেছে কোথায়। পটলা এদিক ওদিকে আর তাকে দেখতে পায় না।

পটলার মনে হয় মণি দত্তের এটাও বোধহয় বাণিজ্য, ব্যাটা পয়সা আর কিছু সুবিধার লোভে সব কাজই করতে পারে। পয়সাই তার কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

নিজের বৌকেও তাই জেনেশুনেই বেচেছে ত্রিদিববাবুর কাছে, আর বৌটা রাজী হয় নি সহজে, তাই মারধোরও হয়তো করেছে তাকে।

পটলার মনে হয় তার চেয়ে অনেক বড় চোর চারিদিকে বেশ দাপট আর প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই টিকে আছে।

ওদের তুলনায় সে নেহাত ফালতু। পটলাকে চুরি করেতে হয় নি, ওই টাকাগুলো তার হাতে এমনিই এসে গেছে, বরং সে একটা স্থায়ী মৌকা পেয়ে গেছে ত্রিদিববাবুকে দোহন করার। ধূর্ত লোকটা খুশী

হয়েছে। তাই খুশ মেজাজ নিয়েই বিড়ি ধরালো বাবা বুড়ো শিবের মন্দিরের চাতালে উঠে এসে।

মন্দিরের দরজা নেই, কাঠের পাল্লাগুলো কবে লোপাট হয়ে গেছে। বাবা মহাদেব ওই ভাঙা দরজার ওদিকে অন্ধকার কোণে কালো প্রস্তরীভূত মূর্তি পরিগ্রহ করে বসে আছে। দেবতার উপর পটলার হঠাৎ ভক্তি উথলে ওঠে। সে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে আপনমনে হাসছে। মনে হয় দুনিয়ার সবটাই কাদায় আর পাঁকে ভরা, তাতে থিকথিক করছে পোকা, ওই লোভী মণি দত্ত, ত্রিদিববাবু, শয়তান পুটু কেরানী পটলচন্দর সৌরভীদের ভিড়েই ভরা। মানুষ! ওসব ফৌত হয়ে গেছে।

—সর্ সর্ সর—একটা মসৃণ শব্দ শুনেছে সাবধানী পটলা। শব্দটা কেমন একটা আতঙ্ক আনে ওর সারা মনে।

পটলার সেই নিচু অন্ধকারের ভাবনায় মিশেছে একটা হিংস্রতার বিষাক্ত আভাষ। সাপ! চমকে উঠেছে পটলা।

চাতাল থেকে পটলা লাফ দিয়ে নিচে নেমে পড়েছে। সাপটা জলে ভেসে এসে মন্দিরের নিরাপদ কোণে আশ্রয় নিয়েছিল, রাতের অন্ধকারে সেখানে মানুষের শব্দ পেয়ে সাপটা নড়ে উঠেছে, বেশ মোটা আর লম্বা খইএ গোখরো ; নিরাশ্রয় হয়ে সেও বানে ভাসা মানুষগুলোর মতো এখানে এসে জুটেছিল। হঠাৎ অন্ধকারে তারই মতো শ্রেণীর কোনো প্রাণীকে দেখে সাপটা বিরক্ত হয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে।

—ধ্যাৎত্তেরি। পটলা বিড়বিড় করে।

ওর মনে হয় সব বিশ্বাস সব পবিত্রতাই অমনি কুটিল হিংসা আর নিষ্ঠুরতায় ভরে উঠেছে। আবছা অন্ধকারে সাপটা ভাঙা দরজার সামনে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে, বাতাসে ওঠে ওর হিংস্র চাপা গর্জন।

পটলা সরে এল। বিড়িতেও জুত হয় না। বৃষ্টি আর হিমবাতাসে ওর সারা দেহ যেন কাঁপছে। টাকাগুলো পকেটে রয়েছে, গ্লা

ভেসে ভেসে ফিকে হয়ে আসছে। ওরা এইবার হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে যায়—হয়তো সূর্য উঠবে—আলো জাগবে ওই মেঘমুক্ত আকাশের হদীমে।

বেদান্ততীর্থ গায়ত্রী জপ করছেন।

বৃদ্ধের মুখে এত বেদনার ছায়া তবু সেখানে কোনো স্থায়ী রেখাপাত করে নি। অনাহার অনিদ্রা—শেষ আশ্রয়টুকুরও বিনষ্টি—সবকিছু আঘাতকেই সহনীয় করে নিয়েছেন মনের নিবিড় প্রসন্নতায়।

সারারাত্রি বিনিদ্র ফটিকের মাথায় হাওয়া করে বিজয়া একপাশে ক্লান্তি আর ঘুমে ডুবে গেছে। ফটিকের বোধহয় ভোরের দিকে ঘুম এসেছে। ঝরা ফুলের ম্লান বিশুষ্ক ভাব মাখানো ওর মুখ। ছেলেটা ঘুমুচ্ছে।

—ভূঃ ভুর্বঃ স্বঃ।

বৃদ্ধ বেদান্ততীর্থ জপ করে চলেছেন—সন্ধ্যাস্নান হয় নি। সারাদেহে এই ক'দিনের পুঞ্জীভূত ক্লেদ, তবু তার মনের সেই আশাবাদী প্রসন্নতাটুকু অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে এক পূণতার প্রসাদে।

ভোরের অরুণ আলোর আরক্তিম আভাসে সদ্য ঘুম ভাঙা পাখির কলরবে তিনি বন্দনা করেন আলোকময় সবিতাকে যার চিরন্তন !লোয় ভূলোক দ্যুলোক আলোকসম্পাত, শুচিন্ময়—পূত পবিত্র। এখানে ক্লেদ নেই। এ যেন সব দুঃখনিশার শেষে সমাগত এক অমৃত লোকের স্পর্শ মাখানো প্রভাত।

—ভর্গো দেবস্য ধীমহি

. ।ক অপূর্ব আনন্দে আর তৃপ্তিতে ওর জীর্ণমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেখে জাগছে পূর্বাকাশে—পাখিগুলোও খুশিতে কলরব করে ওঠে হাতগুনে পর।

পটল

ওঠে

জল নামবার তবু কোনো লক্ষণই নেই। লালগেরুয়া জল তেমনিই

বয়ে চলেছে সমানভাবে। গাছপাতাগুলো পচে গেছে, বাতাসে ওঠে পূতি গন্ধ। মরা গরু বাছুরের লাশ এসে ঠেকেছে এখান ওখানে।

গ্রামের মানুষগুলো আশা করেছিল এ বান দু'একদিনেই কমে যাবে। ওরা আশা করেছিল জল নেমে যাবে। সকালবেলায় আলোভরা আকাশের নিচে ওই ঢিবির উপর বন্দী মানুষগুলো চেয়ে দেখছে চারিদিক।

শশী মোড়ল বলে,

—অনেক বান দেখেছি হে! তা ছিল তেরাত্তির জন্যে। আবার জল কমেছে, পলি পড়েছে ক্ষেতে; ধান গাছগুলো টিকে গেছে; কিন্তু এ বান যে কমে নি গ। কমবার নামটি নাই।

তরুণও ভাবনায় পড়েছে। ভাবছে ওরা সবাই। খাবার নেই। মণি দত্ত, ত্রিদিববাবুও ভাবনায় পড়েছে—এবার আর ওরা মানবে না। খেতে না পেলে ওই মানুষগুলো লুঠপাট করবে, সব কিছু কেড়ে নেবে। বুভুক্ষু মানুষগুলো হিংস্র হয়ে উঠেছে।

পুটে কেরানীও বলে,

—তাইতো দেখছি গো। ডি ভি সি'র জল আসছে।

শশী মোড়ল বলে,

—কি কল করেছো গ' মাষ্টার? ফসলের সময় জল নাই, ইদিকে ডোবাবার বেলায় তোড় দেখ না? রবি খন্দ আল আখের জল দে দিকি তবে তো বুঝবো! তার বেলায় ঢুঁ ঢুঁ।

তরুণ চুপ করে থাকে। দামোদর আজ ওদের কাছে অশ্রু হয়ে উঠেছে। নিচেকার নদীখাত বুজে গেছে; জল যাবার কোনো পথই নেই।

কাঁদছে ছেলেগুলো এদিকে ওদিকে। ওদের প্রথম দিনের ফুর্তি আর নেই। এখনও কতো জন এদিক ওদিকে বন্দী হয়ে আছে কে জানে—তারাও হয়তো শেষ হয়ে যাবে!

কে বলে,

—একটা মানুষ মনে হচ্ছে না? ওই যে ভেসে চলেছে—ওই যে! চমকে ওঠে সকলেই। কোনো বন্দী মানুষ আজ ওই জলস্রোতে চিরদিনের মতো মুক্তি পেয়ে ভেসে চলেছে। পচে বিকৃত হয়ে গেছে দেহটা। সকালের এই আলো কি বেদনায় ম্লান হয়ে ওঠে?

বিমল ডাক্তারও হন্তদন্ত হয়ে আসছে। ওর মুখে ভাবনা আর ভয়ের ছায়া।

—এই যে তরুণ, প্রেসিডেন্টবাবুও রয়েছেন। মশাই, ক্যাম্পে দু'তিনটে কলেরা কেসই হয়েছে। ও তো একতলার ঘরে বিশের বৌ, নোটনের বুড়ো কাকা, আরও দু'একটা শুষছে। নো মেডিসিন—নো স্যালাইন। এখন কি করা যায় বলুন?

ওরা কলেরার কথা শুনে চমকে উঠেছে। লোকগুলোর মুখে ফুটে ওঠে ভয়ের ছায়া।

পুটু কেরানী হাতজোড় করে বলে—এত পাপ মা কখনও সইতে পারে?

—কলেরা! ত্রিদিববাবু চমকে ওঠে—বলো কি হে? তাহ'লে তো সব যাবে এইবার।

বিমল ডাক্তার বলে—দেখুন যদি থানা হাসপাতালে খবর দিতে পারা যায়। আর পরশু পাঁচিল চাপা পড়েছিল নামোপাড়ার ওই গুপীনাথ। ওর বোধহয় হাত-পা দুটোই ফ্যাকচার হয়েছে। গ্যাংগ্রীন না হয়ে যায়!

ওপাশের রকে বসেছিল কিশোরী ধাড়া। সেও আটকা পড়ে আছে এইখানে। ধুতিটা কাদায় লটপট করছে দামী পাঞ্জাবিটা ন্যাতাকানির মতো বিবর্ণ, তাতে লেগেছে পানের কস—আর গোবিন্দ মুন্সীর সংগৃহীত পায়রার মাংসের ঝোল-এর দাগ লেগেছে পাঞ্জাবিতে।

কিশোরী বলে ওঠে গম্ভীর গলায়,

জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে
জীবননদে ?

ভেবো না ডাক্তার। যে যাবার সে যাবেই, যেতে দাও। আর গ্যাংগ্রীন-এর কথা বলছো ? সমাজের সর্বাঙ্গ যে গ্যাংগ্রীনে ভরে উঠেছে বাবা। এই যে কিশোরী ধাড়া। গবে মুন্সী, তোমার পুট—ওই পেসিডেন সব মহাপ্রভুই সমাজের গায়ে এক একটি গ্যাংগ্রীন ! বাড়তে দাও। তারপর ওয়ান ফাইন মর্নিং—একদিন ভুউস ! একেবারে ভরাডুবি—ফিনিস। জীবনরঙ্গে নায়কের পতন এবং মূর্ছা ! ব্যস্—যবনিকা পতন।

তরুণ চুপ করে শুনছে ওই কথাগুলো। হয়তো সত্যিই। আহার নেই, আশ্রয় নেই, বাঁচার আশ্বাস নেই। ওরা সবাই মুখ বুজে কোন অকূল নদীর ধারে এসে অপেক্ষা করছে—কখন শেষখেযার পাড়ি জমাবে তারই উদ্দেশ্যে।

মণি বেনের দোকানে কারা জটলা পাকাচ্ছে। মণি বলে, —চায়ের কাপ চার আনা করে হে। চা-চিনি আর নাই।

পটলাও এসে জুটেছে। ওপাশে উনুনের ধারে মণের সেই বউটা চায়ের জল গরম করছিল, একবার পটলার দিকে চাইল মেয়েটা। আবার কাজে মন দেয় সে।

পটলা ওকে বিশেষভাবে চেনে, কাল রাতের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে। সে বৌটাকে দেখেছিল বিচিত্র এক পরিস্থিতির মধ্যে। এখন ওর চোখেমুখে ঘৃণা ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই। পটলাকেও যেন চেনে না সে।

পটলা দেখছে ওকে।

মেয়েটাও বুঝেছে যে পটলা তার দিকে চেয়ে আছে। তবু তার কোনো বিকৃতি নেই। পটলা বাঁজা মেয়েটার নিটোল গা-গতরের দিকে চেয়ে থাকে লুব্ধদৃষ্টিতে। বৌটার কেমন বিশ্রী লাগে। তবু চুপ করে কাজ করে যায় সে।

পটলা হাসে, লাল পিটুলি পড়া দাঁত বের করে শুধোয়,

—কই গো মণিদা, চা থাকে তো দাও দিন এককাপ।

মণি দত্ত নিজেই এক গেলাস চা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। পটলা তারিয়ে তারিয়ে চা খেতে থাকে আর হাসে। বলে,

—তা'লে ভালোই আছ মণিদা! এ্যাঁ! আর কই গ? রিলিফ টিলিফ আসবে বলছে—কিছুই তো নাই। তা'লে কি এবার নিকাঠ উপোস দিতে হবে? মরবো আমরা। রিলিফও নাই।

মণি দত্তও এমনি অনেক আশা করেছিল। আর রিলিফের চাল-গম-কম্বল-কাপড়গুলো আসবে প্রেসিডেন্টের হাতেই, সেও ফাঁক থেকে বিনামূলধনে কিছু কারবার করে নেবে। সেই মতলবেই সে এগিয়েছিল এতদূর।

বৌটাও তা জানে। মণি বলে,

—ও সব আর আসবে না পটল। সব ফন্দিবাজী ওদের।

পটল বলে,

—আসবে না মানে? দল বেঁধে গিয়ে আমরা আন্দোলন করবো।

পটলের দিকে চাইল বৌটা। পটল তাদের সবই জেনেছে। মণি বেনেকে কেমন বিশ্রী লাগে। বৌটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

তবু ভাবনার কালোছায়া নেমেছে। পটল আজ মাথা উঁচু করে ঘুরছে। দলবলের দু'চারজনে তাকে চাও খাইয়েছে। পটল সামনে ত্রিদিববাবুকে দেখে বলে,

—নমস্কার স্যার। এদের রিলিফ টিলিফের কি হবে?

পটল ওই ত্রিদিববাবুর সামনে যেন কৈফিয়ৎ চাইছে।

ত্রিদিববাবু ওর কথার ভঙ্গীতে একটু হকচকিয়ে যায়। পটলকে আজ সে ভয় করে, ভয় নয় আরও কিছু। কাল রাতের ঘটনাটা ও জানে। নিজের অন্ধকারের সেই পরিচয়টাকে ওর কাছে লুকোতে পারে নি ত্রিদিববাবু। তাই চুপ করে যায় ওর সামনে।

পটল বলে—যা হয় দেখুন। তাড়াতাড়ি করুন স্যার।

অর্থাৎ নাহলে পটল যে দলবল জুটিয়ে অন্য ব্যবস্থা নেবে সেই ইঙ্গিতই করছে।

সেটা ত্রিদিববাবু ও বুঝছে। ওই শীর্ণ লোকটাকে ত্রিদিববাবু একটু যেন সমীহ করে। জানে ওই লোকটা তাকে অসুবিধায় ফেলতে পারে। তাই ওকে সাবধানে এড়িয়ে চলা দরকার। ত্রিদিববাবু বলে,

—একটু পরে আসিস পটল। কথা আছে।

পটলও জানে এই কথার অর্থ। গোপনে ওকে হাত করতে চায় ত্রিদিববাবু। পটলও বেশ বুঝেছে দলের দোহাই দিয়ে আর ওদের দুর্বলতার খবর জেনে সে ওদেরই উপর চাপ দিয়ে কিছু আদায় করবে। আর তা যে করতে পারবে সেটা বুঝেছে পটল।

বুভুক্ষু ছেলেমেয়েগুলো কাঁদছে; কেউ কেউ গলা জলে নেমে এর মধ্যেই কচু, বুনো ডাঁটা, দু'একটা ভেসে যাওয়া কুমড়ো সংগ্রহ করছে, কেউ ধরেছে দু'চারটে মাছ। কিন্তু তেল এমন কি নুন অবধি নেই। সামনে ওদের নিশ্চিত উপবাস। কোনো খাবারই আর মিলবে না তাদের। সেই নিশ্চিত অনাহারে তারা ঘাবড়ে গেছে।

বিজয়াও দেখেছে সেই ছবিটা। খোকনকে কাল থেকে কিছুই দিতে পারে নি। সকালের দিকে জ্বরটা একটু কম বলে বোধহয়। একটু সাবু-বার্লি দিতে পারলে ভালো হতো, না হয় একটু দুধ। কিন্তু তাও মেলে নি কোনোখানে।

বিজয়ার মনে পড়ে মুখুজ্যে গিন্নীর কথাগুলো। ওদের কাছে হাত পাততে পারবে না সে।

—বৌদি খোকন কেমন আছে গ। বিজয়া চেয়ে দেখছে ওই মেয়েটাকে।

বলে বিজয়া—তেমনই আছে।

সৌরভী ঘরে ঢুকছে। ওর হাতে ঘটিতে খানিকটা দুধ।

বিজয়া ওর দিকে চেয়ে থাকে, মেয়েটা আজ তার দুঃখে এগিয়ে এসেছে।

সৌরভী বলে,

—চামেলিদি বলছিল ফটিকের জ্বর। আহা, দামাল ছেলেটা যেন দু'দিনের জ্বরেই আঙ্গুরলতা হয়ে গেছে। দুধটুন দাও বৌদি—দাঁড়াও। দুটো লেবু ছিঁড়ে আনি মুখুজ্যের বাগান থেকে। ছানার জল কাটিয়ে দাও—ভালো হবে।

—দুধ! বিজয়া যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। শুধোয়।

—কোথায় পেলি দুধ?

সৌরভী বলে—ওই টেকো মিনসের গোয়াল থেকে গ?

বিজয়া বলে—আবার লেবুও আনবি ওখান থেকে? কিছু বলবে নাতো?

—হ্যাঁ! সৌরভী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে শোনায়।

—বলবে কি? মিনসের ঝাঁঝ কতো? টেকো মিনসে কিনা ঢক ঢক করে মদও গিলবে আবার দুধও খাবে। মরণ। ওই পুটু কেরানী গ। তাই লিয়ে এলম দুধটুন। দাও খোকনকে—

ফটিক তখনও জ্বরে কাহিল হয়ে আছে। বিজয়া ভয় জড়ানো সুরে বলে,

—ক'দিন চলবে এই জ্বর জানি না বাছা, ওষুধ নাই, পথ্যি নাই।

সৌরভীও জানে। তাই বলে,

ভগমানকে কি বলবো দিদি? পোড়ারমুখো ভাবতারও চোখ

নাই। মানুষের এই নাকাল হেনস্থা। সবই পাপ গ। আমরা না হয় পাপী—পাপে থিক থিক করছি। তাই বলে দুধের বাছারা তো কোনো দোষ করে নি। ওদের এই শাস্তি কেনে গ?

বেদান্ততীর্থ ওর কথাগুলো শুনেছেন, মেয়েটার দিকে চাইলেন। ওকে জানে সকলেই, তবু তাঁর মনে হয় ওই ব্যভিচারিণী নারীর অন্তরে কোথায় রয়ে গেছে এখনও চিরন্তন বেদনা আর ভালোবাসা। লোভী একটা সমাজের কতকগুলো মানুষের হাতে ও অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে, তার জন্য ওর দোষ বোধহয় নেই। এত পাপ তাই সৌরভীর মনকে কলুষিত করে নি।

বেদান্ততীর্থ বলেন,

—বুঝলি! সেই পাপেরই এই প্রায়শ্চিত্ত। একপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেই পুরুষেই শেষ হয় না সৌরভী। উত্তরপুরুষেও তার কর্মফল বর্তায়। সেই ভোগ পূর্ণ হতে হবে—তবে তো মুক্তি মিলবে। ততদিন এ দুর্ভোগ মেনে নিতেই হবে।

সৌরভী এসব কথার অর্থ বোঝে না। তবু মনে হয় তার জীবনের এতো পাপও বোধহয় ফুরোবে না কোনোদিন। কোথায় ওর মনে তাই অসহায় একটা জ্বালা অহরহ গনগনিয়ে জ্বলছে।

চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে তার। বলে সে,

—দুধটা একটু বল্‌কে নাও বৌদি, আমি লেবু নিয়ে আসছি ঝপ্ করে। সৌরভী চলে গেল।

ক'টা দিনরাত কেটে গেছে ওরা হিসাব রাখে নি। অন্ধকার এসেছে, আবার আলো ফুটেছে—আবার আঁধার নেমেছে। ওদের জগৎ অন্ধকারে বিবর্ণ। তার মাঝে হঠাৎ কালো মেঘগুলো সরে সরে যাচ্ছে। তবু জলকল্লোলও থামে নি। ভূষণের সারাদেহ কাঁপছে। চালের উপর কেটেছে দিনগুলো আর জাগর আতঙ্কময় বিভীষিকার রাত্রি।

সব-চেতনা অসাড় অনুভূতিহীন স্তব্ধতায় পরিণত হয়েছে। মানুষের প্রাণশক্তি অফুরাণ তাই সে শতবিপদ যন্ত্রণার মাঝেও বেঁচে আছে।

—ওগো। মিনু চীৎকার করে ওঠে।

ওর কণ্ঠস্বর কেমন ফ্যাঁসফেঁসে, আর চোখমুখ হিমে জলে ফুলে উঠেছে। শকুনটা গাছের ডাল ছেড়ে দীর্ঘ লম্বা ডানা মেলে উড়ছে, ওর ডানার ছায়া পড়ে তাদের উপর। লাল চোখ দুটো মেলে চালের দিকে এগিয়ে আসছে। ওর ধারালো শক্ত ঠোঁটটা কঠিনতর আর তীক্ষ্ণ বলেই বোধ হয়।

ভয় পেয়ে যায় ভূষণ। সামনেই চালের উপর পড়েছিল একটা বাখারি। ভূষণ ওইটা শূন্যে তুলে চীৎকার করে—এ্যাই। এ্যাই। —হঠ।

বাধা পেয়ে শকুনটা ওপরে সরে গেল।

শকুনটা ভেবেছিল ওরা বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। সেও অধীর প্রতীক্ষায় বসেছিল দিনরাত্রি। ওদের চুপ করে থাকতে দেখে ধারাল ঠোঁট বের করে এগিয়ে এসেছে। ওই তীক্ষ্ণ ঠোঁটের আঘাতে নরম মাংসটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে।

কিন্তু ক্ষুধার্ত শকুনটা ওই বাখারির শব্দে আর চীৎকারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। চেষ্টা করছে জ্যান্ত মানুষ দুটোকেই আঘাত করবে এইবার। রেগে উঠে লাল চোখ মেলে সে এগিয়ে আসছে—চীৎকার করে। ওর তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠস্বর স্তব্ধ বাতাসে ভয়াবহ বলে মনে হয়। ভূষণ বাখারি নাড়ছে আর চীৎকার করছে প্রাণভয়ে।

হঠাৎ চমকে ওঠে ভূষণ! ওর মন থেকে ভয় আর হতাশা মুছে গেছে।—বৌ! বৌ! দ্যাখ দ্যাখ! ওরা আসছে! হেই বাবু গ—।

শকুনটাও বাধা পেয়ে আবার ডুবো মরা গাছের ডালে গিয়ে বসেছে। মিনু খোকনকে কাঁথা কাপড়ে জড়িয়ে বুকের কাছে আগলে রেখেছে, সেও দেখছে। মিনু চীৎকার করে ওঠে—এরোপেলেন যি গ?

—নারে। হেলিকপ্টার। দেখছিস না কতো নিচু দিয়ে আসছে, ছ্যাখ ছ্যাখ—লোকজনরা দেখছে আমাদের।

চালের উপর থেকে ভূষণ পাগলের মতো ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করছে—এ্যাই যে—ওগো, এ্যাই যে আমরা হেথায় রইছি। বাবু গ!

বাখারির মাথায় জামাটা জড়িয়ে জীর্ণ চালের উপর দাঁড়িয়ে ভূষণ চীৎকার করছে। হেলিকপটার থেকে কারা হাত নাড়ে। অনেক নিচু হয়ে আসছে ওটা, তালগাছের মাথার একটু উপরেই ওটা উড়ছে। বোঁ বোঁ করে। বিরাট পাখাটা ঘুরছে।

ভূষণ—মিনি সকলেই ওই নবাগতদের দেখে কি আশ্বাস পেয়েছে।

ক্যাম্পের লোকজন, ছুটে এসেছে বড় বাড়ির একোণ-ওকোণ থেকে। তরুণকে এস-ডি-ও কাল জানিয়েছিল যেভাবে হোক সাহায্য যাবে। বাইরের মাঠে তরুণও এসে পড়েছে। ত্রিদিববাবু পুটু কেরানীর সহসা ওজন যেন বেড়ে যায়। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ওই ত্রিদিববাবু। সরকারী লোকজনদের আসতে দেখে সে এইবার তার পদমর্যাদা আর দায়িত্বের কথাটা স্মরণ ক'রে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখছে ওই হেলিকপটার খানাকে। ত্রিদিববাবু এখন কেউ-কেটা ব্যক্তি।

আর পটলা কোন ফাঁকে তার পুরানো খাঁকি প্যাণ্ট ব্ল্যাউজ পরে মাথায় খাঁকি টুপি দিয়ে বুকে মেডেল ঝুলিয়ে খেলার মাঠে এসে চীৎকার করে ছুহাত এদিক ওদিকে নেড়ে, লোকজনকে হুঁশিয়ার করছে।

—এ্যাই, সরে যাও। সরে যাও সবাই। হেলিকপটার এসেছে, তফাৎ যাও।

হেলিকপটারটা ধীরে ধীরে খেলার মাঠে নামতেই চারিদিক থেকে লোকজন মেয়ে ছেলে এসে তাকে ঘিরে ফেলে।

কয়েকজন খাঁকি পোশাকপরা মিলিটারীর লোক নেমেছে, পটলাও

এই সুযোগে দুপা এক করে স্যালুট দিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। ওর দিকে নজর দেবার দরকারও বোধ করে না ওই নবাগত মানুষ-গুলো। ওদের সঙ্গে রয়েছেন তরুণের চেনা সেই অল্পবয়সী এস-ডি-ও। তরুণ এগিয়ে যায়—এসেছেন স্যার?

ভদ্রলোক চারিদিকে দেখছেন। বিমল ডাক্তারও স্টেথিসকোপ গলায় ঝুলিয়ে এগিয়ে আসে। ওইটাই তার তক্‌মা। এস-ডি-ও ওই অফিসারদের সামনে সেও এসে দাঁড়ালো।

বিমল ডাক্তার বলে,

—খাবার নেই, ওষুধ নেই—দুটো কলেরা কেসও হয়ে গেছে। সর্বনাশ হবে স্যার ইমিজিয়েট ব্যবস্থা না করলে।

পুটু কেরানী দেখছে সব মৌকা যেন হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এস-ডি-ও সাহেব আর ওই মিলিটারী লোকরা তরুণ আর বিমল ডাক্তারের সঙ্গেই কথা বলছেন। পুটু জানে প্রথম মৌকাতেই কোর্ট দখল করতে না পারলে খেল দেখানো আর যাবে না। তাই ত্রিদিববাবুকে সে ফিসফিসিয়ে বলে,

—এগিয়ে যান বড়বাবু। নমস্কার করে গিয়ে দাঁড়ান ওদের সামনে।

ত্রিদিববাবু ইতিউতি করছে। মিলিটারী কর্তা দুজন ইংরাজীতেই কথাবার্তা বলছে তরুণের সঙ্গে।

ইংরাজীতে তার দখল বিশেষ নেই। তাই কেমন ঘাবড়ে যায় ত্রিদিববাবু, পুটুই শেষকালে ত্রিদিববাবুকে টেনে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে বলির পাঁঠার মতো ওঁদের সামনে। এস-ডি-ও মিলিটারী অফিসাররা ওই ব্যক্তিটিকে দেখছে, ত্রিদিববাবু কোনোমতে হাতজোড় করে নমস্কার করে সিধে হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। পুটু এর মধ্যে ওকে এগিয়ে দিয়ে নিজেও কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জানায়,

—দিস প্রেসিডেন্ট স্যার। গ্রেট ম্যান অব দিস অঞ্চল।

—তাই নাকি? এস-ডি-ও সাহেব চাইলেন, মিলিটারী লোকরাও

কৌতূহলী চাহনিতে গ্রেট ম্যানটিকে দেখছে। ত্রিদিববাবু হকচকিয়ে হাতজোড় করে আবার নমস্কার করে।

পুটু বলে—হিজ বিগ হাউস। অল রিস্কইজী হিয়ার স্যার। গুড ম্যান।

—ইয়েস স্যার।

প্রেসিডেণ্ট সাহেবও ঢোক গিলছে। এস-ডি-ও ভদ্রলোক বলেন ত্রিদিববাবুকে।

—বাংলাতেই বলুন। ঠিক আছে। সব দেখে শুনে কাজকর্ম করান। চাল গম আটা—ওষুধপত্র সবই আসবে, তৈরি খাবারও দিয়ে যাবো আমরা। আপনারা দেখে শুনে যাতে সকলেই ঠিকমতো পায় তারই ব্যবস্থা করবেন। একটু সহযোগিতা করুন।

ওদিকে মালপত্র খালাস করছে মিলিটারীর লোকজন। তরুণ আরও ছেলেরা মিলে সকলকে সারবন্দী দাঁড় করিয়ে এক একটা প্যাকেট বিলি করছে। প্ল্যাস্টিকের পাতলা কাগজমোড়া প্যাকেটে চাপাটি আলু সেদ্ধ আর চিনি। ওরা তাই কিছু এনেছে আপাতত।

বুভুক্ষু মানুষগুলো ওই পেয়েই যেন বর্তে যায়।

হেলিকপ্টারটা উঠে গিয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আবার ফিরে আসে মালপত্র নিয়ে। জনতার মধ্যে কি আশার সাড়া জাগে। মনে হয় ওরা একাই এই জলে পরিত্যক্ত হয় নি। ওদের জন্য আরও অনেকে ভাবছে—তারা এসেছে বাইরের জগৎ থেকে সেই আশ্বাস নিয়ে। হারানো যোগসূত্রটা ওরা ফিরে পেয়েছে। মনে সাহস জাগে। কয়েকটা রবারের বোট এনেছে। তরুণ এগুলোকে দেখছে।

—এ বোটগুলো অনেক মজবুত। পুরু রবারের তৈরি।

বোট দুটোকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ওরা ; এখনও অনেক মানুষ আটকে আছে ; তাদের উদ্ধার করতে হবে।

—ম্যাস্টার ! এখানে ম্যাস্টার।

ভাঙা খড়ের চালের উপর থেকে লোকগুলো চীৎকার করছে। ওরা এগিয়ে চলেছে ওই দিকে স্রোতের টান এড়িয়ে। বন্দী মানুষ-গুলোর মুখে চোখে ফুটে ওঠে মুক্তির আনন্দ। শীর্ণ কঙ্কালের মতো হয়ে গেছে তারা, তবু কি আশায় ওরা সব দুঃখ ভুলেছে।

—বৌ ! ভূষণ মিনুকে ডাকছে। মিনুর বুকের কাছে কাঁথাজড়ানো ছেলেটা যেন নড়ছে। মিনুর সব চেতনা অসাড় হয়ে গেছে। ভূষণের দিকে চাইল সে। চোখের কোলে পিঁচুটি, চোখ দুটো লাল আর ফুলে উঠেছে। মাথার চুলগুলো রুক্ষ। পরনের শাড়িখানা ভিজে কাদা মাখানো। মিনুর চাহনিতে ফুটে ওঠে কি শূন্যতা।

ভূষণ বলে—ওরা আসছে বৌ, ইস্কুল বাড়িতে নিয়ে যাবে এখান থেকে।

ভাত তরকারী খোকনের দুধ সব পাবি। এ্যাই—এ্যাই !

ভূষণ ধমকে ওঠে ফ্যাঁসফেঁসে গলায়।

শকুনটা তখনও উড়বার জন্য ডালে বসেই ডানা শন্ শন্ করছে। বিরাট দেহটা নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে লাল চোখ মেলে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে সে।

বাতাসে ও যেন মৃত্যুর ঘ্রাণ পেয়েছে, কান পেতে শুনেছে মৃত্যুর পদধ্বনি। দূরাগত কোন অকল্যাণ তার রক্তলাল চোখে ছায়া ফেলেছে। তাই পাহারা দিয়ে আছে শকুনটা লুব্ধ দৃষ্টিতে ওই অর্ধমৃত মানুষগুলোকে, ভাবছে এইবার শেষ হয়ে যাবে তারা।

রবারের নৌকাটা এগিয়ে আসছে, সামনের ডোবা বাঁশবনে তখনও থই থই করছে জল। আগাছাপচা গন্ধ উঠছে বাতাসে ; তরুণ এসেছে তিনদিন পর এইখানে, আজ বোট পেয়ে তারা দূরদূরান্তরের জলবন্দী মানুষগুলোকে তুলে আনার জন্য বের হয়েছে।

জলবন্দী মানুষগুলোর কেউ কাঁদছে, কেউ বা কয়েক দিন রাত্রি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে স্তব্ধ নির্বাক হয়ে গেছে। ওরা প্রচণ্ড শক্তি

নিয়ে ভাঙা ঘরের চাল, গাছের ডালের উপর বসেছিল ক'দিন। মানুষের জগৎ ঘর বসতের স্মৃতি সব মুছে গেছে তাদের মন থেকে।

তারা যেন বিচিত্র শাখাশ্রয়ী জীবে পরিণত হয়েছে। কেউ বা শেষ মুহূর্তে উন্মাদ হয়ে ওঠে মুক্তির আনন্দে। চীৎকার করে অব্যক্ত ভাষায়। এতদিন ডালে বসেছিল ওরা ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত হয়ে, ওদের উদ্ধার করার জন্যও কেউ আসতে পারে নি। ওরা পরিত্যক্ত জীবের মতো মৃত্যুর মুখোমুখি পড়েছিল।

খাবার নেই, ওই বিষাক্ত জলই খেয়েছে, ডালে জড়িয়ে রয়েছে বানে ভাসা নিরাশ্রয় সাপ ; সেও তাদের মতো বুভুক্ষু আর আশ্রয়হীন। পাশাপাশি বাস করেছে তাদের সঙ্গে ওই মানুষগুলো দিন রাত্রি ; সারা শরীরের শিরা উপশিরায় কি অপরিসীম চাপ পড়েছে! মনে হয়েছে, ওই সাপের হাত থেকে বাঁচবার জন্য লাফ দিয়ে পড়বে জলে। কিন্তু পারে নি প্রাণের মায়ায়।

তিল তিল করে তার সব চিন্তাশক্তি ভয়-ভাবনা পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে গেছে তাদের।

কারা ডাকছে। নৌকা এসেছে, খাবার পাবে। বিশ্রাম পাবে —শরীরের জীর্ণ কোষগুলো আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

ভূষণকে কে যেন ডাকছে। লোকটার সব শক্তিটুকু নিঃশেষ হয়ে আসে, শূন্য বিস্ফারিত চাহনিতে চেয়ে দেখছে। নৌকার লোকজনরা কম্বল এনেছে, ওদের ডাকছে। ঠিক বুঝতে পারে না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়।

ভূষণের হাতটা কাঁপছে। সারাদেহ হাওয়ালাগা বেত পাতার মতো থরথরিয়ে কাঁপছে। লোকটা ডাল থেকে খসে পড়ল জমাট পাথরের মতো নিচের সাঁতার জলে। ভেসে চলেছে আর্তনাদ করে।

ছেলেরা কোনোরকমে টেনে তুলছে। সহনশীলতার সব সীমা অতিক্রান্ত হবার পরও মানুষ তার স্তব্ধ ইন্দ্রিয়গুলোর ইঙ্গিতে কিছু কাজ করে, তারপরই ঘটে নিঃশেষ অবলুপ্তি।

লোকগুলোকে তুলে নিয়ে আসছে ওরা ; ক'দিন পর নামোপাড়ার দিকে এগোতে পারে। তখনও স্রোতের বেগে থরথরিয়ে কাঁপছে নৌকাটা! ওরা বাঁশ গাছের কঞ্চি ধরে, ওদিকে এগিয়ে আসছে স্রোত ঠেলে। ভূষণ যেন স্বপ্ন দেখে। গলা বুক শুকিয়ে আসে। কালোছায়াগুলো ওকে ডাকছে। তরুণকে ও ঠিক চিনতে পারে না।

—ভূষণ! ভূষণ—

তরুণ ওকে কাঁপতে দেখে ছেলেদের কাকে বলে,

—বৌটাকে ধর। আস্তে আস্তে চালে উঠবে বিশে, পচে গেছে বাঁশ বাখারি! নিচে ঢুকে যাবি। সাবধানে ওঠ।

চালের উপর থেকে টুকরো কথাগুলো স্বপ্নাবিষ্টের মতো শুনছে ভূষণ, নড়বার সামর্থ্য নেই। গড়িয়ে পড়ে যায় সে। ওরা তাকে তুলেছে নৌকায়। লোকজনের শব্দে গাছের ডালে বসা শকুনিটা উৎকর্ণ হয়ে লম্বা গলা বাড়িয়ে দেখছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে তরুণ।

ঘরের চাল থেকে ভূষণের বৌকে ওরা ধরে নামিয়ে আনছে, চোখে মুখে মেয়েটার বন্য উদ্দাম চাহনি। বুকের কাছে জড়িয়ে আছে আধ ভিজে ন্যাকড়া আর ময়লা কাঁথায় মোড়া একটা বস্তু। ওই খোকনকে মিনু বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। মনে হয় ওরা কেড়ে নেবে তার এতদিনের সঞ্চিত সঙ্গোপনে রাখা ওই শিশুটুকুকে। লুটেরার দল এসে হানা দিয়েছে। মিনু কি ভয়ে চীৎকার করছে, অব্যক্ত ভাষাহীন সেই চীৎকার।

ওর বুকের কাছে ন্যাকড়ার বাণ্ডিলটা ধরে চীৎকার করছে সে। হঠাৎ সেই ন্যাকড়ার স্তূপের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে তরুণ। বাচ্চাটা যেন কাঠ হয়ে গেছে।

প্রাণহীন একটা শিশুকে মা এখনও জড়িয়ে ধরে রেখেছে কি বুক-ভরা মমতায়। মা জানে না ও আর বেঁচে নেই।

অনাহারে তৃষ্ণায় আর এই দুরন্ত বর্ষণে ভিজে ভিজে সেই ছোট্ট ছেলেটা কখন মারা গেছে, আঁচল আড়াল দিয়ে মিনু ওই দীপশিখা-টুকুকে বাঁচাতে পারে নি। আকাশজোড়া ধ্বংসের দমকা ঝড়ো হাওয়া সেটুকুকে কখন নিভিয়ে দিয়েছে চিরদিনের জন্য তার অজানতেই। মা তবু এই কঠিন সত্যটাকে জানে না।

মৃত্যুর এমনি নির্মম প্রহসন এর আগে দেখে নি তরুণ।

গাছের ডালে শকুনটা সজাগ হয়ে ওঠে। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনেছিল ওই কুৎসিত জীবটা অনেক আগেই। শকুনটা ডানা ঝটপট করছে; চারিদিকে ওই সর্বনাশা জলস্রোত আর ধ্বংসপুরীর নির্জনতা; তারই মাঝে ওরা দেখেছে এই মৃত্যুকে। ছোট্ট একটা শিশু কি নিদারুণ যন্ত্রণায় হারিয়ে গেছে।

ভূষণ নির্বাক নিস্পন্দ চাহনি মেলে চেয়ে দেখছে ওদের, আর সেই প্রাণহীন ছেলেটাকে। মিনু বুকের কাছে বাচ্চাটাকে যেন আড়াল করে রাখতে চায়। কিন্তু বাচ্চার কোনো সাড়া নেই, ওই মাংসপিণ্ডটা পরিণত হয়েছে ঠাণ্ডা একটা জড় পদার্থে।

মিনু বৌয়ের স্তব্ধপ্রায় রক্তপ্রবাহ কি প্রচণ্ড আঘাতে দুর্বার হয়ে ওঠে। কালো ডাগর চোখ মেলে খোকন আর চাইবে না কোনো দিন, তার দেহের উত্তাপটুকু কখন ফুরিয়ে গেছে, এখন স্তব্ধ শান্ত একটা ভারি পাথর; জীবনের বিকৃত ব্যঙ্গকে দেখেছে মিনু। আর্তনাদ করে ওঠে।

—খোকন! খোকন!

বাঁধ ভাঙা প্লাবনের মতো ওর দুচোখ ফেটে জল নামে।

আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে ভূষণ। অস্ফুট ভাষাহীন চীৎকার ওই জলপ্রবাহে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে দিগন্তে হারিয়ে যায়। ওরা কাঁদছে, কান্না নয়। ভাঙা গলায় কোনো জানোয়ার যেন ঘেংড়ে ঘেংড়ে ককাচ্ছে কি অব্যক্ত নিদারুণ যন্ত্রণায়।

তরুণ ছেলেদের সাহায্যে ওদের নৌকায় তুলছে—তখনও শকুনটা

ওদের দিকে চেয়ে আছে পলকহীন স্থির দৃষ্টিতে। গ্রামের বিগত স্নিগ্ধ সবুজের ছায়ায় নেমেছে শ্মশানের স্তব্ধতা আর মৃত্যুর পদধ্বনি; ওই শকুনটা যেন তারই অগ্রদূত। ওটা উড়ে আসছে ওই প্রাণহীন দেহটার লোভে।

বিশু লগি উঁচিয়ে ওটাকে তাড়াবার চেষ্টা করে—শালা জান না?

পাখিটা লাফ দিয়ে বিরক্তিভরে এক ডাল থেকে অন্য ডালে সরে বসল মাত্র; ভয় ডর ওর নেই, ওদের অতর্কিত এই হানাদারীকে শকুনটা বোধহয় আমলই দিল না। ও বসে আছে উপরের ডালে লাল চাহনি মেলে।

ওরা পালিয়ে আসছে ওই ধ্বংসপুরী থেকে নৌকা নিয়ে।

মণি বেনের বুড়ি মা এরই মধ্যে বাদলা কেটে গিয়ে রোদ উঠতে দেখে এক খোলা চাল নিয়ে বসেছে। মুড়ি ভাজতে পারলে নগদ পয়সা আসবে, হিসেবে দেখেছে মুড়ি বেচতে পারলে ওতে তিন গুণ লাভ থাকে।

বাঁজা বৌটার মনমেজাজ ভালো নেই। এত দিন ধরে এই মণি দত্তের ঘরে এসেছে, হয়তো আরও অন্য মেয়েদের মতোই তার মনের অতলে ছিল অনেক আশা। ঘর বাঁধবে—ছেলেপুলে হবে। একটা মানুষকে ভালোবেসে সব পাবে আত্মরী। অনেক আশাই ছিল ওই মেয়েটার মনে। কিন্তু ক্রমশ দেখেছে তার সব আশা স্বপ্ন—ব্যর্থ হয়ে গেছে। আর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে তার মান-সম্মানটুকু অবধি।

সেই রাতের দুঃসহ জ্বালা আর অপমানকে সে ভুলতে পারে নি। ওর ওই বুড়ি শাশুড়ী আর তার স্বামীই তাকে এমনি অপমান করেছিল সামান্য মাত্র স্বার্থসিদ্ধির আশায়।

মণি দত্তকে ক্রমশ আহ্লরী চিনেছে। ও অপদার্থ একটি মানুষ। গলায় তুলসীর মালা-কণ্ঠী, সর্বাঙ্গে তিলক সেব্য করে। মুখে হরিভক্তির কথা। আসলে ওটা চামার ভণ্ড আর অপদার্থ একটা কাপুরুষ।

রাতের অন্ধকারের সেই জঘন্য কথাগুলো মনে পড়ে। পয়সা! শুধুমাত্র পয়সার জন্য সব কিছুই ও বিকিকিনির পসরায় পরিণত করেছে। ব্যর্থ হয়ে গেছে আহ্লরীর জীবন, মা হতে পারে নি সে।

তবু এই শূন্যতাকে সে সহ্য করত। কিন্তু তার ওপর এই জঘন্য অপমান, রাতের অন্ধকারে ত্রিদিব মুখুয্যের সেই অত্যাচারকে মেনে নিতে পারে নি বৌটা। প্রতিবাদ করেছিল আহ্লরী সেই দিন ওদের কথায়।

কিন্তু অবাক হয়ে যায় মণে দত্ত আহ্লরীর ওই প্রতিবাদে, আহ্লরী বলে—ও সব বলতে বাধল না?

—তা কেনে ভাববি আমার কথা! কাজকারবারে একটু সুরাহা হতো যে।

আহ্লরী স্বামীর কথায় চমকে ওঠে,—কি বলছো যা তা?

মণি বেনের গলার কণ্ঠীগুলো যেন কি বীভৎসতায় খলখল করে ওঠে। সে বৌটাকে কি বোঝাচ্ছে।

—কি যা তা বললাম? অমন এক-আধটু ব্যাপার স্যাপার কতো আচ্ছা আচ্ছা ঘরে চলে। আরে বাবা পয়সা। ওইটাই সংসারের সার কথা। যা বললাম তাই করবি। বেশী ছ্যায়লা করবি তো মারবো এক লাথি।

—বুড়ি শাশুড়ীও গজগজ করে আড়ালে। স্বোয়ামীর বাক্যি—বেদবাক্যি লো। মানতে হয়।

বাঁজা বৌটার সারাদেহ মনে কি পাঁক থিকথিক করে। সংসারটাই পাঁকে ভরে উঠেছে।

এর মধ্যেই বোধহয় কাজ কারবারের কিছু সুবিধা হয়েছে মণি দত্তের। আজ সকালেই মিলিকের নৌকায় করে মণি দত্ত শহরে

গেছে, দোকানের মালপত্র গস্ত করতে। মাল এনে ফেলতে পারলেই তিন গুণ লাভে বেচতে পারবে এখন।

মণি বলে—থাক না বাবা এমনি বর্ষা বাদল করে, আমার কিছু আমদানি হয় তাহলে। বৌটা জবাব দেয় নি। সেই রাতের পর থেকে কথাও বলে নি বৌটা মণির সঙ্গে। অবশ্য মণি দত্তের ওতে কিছু আসে যায় না। তার কাজ হয়েছে। সে খুশী।

মালপত্তর আনতে গেছে ওদের নৌকায়। বুড়িই তাই দোকান খুলে বসেছে। আর বৌটা মুখ বুজে মুড়ি ভাজার জন্য খোলায় চাল নিয়ে বসেছে উনুনের ধারে।

বাঁজা বৌটা এক খোলা চাল উনুনে চাপিয়ে নাড়ছে কাঠের হাতা দিয়ে। মুড়ি ভাজা হবে ওতে। সকালেই দোকানে লোক আসছে মুড়ির জন্য।

চালগুলো তেতে উঠলে খোলায় বালি দিয়ে নাড়বে সেগুলোকে। বুড়ি গজগজ করে।

—কতোক্ষণ লাগবে লো? গতর তো ষাঁড়িয়ে উঠেছে, তবু যদি কাজে লাগতো। ঢং দেখ না—গা দোলাচ্ছে কেবল।

বৌটা কথা বললো না। বুড়ি গজগজ করে।

—গাহাক ফিরে যাচ্ছে—চটক করে দু'খোলা ভেজে দে মুড়ি।

বৌটা জবাব দিল না।

পটল অবশ্য সাতে পাঁচে নাই। ওসব উদ্ধার টুদ্ধারের কাজে সে বের হয় না। সকালেই দু'ঢোক মদ গিলে খোয়াড়ি ভেঙে পটল উদ্ধারকারী মিলিটারী দলের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল বিশেষ মতলবেই। ফাঁক বুঝে পটলা ওদের কাছ থেকে প্যাকেটগুলো হাতাবার তালে ছিল। তাই বলে ওদের:

—ওগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি স্যার। এ্যাই সব লাইন করো—এ্যাই।

কিন্তু তার আগেই পটলাকে ধমকে ওঠে সৈন্যদের একজন।

—হটো, হট যাও। পটলকে ওরা সহ্য করতে পারে নি।

লোকটাকে পটল কি বলতে গিয়েছিল, সিপাই বন্দুক তুলে তেড়ে আসে। ওসব দালালি তারা মানতে চায় না। ওরা এর মধ্যে দেখেছে ওই বুভুক্ষু মানুষগুলোর মধ্যেও এমনি কৌশলী লোক কিছু আছে। তাই গর্জে ওঠে তারা—ভাগো হিঁয়াসে। আভি ভাগো তুম।

পটলার ওখানে সুবিধা হয় নি। তাই পটলা সরে এসেছে।

এখানে এসে বৌটার দিকে চেয়ে থাকে। ও জানে ওই বৌটার কোন গোপন কাহিনী। রাতের অন্ধকারে দেখেছিল পটলা তার সেই অভিসারিকার বেশ।

বুড়িও দেখছে পটলাকে।

বুড়ির চোখ এড়ায় নি ওর চোখের সেই শ্যেন দৃষ্টি ; পটলা বৌএর দিকে চেয়ে আছে দুচোখ মেলে। বুড়ি ধমকে ওঠে—কি চাই তোর —এ্যাই পটলা ? মেয়েছেলে রয়েছে হুঁশ নাই তোর ?

পটল ওই সব ন্যাকামি আর সতীপনার ব্যাপার অনেক দেখেছে। বুড়ির স্বভাবটাকেও চেনে সে। তাই ওর কথায় খুব গুরুত্ব দিল না।

পটলা বলে—একটু কাজে এলম গো। তা মণিদাকে দেখছি না ? শহরে গেছে ওদের নৌকায় শুনলাম।

বুড়ি বলে, হুঁ ! যা দিকি।

বৌটা ওকে দেখে যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে ওঠে। পটলা হাসছে। —ধমকাচ্ছো কেনে গ খুড়িমা ? দাও—একটা চা দাও।

পটলা রকে বসবার যোগাড় করে।

—চা নাই। বুড়ি সাফ জবাব দেয় ওকে।

হঠাৎ কান্নার শব্দ ওঠে। কার বুক ফাটানো কান্নায় এই চত্বরের স্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়। সকলেই সচকিত হয়ে ওঠে।

নৌকাটা এসে শিবতলার ঘাটে লেগেছে।

ভূষণ আর বৌটাকে ওরা নামাচ্ছে। কাঁদছে বৌটা—তার সব হারিয়ে গেছে। মাটিতে আছড়ে পড়ে মেয়েটা, মন্দিরের চাতালে মাথা ঠুকছে আর চীৎকার করে বিকৃত গলায়,

—আমার সব চলে গেল ঠাকুর। সব লিয়ে লিলে তুমি?

ধ্বংসের দেবতা নির্বিকার। এই অভিযোগ তার কাছে চিরন্তন। তাই বোধহয় সে মৌনতার আবরণে নিজেকে সমাহিত করে রেখেছে যুগ-যুগান্তর ধরে। ওই কান্নার শব্দে লোকজন জুটে যায়।

সৌরভীও এসে দাঁড়িয়েছে। বৌটাকে সেই ধরে নেয়।

মিনু শক্ত পাথরে মাথা ঠুকে চলেছে। সৌরভী ওকে সরিয়ে নিয়ে বলে,

—ঠাকুর! ঠাকুর ফাকুর তোরাই মানিস বৌ। ওসব নাই। থাকলে গরীবের এমনি করে সব যায়? মায়ের বুক থেকে ছেলে চলে যায়—বসুমতীর বুক থেকে সোনাফসল হরে যায়? ঠাকুর! ঝাঁটা মারি অমন ঠাকুরের মুয়ে।

ওর বিদ্রোহী মন সব বাঁধন আগলকে মিথ্যা বলে জেনেছে। ধর্মকে জেনেছে অন্তঃসারহীন ব্যঙ্গ আর প্রতারণার ছল হিসাবে, তারই মাশুল দিয়ে চলেছে সৌরভী। তাই আজ ওই মনগড়া সংস্কারগুলো তার কাছে মূল্যহীন, অসার হয়ে উঠেছে।

মিনু তা জানে না। তাই হাহাকারের বেদনায় তার মন ভরে ওঠে।

বিজয়াও শুনেছে ওই কান্নার শব্দ। মায়ের মন কি অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

মায়ের বুকে কখন ছেলেটা মারা গেছে জানে না মা, ওই বিপর্যয়

দুর্যোগের মধ্যে মিনু ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল এই কদিন। নিজের দেহের উত্তাপ আর অফুরান মাতৃস্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিল তার সন্তানকে।

শিশুকে বুকে করে ধরে কি আশা নিয়ে মা মুক্তির লগ্নের প্রতীক্ষা করেছে। কিন্তু ও জানে না তার আগেই সেই শিশু কোথায় হারিয়ে গেছে। সব বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে সে।

কাঁদছে মেয়েটা. বিজয়ার দুচোখ জলে ভরে আসে ওর এই অসহায় কান্নায়।

সরে এল সে। মনে হয় এ দৃশ্য না দেখাই ছিল তার পক্ষে ভালো। ভীত বিজয়া নিজেদের ঘরে এসে ঢুকে দাঁড়াল। ফটিক শুয়ে আছে চুপ করে। বিজয়া ওকে ডাকছে—ফটিক।

কেমন ভয় ভয় করে বিজয়ার।

ফটিকের জ্বর এখনও ছাড়ে নি। কদিন জ্বর চলেছে। ফটিক ঝিমিয়ে পড়েছে। দামাল সুন্দর ছেলেটা ক'দিনেই যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে।

মায়ের ডাকে চোখ মেলে চাইল সে। জবাব দেবার সাধ্য তার নেই। অস্ফুট স্বরে ফটিক তবু জানায়—মা। চল না মা।

ফটিকের ভালো লাগে না এখানে। দেখেছে এখানের মানুষ-গুলোকে। বাতাসে উঠছে পচা নোংরা গন্ধ। দিনরাত কলরব করছে ওরা। কোথায় সেই আলো ভরা সবুজ, তাদের উঠানের শিউলি গাছে এখন ফুল ফুটেছে, অজস্র ফুলে সবুজ গাছটা ঢেকে গেছে। তলাবিছিয়ে পড়ে থাকে গন্ধমদির ফুলগুলো। বাড়ির বাইরের মাঠে আউশ ধানের খেতে এসেছে সোনা রং। আমন ধান-গুলো ঘনসবুজ ঝাড় মেলে বাতাসে শিরশির শব্দ তোলে। পুকুর পাড়ে খেলার মাঠের ধারে নদীর বালুচরে কাশফুল ফুটেছে। আকাশের বুকে সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘগুলো ভেসে ভেসে হারিয়ে যায় কোন অজানার দিগন্ত পার হয়ে।

ফটিকের চোখের সামনে সেই আলোভরা ছবিগুলো ফুটে ওঠে।

—মা!

—কি বাবা?

বিজয়া ছেলের দিকে চাইল। ফটিক বলে—এখান থেকে বাড়িতে কবে যাবো মা?

বিজয়াও জানে না সে খবর। ফটিক জানে না তাদের বাড়িও আর নেই। মাটির ঘরগুলো বানের তোড়ে ডুবে গেছে। সেগুলো ধসে পড়েছে। বাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপ। দাঁড়াবার জায়গা নেই সেখানে। আর সাজানো বাগান বানের জলে হেজে পচে গেছে। সব ধসে পড়বে। এখন সেখানে বুক জল। তাদের আশ্রয় আর নেই।

বিজয়া তবু ওকে সান্ত্বনা দেয়—দু চার দিনের মধ্যেই যাবো বাবা।

—তাই চল মা। এখানে ভালো লাগে না।

ফটিক যেন একটু শান্ত হয়। সেই ঘরে ফেরার আশায়, আনন্দে তার মন ভরে ওঠে। বলে সে ঃ

—শিউলি ফুল ফুটছে না মা? কতো শিউলি ফোটে আমাদের গাছে। সব ফুল কুড়িয়ে বোঁটাগুলো রোদে শুকিয়ে রাখবো, এবার সরস্বতীপুজোয় বাসন্তী রংএ কাপড় রাঙিয়ে দেবে মা?

—তাই দেব বাবা! ওকে সান্ত্বনা দেয় বিজয়া।

—তুমি চুপ করে শোও। ভালো হয়ে ওঠো, মাছের ঝোল আর ভাত দোব তোমাকে।

—ভাত! ফটিকের চোখেমুখে কি চকচকে ভাব ফুটে ওঠে। ক'দিন ভাত খায় নি জানে না। ওই একটা অনুভূতি কি মাধুর্যে ভরে ওঠে। বাড়ির সেই দিনগুলো—সবুজ স্মৃতি—কাশফুল ফোটা প্রান্তর—মেঘ ভাসা আকাশ সব মিলিয়ে ওর মন কি অপূর্ব স্বপ্ন কল্পনার তৃপ্তিতে মদির হয়ে ওঠে। চোখ বুজে আসছে একটা তৃপ্তির স্বাদে।

বিমল ডাক্তারকে নিয়ে বেদান্ততীর্থ ঘরে ঢুকছেন।

বেদান্ততীর্থের মুখে ভাবনার কালো আভাস ফুটে রয়েছে। ওদের দেখে বিজয়া মাথার কাপড়টা টেনে সরে দাঁড়াল ওদিকে। সে চেয়ে দেখছে ওদের।

বিমল ডাক্তার ফটিকের বুকে পিঠে স্টেথিসকোপ বসিয়ে দেখতে থাকে। বিমল ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। সেও কেমন ঘাবড়ে গেছে ফটিকের অবস্থা দেখে।

বিজয়া শুধোয়—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

—ভালোই। ওষুধ যা দিয়েছি চলুক। ভয় নেই।

ওর কণ্ঠে সান্ত্বনার সুর ফুটে ওঠে।

বিমল ডাক্তার বের হয়ে এল বারান্দায়। রোদের ছায়া পড়েছে। বেদান্ততীর্থ বিমলের সঙ্গে বের হয়ে এসেছেন। ওর মুখের এই ভাবান্তর বৃদ্ধের নজর এড়ায় না।

শুধোন তিনি ঃ

—কেমন দেখলে ডাক্তার? বলো—যা বলার নির্ভয়ে বলো। আমি সব কিছুর জন্য তৈরি।

বিমল ডাক্তার ওঁর দিকে চাইল। জানে সে বৃদ্ধকে, জীবনের বাহ্য দিকটা ওঁর কাছে বেদনাময় হলেও সহনীয় করে নিয়েছেন তাকে তাঁর প্রজ্ঞা আর অভিজ্ঞতা দিয়ে।

বিমল ডাক্তার বলে,—টাইফয়েড বলেই বোধ হচ্ছে।

—টাইফয়েড। বৃদ্ধ চমকে ওঠেন। বহু বৎসর আগেকার কথা মনে পড়ে। ওই রোগে তাঁর একমাত্র কৃতী সন্তান দূর প্রবাসে মারা গেছে, সেদিন সামর্থ্য ছিল, চিকিৎসা করাতে পেয়েছিলেন। পথ্য ওষুধ সবই ছিল তবু তাকে বাঁচাতে পারেন নি তিনি। ওই রোগটার সম্বন্ধে সেই থেকেই একটা ভয় ছিল। আজ আরও অসহায় তিনি, তাই ভয়ে শিউরে ওঠেন ওই কথা শুনে।

বৃদ্ধের জীর্ণ বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়। স্থির কণ্ঠে বলেন তিনি ঃ

—বৌমাকে এই রোগটার কথা বলো না বিমল। চেষ্টা করা যাক—তারপর যা থাকে অদৃষ্টে !

বিমল ডাক্তার বলে—ওষুধপথ্য একটু ঠিকমতো পড়লে এ রোগ আজকাল মোটেই কঠিন হয়ে ওঠে না। এত ভাববার কিছুই নেই।

বিমল ডাক্তারও তবু যে ঠিক ভরসা পায় নি এটা তার কথার সুরেই বোঝা যায়। কিন্তু চিকিৎসক সে, তাই আশ্বাসও দেবে শেষ অবধি।

বেদান্ততীর্থ কি ভাবছেন।

বৃদ্ধের কাছে ওই ওষুধপথ্যের ভাবনাই আজ বড়। জীবনে সঞ্চয় তার কিছুই নেই। জমি বাগান আর বাস্তু বাড়িই সম্বল। তাও বাড়ি ঘর আর নেই, জমির ফসলও নেই। সামনে আসছে চরম যন্ত্রণার দিন। বৃদ্ধের চোখে ভাবনার কালো মেঘ জমেছে। একটা পথ তবু বের করতেই হবে। তাঁর একমাত্র বংশধর তাকে এভাবে বিনা চিকিৎসায় বিনাপথ্যে থাকতে দেবেন না। শেষ অবধি চেষ্টা করবেন তিনি।

একমাত্র নাতিকে সুস্থ করে তোলার জন্য বৌমাকেও এসব কথা বলতে পারে না। ফটিকের রোগের কথাটাও বলেন নি। ওর চিকিৎসা আর পথ্যের দরকার। ওষুধপত্রও কিনতে হবে। কোনো দিকে কোনো পথ না পেয়ে শেষ অবধি বেদান্ততীর্থ এইটাই স্থির করেছেন।

তাঁর ওইটুকু হারাবার ভয় আজ নেই।

তাই মনস্থির করেই তিনি এসেছেন ত্রিদিববাবুর কাছে আর অন্য কোনো পথ না পেয়ে।

একদিকে তার শেষ সম্বল ওই ধানিজমিটুকু, বাগান, আর অন্যদিকে একমাত্র বংশধরের জীবনের প্রশ্ন। বেদান্ততীর্থ ছেলেটার কথাই বেশী করে ভাবছেন—তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সর্বস্ব হারিয়ে মানুষগুলো এখানে এসেছে. তাদের আর যা কিছু আছে তাও হারিয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না।

ত্রিদিববাবুও জানতো এমনি হবে।

আর মনে মনে খুশীই হয়েছে সে। এই সুযোগে কিছু কামিয়ে নেওয়া যাবে। রোজকারের পথ তার চারিদিকেই। টাকা-জমি-প্রতিষ্ঠা একবার যার হাতে কিছুটা এসে যায়—তার কাছে ওগুলো আসে আরও বেশী মাত্রায়। আসার পথও খুলে যায়।

পুটু কেরানীও এই বুদ্ধিটা বাৎলে দেয়। রিলিফের খাবার, টাকা গম ইত্যাদি এখনও এসে পৌঁছয় নি। ট্রাক চলার পথ নেই—ওসব আসবে দু'চারদিন পর। সেই ফাঁকে ওরা জাল পেতেছে আরও কিছু রোজগারের জন্য। ত্রিদিববাবুর লোভী মনও আরো অনেক কিছু পেতে চায়।

নিঃসম্বল চাষীরা এখনও আশা করে বীজ ধান আর খোরাকি পেলে তবু অন্য ফসল বুনতে পারবে তারা। জমি অনাবাদী পড়ে থাকবে না।

হাল-গরু-বাছুরও নেই। সরকারী সাহায্য কবে আসবে তার ঠিক নেই। যখন ওসবের জন্য ঋণ পাবে তখন আর সময় থাকবে না।

তাই পুটু কেরানীই শশী মোড়ল আরও সবাইকে বুদ্ধিটা দেয় পরম হিতৈষীর মতোই।

—টাকা তো পাবে সরকার থেকে, তবে দেরি হবে। ততদিন কাজ চালাতে হবে তো? তাই বলছিলাম—ধরো না মুখুয্যে মশায়কে, তার টাকায় শেওলা পড়ছে—বিপদের সময় তিনিই এখন কর্জ দেন, টাকা তো পাস হবে তাঁর হাত দিয়েই, কৃষি লোনের টাকা, তিনি তখন কেটে নেবেন। এখন তো কাজ চলুক। বীজ তৈরি করতে পারবে, জমি মুক্ত করতে হবে।

ওদেরও তাই মনে হয়, এসময় সাহায্য পেলে কাজে লাগে। তবু শশী মোড়ল, ভূষণ আরও অনেকে বলে,

—তিনি কি দেবেন ?

পুটু গর্জায়—কেন দেবেন না ? তাহলে প্রেসিডেন্ট কেমন হে ? চলো, আমিও যাবো তোমাদের সাথে। এসব কাজে সাহায্য করতেই হবে।

পটলাও সায় দেয়—নিশ্চয়ই।

পয়সার গন্ধ পেয়েছে সে—অমনি দল বেঁধে এসে আগে হাজির হয়েছে পটল। ত্রিদিববাবু জানতো কথাটা। পুটুই আগে থেকে তাকে এসব বিষয়ে তালিম দিয়ে রেখে ছিল।

পুটুর কথামতো সেও ওদের সঙ্গে করে এনেছে ত্রিদিববাবুর বৈঠকখানায়।

ত্রিদিববাবু প্রথমে অবাক হবার ভান করে।

—এত টাকা দোব কোত্থেকে ?

পুটু বলে—একটা গতি করতেই হবে স্যার।

এমনি করে ওই লোকগুলোকে এনে তার জালে ফেলেছে। এসময় ওদের টাকার দরকার। খাবার নেই, জমিতে ফসল নেই—আশ্রয় চাই। তাই টাকার দরকার। আর এই সুযোগে ওদের সেরা জমি-বাগান-পুকুরগুলো বন্ধকী কওলা লিখিয়ে নেওয়া যাবে সেই বুদ্ধিটাও বাত্‌লে দিয়েছে।

পুটু বলে,—ও সব ব্যবস্থা করে দোব আমরা। এসময় টাকা দেন না হয় একটা কর্জপত্র থাকবে।

পটলাও জানায়—আপনার ক্ষেতি হবে না মুখুয্যে মশায়, তবে আমাদের একটু দেখবেন।

ত্রিদিববাবু কথাটা ভাবছেন। লোভনীয় প্রস্তাব। আর ওই পটলাকেও তার হাতে রাখা দরকার। তাই বলে,

—ঠিক আছে। পটল তুমি হাতখরচা বিশ টাকা রাখো। নাও হে পুটু—তুমিও নাও কিছু টাকা। তবে বাবাজী ফেরে পড়বো না তো এইসব করতে গিয়ে ? বলছো বন্ধকী কওলা হবে।

পুটু বলে,—এক নামে কেন রাখবেন বড়বাবু। বেনামী—সব বেনামীতে কাজ হবে। ছচারটা আলাদা আলাদা নামে বন্ধকীকওলা করবেন। ওসব অসুবিধা হবে না।

ত্রিদিববাবু নিশ্চিত হয়—তা মন্দ নয়।

সেই মতো কাজও হচ্ছে। চাষী মহলে রটে গেছে ত্রিদিববাবু মহাশয় লোক। নাহলে এমনি বিপদের দিনে টাকা কেউ দেয়? কৃষি ঋণ আসবে যখন তখন শোধ দিয়ে দেবে ওরা। এখন তবু প্রাণে বেঁচে থাকার জন্যেই ত্রিদিববাবু দরাজ দিল হয়ে উঠেছে। নামও কিনেছে লোকটা এই পরোপকারের শয়তানির আড়ালে।

চাষীরা টাকা নিচ্ছে কাগজে সই করে। তারাই এসে ভিড় জমিয়েছে ত্রিদিববাবুর বৈঠকখানায়। পুটু কাগজ লিখতে ব্যস্ত।

এমন সময় বেদান্ততীর্থ মশায়কে আসতে দেখে একটু অবাক হয় ত্রিদিববাবু! বেশ খুশী হয় না পুটু। কারণ একে শোষণ না করলেও চলবে না, করারও তেমন কিছু নেই। তাই ওকে দেখে মনে হয় শুক্‌নো বোঝা মাত্র, তবু ঝেড়ে ফেলা যায় না প্রবীণ মানুষটিকে।

তাই ত্রিদিব বলে,

—আপনি কাকা মশাই? কি ব্যাপার?

—একটু আসতে হল বাবা।

কথাটা বলতে বেদান্ততীর্থের কেমন লজ্জা করে। দয়া আর ভিক্ষা—এই ছটো জিনিসের জন্য কারো কাছে এলে এমনিতেই অনেক ছোট হয়ে আসতে হয়। উঁচু মাথাও হেঁট হয়ে যায়।

বলিরাজার কাছে বিষ্ণু ভিক্ষার জন্য এসেছিলেন—বামনরূপে।

আজ বেদান্ততীর্থকেও মাথা নিচু করে আসতে হয় কৃপাপ্রার্থী হয়ে ত্রিদিববাবুর কাছে। কুণ্ঠিত সুরে কথাটা পাড়েন তিনি, ত্রিদিববাবুর কাছে।

—কিছু টাকার দরকার ছিল ত্রিদিব।

ত্রিদিববাবু ওঁর দিকে চাইল। চোখাচোখি হয়ে যায় পুটুর সঙ্গে। পুটু ওই বৃদ্ধকে সহ্য করতে পারে না।

ও কিছু বলার আগেই বেদান্ততীর্থ জানান,

—তবে শুধু হাতে টাকা নেব না বাবা, ভাববে টাকা ফেরত পাবো কি না কে জানে! আমারও বয়স হয়েছে, কবে কি হয়! তাই বলছিলাম—আমার বাড়ির লাগোয়া বাগানটাই বন্ধক দিয়ে টাকা নোব। বৃদ্ধ বলে চলেছেন ক্লান্ত স্বরে :

—নাতিটার অসুখ—টাকার দরকার। ঘরবাড়িও সারাতে হবে নইলে দাঁড়াবো কোথায়? তারপর খাই খরচা আছে—ফসল তো নেই।

ত্রিদিববাবুর এসব কথা ঢের শোনা আছে। সে জানে মানুষ বিপদে পড়লে এমনি নানা কথা বলে। তবে আসল কথা সে জেনেছে।

ওঁর প্রস্তাবে ত্রিদিববাবু মনে মনে খুশী হয়। ওর ছোট বাগানটা পেলে তার সুবিধাই হয়। কারণ ওর বড় বাগানের এক কোণে ওটা। সেইটাই হাতে আসতে দেখে রাজী হয়ে যায়। ত্রিদিববাবুর বাগানটা বেশ চৌকো আর সুন্দর হবে। তবু খুশী চেপে ত্রিদিব বলে,

—তা বলছেন যখন—দেব। ওহে পুটু কাকা মশাই-এর একটা কাগজ করে দাও। পাঁচশো টাকা দিই—কি বলেন?

বৃদ্ধ তাতেই কৃতার্থ বোধ করেন—তাই দাও বাবা। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।

বেদান্ততীর্থ অনেক বেদনার মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ করেন।

ত্রিদিব মুখুয্যে মনে মনে হাসছে। খুশী হয়েছে সে। এমনি বন্যা হোক—এমনি বিপর্যয় আর সর্বনাশ আসুক। এতে তার এতটুকু ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে অনেক গুণ, আরও অনেক হবে।

তরুণ এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। সে শুনেছে এসব কথা। বেদান্ততীর্থ ওই বাগান বেচতে বাধ্য হয়েছেন এটাও শুনেছে সে।

হঠাৎ ত্রিদিববাবু যে কেন দানছত্র খুলেছেন—সেটা ঠিক বুঝতে পারে নি সে। কিন্তু পুটু কেরানীর ওই ডেমি কাগজ স্ট্যাম্প ডিউটির কাগজ-পত্র দেখে অবাক হয় তরুণ। বেদান্ততীর্থ ও আরও অনেক চাষীরা এসেছে কাছারিতে। তরুণের মনে হয় এই বন্ধকীপত্র থেকে ওরা মুক্ত হবে না।

গোপনে কি একটা চক্রান্ত চলেছে গরীব চাষীদের এই বিপদের সুযোগ নিয়ে। পটলা জানি চিনি দেবার বহাল সাক্ষী, সেও টাকাটা সিকেটা পাচ্ছে।

তরুণকে এখানে এসব কথা শুনতে দেখে পটলার সন্দেহ হয়। তাই শুধোয় পটল ঃ

—কি গো মাষ্টার মশাই ! এখানে ?

পটল বেশ জানে ত্রিদিববাবু তরুণবাবুর এখানে থাকাটা চায় না, তাই সেই-ই এগিয়ে এসে তরুণের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

তরুণ বলে,—একবার আসুন ত্রিদিববাবু। ডি এম সাহেব এসেছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন শুনে লাফ দিয়ে ওঠে ত্রিদিববাবু। কাগজপত্র হয়ে গেছে সে সব পড়ে রইল। ত্রিদিববাবু বলে—কোথায় তিনি ? হঠাৎ ?

তরুণ জানায়—রিলিফের ব্যাপারে—আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

তাই নাকি। পুটু কথাটা শুনে খুশী হয়—রিলিফ তাহলে আসছে ?

পুটুর থ্যাবড়া মুখটা খুশীতে ঝলমল করে ওঠে। ত্রিদিববাবু ওর দিকে চাইল। কাগজপত্রগুলো দেখিয়ে পুটু বলে,

—এসব আমি ঠিক করে রাখছি। আপনি যান কথাবার্তা বলুন। আরে অ পটলা—সাহেবের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, একবার ভেতর বাড়িতে মাকে খবর দে।

পটলাও দৌড়ল। সামনে মণে বেনেকে দেখে হুকুম করে পুটু।

—দত্ত মশায় চা করতে হবে। বৌকে বলে দাও। আর বিস্কুট আছে? ভালো বিস্কুট আছে? পটলা হাসতে হাসতে বলে আহ্লাদীকে।

—হাঁ করে দেখছো কি গ! চা চাপাও গে। খোদ জেলা সাহেব এসেছেন।

নিমেষের মধ্যে এখানকার আবহাওয়া বদলে যায়।

বৃদ্ধ বেদান্ততীর্থ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন আজ ভিখারীর মতোই। তাঁর টাকাটার দরকার। বলেন তিনি,

—পুটু একটু তাড়াতাড়ি হবে না বাবা? ওষুধ কিনতে পাঠাবো কিনা!

পুটু ওর দিকে চাইল। বেশ ভারিক্কি চালে সে বলে,

—একটু দাঁড়ান। দেখছেন না টাকার ব্যাপার। সব কাগজপত্র দেখতে হবে তো? পুটু বেশ চড়া ভারিক্কি স্বরে কথাগুলো বলেছে।

—ত্রিদিববাবুও ফিরে আসুন।

বৃদ্ধ অসহায়ের মতোই দাঁড়িয়ে থাকেন। এ ছাড়া আর পথও নেই। ওরা ডি এম সাহেবকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ক'দিন ত্রিদিববাবুকে মিলিটারীর লোকেরা পাত্তা দেয় নি। তারা নিজেরা মালপত্র এনেছে, নিজেরাই দিয়ে গেছে সেই সব খাবার-জামা-কাপড় ওই বন্যার্তদের। তাদের ব্যাপারে আর কাউকে নাক গলাতে দেয় নি।

পটলা দু'একবার এগিয়ে গেছে, কিন্তু ওদের দাবড়ানিতে আর বন্দুক দেখে সরে এসেছে।

পুটু কেরানীও ডাল গলাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে বুঝেছিল ওখানে সুবিধা হবে না। অবশ্য ও ধুরন্ধর লোক। ব্যাপার-স্যাপার

দেখে ও আর এগোয় নি। তফাতে দাঁড়িয়ে মনে মনে গজরেছে। ওই তরুণই মিলিটারী লোকদের নিয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়, উদ্ধার করেছে জলবন্দী মানুষদের। তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে খাবার-দাবার।

তখন পুটু বলেছে,

—দেখলেন মুখুয্যে মশায়, তরুণ মাষ্টারই যত নষ্টের মূল। ওই-ই মিলিটারীদের কিছু বলেছে, তাই আমাদের ওরা পাত্তাই দিচ্ছে না। ঠিক আছে। তবে তরুণ মাষ্টারকে একটু সমঝে দিতে হবে স্যার।

পুটু এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যই তাকাচ্ছে, ত্রিদিববাবুকে বলে সে—খাল কেটে কুমীর এনেছেন স্যার। ওকে মাষ্টার করেছেন ইস্কুলে। দেখছেন ছেলেগুলোকে নিয়ে কেমন রিলিফের নামে দলবাজি করছে। ওই এবার ইলেকশানে জাহির করবে আপনি কিছুই করেন নি বন্যার সময়। ওর দলকেই ও দাঁড় করাবে।

ত্রিদিববাবু কি যেন ভাবছেন। মনে হয় পুটুর কথাগুলো একেবারে মিথ্যা নয়। তরুণ এতদিন ধরে এমনি একটা পথই বেছে নিয়েছে। তাছাড়া দেখেছে ওই তরুণ অন্য মাষ্টারদের মতো তাকে এতখানি খাতিরও করে না। অথচ ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট সে, তাকেই মানে না। ওর মতামতের বিরুদ্ধে কথাও বলে সকলের সামনেই।

তরুণই আগ বাড়িয়ে এই বন্যায় বুক দিয়ে এসে পড়েছে। ত্রিদিববাবু ভাবেন—কোনো স্বার্থ ছাড়া এ কাজ কেউ করে না। আর স্বার্থ তার ত্রিদিববাবুকে জনপ্রিয়তার আসন থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দল গড়ে সেই আসন দখল করা। তাই পুটুর এ কথাগুলোকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না ত্রিদিবিবাবু।

জেলা সদরে—কলকাতায় ত্রিদিববাবুর ঘাঁটি আছে। ত্রিদিববাবুও ওর এই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবে। সেই জন্যই আজ এগিয়ে আসে লোকটা ওই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে। আজ ত্রিদিববাবু এখানের জনদরদী বন্ধু সাজতে চায়।

লোকজনের ভিড় জমেছে।

ত্রিদিববাবু এখন প্রাধান্য নেবার জন্য এগিয়ে এসেছে।

ডি এম সাহেব বলেন—রাস্তা মেরামত হয়ে যাবে দু'-একদিনের মধ্যেই। তারপর ট্রাক আসবে। গম-চাল-কাপড়-চোপড় রিলিফের ওষুধ স্টক করতে হবে। ডিস্ট্রীবিউশন করতে হবে।

তাক বুঝে ত্রিদিববাবু বলেন—তার জন্য জায়গার অভাব হবে না স্যার। নিজের বাড়ির দু'চারটে ঘরই ছেড়ে দোব! দেখুন না—কতো লোককে আশ্রয় দিতে হয়েছে। খাবারও যা পেরেছি দিয়েছি। তারপর ধরুন কৃষি লোন চাই, এখন তবু কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছি ওদের। কিন্তু আমার সাধ্য কতটুকু বলুন?

ডি-এম এবং আরও দু'-একজন অফিসার এসেছেন তাঁরাও এখানে ঘুরে ফিরে দেখেছেন সব।

পটলাও এরই মধ্যে কিছু লোকজন যোগাড় করে তালিম দিয়েছে। তারা শেখানো বুলি আওড়ায়।

—উনিই তবু বাঁচিয়েছেন আমাদের স্যার। এখন কাপড় কম্বল—খাবার কিছুই নেই। ওষুধও পাচ্ছি না।

ত্রিদিববাবু পটলার দিকে চাইলেন। পটলা তার হয়ে সাফাই সাক্ষীও যোগাড় করে এনেছে। আর তাদের সংখ্যাও কম নয়, তাছাড়া মজা দেখার জন্যও অনেকে এসে ভিড় জমিয়েছে। পটলা আপনা থেকেই নেতা সেজে বসেছে।

পটলাই আড়াল থেকে জিগির তোলে—আমাদের খাবার দিতে হবে—কৃষি ঋণ দিতে হবে।

গলা মেশাবার লোকের অভাব হয় না।

তরুণ ওদের থামাবার চেষ্টা করে। ওই গোলমালে কাজের কথা এগোবে না। তাই বলে—তোমরা চুপ করো।

পুটু কেরানীও ত্রিদিববাবুকে বলে চুপি চুপি।

—তরুণ মাষ্টারের এটা ভালো লাগছে না স্যার। ও তাই

থামাতে চাইছে ওদের। আপনার হয়ে ওরা কথাটা বলছে কিনা তাই ওর এত গায়ের জ্বালা।

ত্রিদিববাবুরও মনে হয় কথাটা সত্যিই। তাই চুপ করে থাকে। ডি এম সাহেবও ওদের আশ্বাস দেন।

—সব রকম চেষ্টাই করছি আমরা। আপনারা শান্ত হোন।

ত্রিদিববাবুও বলে ওদের—তোমরা চুপ করো।

এই ফাঁকে পটলা তিড়িং করে লাফ দিয়ে মন্দিরের চাতালে উঠে, দু' হাত তুলে বরাভয় মুদ্রা দেখিয়ে ওদের শান্ত হতে বলে।

এত গোলমালের মধ্যে ত্রিদিববাবু অতিথিসৎকারের ত্রুটি করে নি। লোকটার সঙ্গতি আছে। আরও পেতে চায় সে। তাই কর্তাদের আদর করে নিয়ে যায়—চলুন স্যার, একটু চা খেতে হবে। জলে কাদায় ঘুরে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন।

ওঁরা আপত্তি করেন—না, না। ওসব হাঙ্গামা করবেন না।

—তাই কি হয় স্যার? পুটু বলে।

পুটুই এসব ব্যবস্থা করেছে। ত্রিদিববাবু দোতলার সাজানো ঘরে ওঁদের নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। মেজেতে কার্পেট পাতা, সোফা সেট টি-পয় দিয়ে সাজানো, বিলেতী কাট-গ্লাসের প্লেটে গাওয়া ঘি-এর লুচি সন্দেশ আলুভাজা, তার সঙ্গে বিস্কুট আর দামী চা রয়েছে।

ব্লক অফিসার ভদ্রলোক এদিক ওদিক চাইছেন, তরুণ এখানে আসে নি। তিনি শুধান—তরুণবাবু আসেন নি?

তরুণ এখানে আসতে চায় নি নিজেই।

পুটুও সযতনে তরুণকে এড়িয়ে ওদের এনেছে। কারণ এ সব ব্যাপারে বেশী ভিড় বাড়াতে নেই। তাতে প্রাধান্যই চলে যায়।

ত্রিদিববাবু বলেন—সে আছে ওদিকে। বুঝলেন স্যার—বড় ভালো ছেলে তরুণ। বিদেশী, তবু এখানের মানুষের জন্য তার সমবেদনার

শেষ নেই। সবই ভাল—তবে কি জানেন, ওরা ওই একপেশে একগুঁয়ে।

ত্রিদিববাবু যেন তরুণের মতবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত করতে চান।

পুটু ঠিক এটা চায় না। সে ধীরে ধীরে তরুণকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদেরই প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। দল মতের কথা না তুলে কৌশলেই সেটা সারতে চায়। তাই বলে,

—ওকে একটুও ফাঁকা পাওয়া যায় না ; দিনরাত কাজ নিয়েই আছে। নিন্ স্যার! ঠাণ্ডা হয়ে যাবে খাবারগুলো।

ডি এম সাহেব আপ্যায়নের এই প্রাচুর্য দেখে অবাক হন। নিচে চারিদিকে দেখেছেন বুভুক্ষু সর্বহারা মানুষগুলোর হাহাকার।

ওরা কদিন ধরে এখান ওখানে পড়ে আছে। খেতে পায় নি। তিনি দেখেছেন ছেলেগুলোর চোখে ক্ষুধার ছায়া। ওরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাদের পানে চেয়ে আছে। তাদের জন্য কখনও কিছু করা সম্ভব হয় নি। অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় তারা দিন গুণছে চরম বিপদের মধ্যে, কথাটা ভাবতেও বিশ্রী লাগে তাঁর। ওই অনাহার আর ক্ষুধার সামনে এই প্রাচুর্য দেখে মনে মনে বিস্মিত আর বিরক্ত হন তিনি। ওই লুচি-সন্দেশ-খাবারের স্তূপ দেখে বলেন তিনি,

—এসব খাবারের দরকার নেই ত্রিদিববাবু।

ত্রিদিববাবু অবাক হন—সব খাঁটি জিনিস স্যার। ঘরের তৈরি।

আসল কথাটা ভাববার মতো মানসিক অবস্থা ত্রিদিববাবুর নেই। হাসলেন ডি এম—না! —তা নয়। ওসব থাক। চাই-ই খাচ্ছি।

আসল অভিযোগটা চেপে গেলেন তিনি নিছক ভদ্রতার খাতিরে। ওই খাবার মুখে তুলতে তাঁর বিবেকে বাধে। এত ক্ষুধার সামনে নিজের খাওয়ার কথা মনে হয় না।

অগণিত মানুষ তাঁদের মুখ চেয়ে আছে। তাঁদেরও দায়িত্ব রয়ে

গেছে। ওঁরা বের হয়ে আসছেন। এখান থেকে আরও দু'-একটা ক্যাম্প ঘুরে যেতে হবে।

হঠাৎ সামনে বয়স্ক বেদান্ততীর্থ মশায়কে দেখে দাঁড়ালেন ওঁরা।

ত্রিদিববাবু, পুটুও নেমে আসছিল পিছনে, ওরা এই সময় হুজুরদের বাধা পেতে দেখে বিরক্ত হয়।

পুটু বলে—পথ ছাড়ুন ভট্‌চায মশায়, ওঁদের সময়ের দাম আছে। অন্য ক্যাম্পে যেতে হবে ওঁদের।

বেদান্ততীর্থ আজ বিপদে পড়েছেন। টাকা কিছু পাবেন তার জন্য নিজের হাতে সাজানো বাগানটাই খাইখালাসী বন্ধক দিতে হয়েছে। তিন বছর আর তার ফলে, পুকুরের মাছে কোন দাবি থাকবে না। টাকা দিতে না পারলে ও বাগান ত্রিদিববাবুরই হয়ে যাবে।

কিন্তু সেই টাকা নিয়েও ফটিকের চিকিৎসার কোনো সুরাহা হবে না। ডাক্তার, ওষুধও এখানে জোটে নি। তাই বৃদ্ধ এসেছিলেন ওঁদের কাছে যদি কোনোরকম সাহায্য হয়। চিকিৎসার তারই আশায় ব্যাকুল কণ্ঠে বৃদ্ধ জানান ম্যাজিস্ট্রেটকে।

—হুজুর, আমার নাতির অসুখ, এখানে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, পথ্যি নেই। যদি ওকে কোনোরকমে শহরে পাঠানো যেতো তা হ'লে হয়তো ভালো হয়ে উঠতো ও।

বুড়ো বেদান্ততীর্থ জীবনে কারো দয়া বা দান গ্রহণ করেন নি। আজ উপায়ান্তর না দেখে এসেছিলেন—যদি কোনো সুরাহা হয়।

ডি এম সাহেব ওঁর কথাগুলো শুনছেন। তিনি বল্লেন,

—মেডিক্যাল টিমও আসছে কালই, যদি তেমন অসুবিধা বোধ করেন শহরের হাসপাতালেই পাঠাবেন তাঁরা।

এর মধ্যে তরুণও এসে পড়ে। ত্রিদিববাবু-পুটুও সায় দেয়।

—তাই হবে। আমরা তো রয়েছি। নাতির ব্যবস্থা হবেই। এখন ওঁদের এত ভাবনা যে এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাববার সময়

নেই। কাল তো ডাক্তার আসছে! তাঁরাই সব ব্যবস্থা করবেন। চলুন স্যার—আমিই সব ব্যবস্থা করবো এর।

আরও কি যেন বলতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু ওদের সময় নেই। ওঁরা এগিয়ে গেলেন নৌকার দিকে। লোকজন ওঁদের কাছে ভিড় করে তখনও কাতর আবেদন জানাচ্ছে—খাবার চাই—কাপড় চাই—আশ্রয় চাই।

একা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন বেদান্ততীর্থ অসহায়ের মতো। তাঁর আবেদন যে নিষ্ফল ব্যর্থ হয়ে গেছে সেটা বেশ বুঝেছেন তিনি।

—পণ্ডিত মশাই!

বৃদ্ধ চমকে ওঠেন।

তরুণ ওকে ডাকছে। ছেলেটিকে দেখেছেন তিনি। কয়েকদিন ধরে প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছে সে। বৃদ্ধ অসহায় কণ্ঠে বলেন ওকে,

—কি হবে বাবা? ওঁরা তো শোনবার অবকাশই পেলেন না আর ত্রিদিবরাও এড়িয়ে গেল। আমার ফটিকের কি চিকিচ্ছে হবে না?

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কি হতাশায় বিবর্ণ হয়ে বুজে আসে। তরুণও দেখেছে ব্যাপারটা। বলে সে—আপনি ভাববেন না। আমি চেষ্টা করবো।

—সত্যি? বৃদ্ধ ওকে বিশ্বাস করতে পারেন।

তাই কৃতজ্ঞতা ভরা চাহনিতে চেয়ে থাকেন ওর দিকে।

কে যেন হাসছে। হাসি নয় উঠছে বিকৃত কণ্ঠস্বর: মাথার চুলগুলোয় তেল অভাবে জটা পড়ে গেছে। পরনের শাড়িখানা ছেঁড়া, চোখ দু'টোয় অস্বাভাবিক একটা দীপ্তি। মেয়েটা হাসছে ঠা ঠা করে ওকে দেখে। উন্মাদ অর্থহীন সেই হাসি।

—কে! বৃদ্ধ ওই নিষ্করুণ বিকৃত হাসির শব্দে চমকে উঠেছেন। ওই পাগলী মেয়েটা যেন তার সব আন্তরিকতা আর চেষ্টাকে নিষ্ঠুর নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করছে ওই অট্টহাসিতে। বেদান্ততীর্থ ভয় পেয়েছেন ওর এই উন্মাদ আবির্ভাবে।

তরুণ অবাক হয় শান্ত বৌটাকে এমনিভাবে বদলে যেতে দেখে। বলে সে,

—ভূষণের বৌ! কোলের ছেলেটা মারা যাবার পর থেকেই অমনি হয়ে গেছে। মা জানল না—ছেলেটা কখন তার কোলেই ফুরিয়ে গেছে। সেই মৃত ছেলেটাকেই বুকে ধরে রেখেছিল ক'দিন ক'রাত।

বেদান্ততীর্থ শিউরে ওঠেন কি আতঙ্কে—নারায়ণ, নারায়ণ!

অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠেন তিনি—এও সম্ভব বাবা! মাতৃস্নেহ অন্ধ।

মেয়েটা তখনও হাসছে, বিকৃত বীভৎস সেই হাসিটা সারা ধ্বংস-পুরীকে ভরিয়ে তুলেছে কি হতাশা আর বিষণ্ণতায়। সব চেষ্টা—বাঁচার আশ্বাস, স্নেহ মানবিকতাকে ওই হাসির চাবুক দিয়ে সে সাপটাচ্ছে। চুরমার করে দিতে চায় সবকিছুকে।

চামেলি দেখেছে ব্যাপারটা। তরুণকে ত্রিদিববাবু, গোবিন্দ মুন্সী, পুটু কেরানী যে সাহেবদের কাছে এগোতে দিতে চায় না তা দেখেছে সে।

মেয়েরাও একপাশে ভিড় করে দেখছিল ওদের। সৌরভীও দেখেছে ব্যাপারটা। মেয়েটার নজর চারিদিকে। অনেক পাঁক দেখেছে সে।

সেই-ই বলে ওঠে—বান গেল, শিয়াল শকুনি কাক চিলের ভিড়ই লাগবে চামেলি দিদি। দেখছ না, কেমন ছোঁক ছোঁক করছে ওদের নোলা।

পুটু কেরানী মেয়েটার কথাগুলো শুনেছে—তার মুখ চোখ কঠিন হয়ে ওঠে।

ডি-এম সাহেবের দলবলকে বিদেয় করে ওরা এইবার স্বপ্ন দেখছে যে অনেক কিছুই হাতে আসবে তাদের, এমন সময় মেয়েদের মধ্যে ওই সব কথা শুনে পুটু ধমকে ওঠে সৌরভীকে।

—থামবি তুই ? সব তাতেই তোর ফট্‌ফটানি।

সৌরভী ওর নিটোল মাজা ঘুরিয়ে চোখের কোলে তেরচা চাহনি এনে একপাক ঘুরে নিয়ে বলে,

—মরি মরি রে! ছুঁচোর চাকর চামচিকে। তার মাইনে চৌদ্দ সিকে। পটলাও রিলিফদার হয়ে উঠলি দেখছি। বাহবা কি বাহবা।

পুটু গর্জে ওঠে—এ্যাই মাগী !

ত্রিদিববাবু এইবার ওর দিকে চাইল। সৌরভী অবশ্য ত্রিদিববাবুকেও পরোয়া করে না। কারণ ওই লোকগুলোর প্রকৃত স্বরূপটা সে চেনে।

ত্রিদিববাবু পুটু কেরানী—গ্রামের অনেক মাতব্বরদের সে ভালো করে জানে। তার জীবনের খাতার পাতায় ওদের অনেক বিকৃত কালো ছবিগুলো আঁকা আছে মোটা ধ্যাবড়া কালির আঁচড়ে।

তরুণও বুঝতে পারে ব্যাপারটা। সেই-ই থামায় সৌরভীকে।

—কাজের কথা হচ্ছে, তোরা ভিড় করেছিস কেন ? যা—

ওরা চুপ করে গেল। ত্রিদিববাবুর নজর এড়ায় না যে দজ্জাল মেয়েটাও তরুণের কথায় একদম চুপ করে গেল।

ত্রিদিববাবু তখন সাহেবদের কথা নিয়ে আলোচনা করছেন, তাই আর ফিরে চাইল না। ব্লক অফিসার তখনও রয়ে গেছেন। তিনি বল্লেন,

—রিলিফের জিনিসপত্র—পারমিটের মালপত্র যা আসবে একটু দেখেশুনে বিলি-বাঁটোয়ারা করবেন, আর সেটা যেন নিয়মমাফিক হয়।

পুটু কথাটায় আশ্বাস পায়। বলে সে—সব লিষ্ট পাকা থাকবে স্যার।

—ও সব ভাববেন না স্যার। প্রত্যেকটির আমরা রসিদ-ভাউচার রাখবো, টিপসই থাকবে। বুঝলেন স্যার, এরই মধ্যে রিলিফকে কেন্দ্র করেই নোংরামি দলাদলি শুরু হয়ে গেছে। বদনাম দেবার লোকের অভাব নেই স্যার।

ত্রিদিববাবুও বলে,

—তাই দেখুন স্যার, টাকা আগাম কিছু দিচ্ছি চাষীদের, এখন কিছু টাকা পেলে সত্যিকার কাজ হবে তাদের। তাই নিয়ে কথা উঠেছে আমি নাকি লোকদের ঠকাচ্ছি।

—উপকার করার উপায় আছে ?

পুটু জানায়।

ত্রিদিববাবু তরুণকে দেখিয়ে যেন কথাগুলো বলে,

—তাতেও কতো কথা শুনতে হচ্ছে। তবে ওসব ঠিকঠিক হবে স্যার। পিছনে লাগবার লোকের তো অভাব নেই, বুঝলেন—বানে সব গেছে তবু দলাদলি আর নীচতাটাকে ডুবিয়ে দিতে পারে নি।

ব্লক অফিসারও সায় দেন—ঠিক বলেছেন।

ওরা ফিরে গেছেন অনেক আশ্বাস দিয়ে।

পুটু-ত্রিদিববাবু অপিসে ফিরে আসে। কাজ-কারবার মনে হয় ভালই চলবে। ত্রিদিববাবু খুশী হয়েছে। পুটুও। পিছনে আসছে পটলা। ইতিমধ্যে সেও এঁটুলির মতো এদের পিছনে লেগেছে। মধুর সন্ধান পেয়েছে সেও। আর বুঝেছে কৌশল করে সেও কিছু আদায় করবে এই ফাঁকে।

পথের ধারে দেখে মণি দত্তের বৌ আহুরী দাঁড়িয়ে আছে, সেও দেখছিল এদের ওই শোভাযাত্রা। পটলা ওর দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটার দেহের বাঁধনে এতটুকু ঠোস পড়ে নি এখনও সেই মেয়েটার দেহের কানায় কানায় যৌবনের জোয়ার ; ওর চোখে নেশার ডাক। পটলা থমকে দাঁড়াল।

ও যেন আটকে পড়েছে এখানে। ওর দিকে চাইল আহুরী। একটা ঝুপি তেঁতুল গাছ জায়গাটাকে আঁধার করে রেখেছে, বাঁশ বনের নিচে নিচে তখন কাদা জল, চারিদিকে শুধু আবর্জনা আর ময়লার রাজ্য।

পটলা বলে—মণিদা ফিরেছে শহর থেকে?

পটলার ও খবরে দরকার নেই, শুধু কথা কইবার জন্যই ওই কথা পেড়েছে সে। হাসল বৌটা, ঠোঁটের ডগে সেই হাসিটা তীক্ষ্ণ ঝিলিক আনে।

আহ্লাদী বলে :

—ওর খপর ওই জানে!

কথার সঙ্গে সারা দেহে ঢেউ জাগে আহ্লাদীর। কেমন বেপরোয়া ভাব ওই মেয়েটার চোখে-মুখে। সে বোধহয় মণি দত্তকে গ্রাহ্য করে না। যদিও আগে করতো এখন তার প্রয়োজনও বোধ করে না।

পটলা বলে,—সেকি গো? তোমারই তো জানার কথা। স্বোয়ামী—

—ছাই? এমন ভাতে ছাই দিই।

সে বৌটা চলে গেল লহর তুলে, প্রতিবাদই ফুটে ওঠে তাতে। পটলা কি ভাবছে। হঠাৎ চীৎকারটা ওর কানে আসে।

বেশ চড়া গলাতেই চীৎকার করছে পুটু কেরানী। ত্রিদিববাবুর গলাও শোনা যায়। তরুণও কি বলছে। বাতাসে কিসের গন্ধ পায় পটলা। সেও এগিয়ে যায়। মনে হয় তারও কিছু করণীয় আছে এই দৃশ্যে। আহ্লাদীর ব্যাপারটা তার মনে সুর তুলেছে। আপাতত ওটা চাপা থাক। পটলার এখন অন্য কাজ আছে।

পটলা অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিড় ঠেলে দাঁড়াল ঠিক সময় মতোই সেখানে গিয়ে।

নাটক তখন অনেকখানিই এগিয়ে গেছে। পুটু দাপাচ্ছে—মিছে কথা।

বৃদ্ধ বেদান্ততীর্থের ফর্সা মুখ টকটকে রাঙা হয়ে গেছে। তিনি কি উত্তেজনার আবেগে কাঁপছেন। গায়ের উত্তরীয় খুলে পড়েছে। বৃদ্ধ প্রকম্প স্বরে বলে চলেছেন,

—মিথ্যা কথা আমি বলি নি পুটু। বন্ধকী ডেমি কাগজখানা সই করে ত্রিদিবকে দিলাম। টাকাটা তখনও পাই নি। ওই সাহেবরা আসতে তোমরা উঠে গেলে, আমিও ভাবলাম ফিরে এসে টাকা দেবে। তাই তখন কিছু বলি নি, সত্যি কথা বলছি—টাকা আমি পাই নি। দাও নি তোমরা।

পুটু ফ্যাঁচ করে ওঠে,

—টাকা আমি পাই নি। মাইরি আর কি! টাকা হাতে না নিয়ে কেউ কাগজ সই করে দেয়? ন্যাকামির আর জায়গা পান নি? বেশতো সাধু মহাপুরুষ সেজে থাকেন, মিছে কথা বলতে এতটুকু বাধল না?

ত্রিদিববাবু বলে, তোমার ক্যাশে টাকা নেই তো পুটু?

পুটু জবাব দেয়—ওকে দিলাম, টাকা থাকবে কেন বড় বাবু? ক্যাশ মিলিয়ে তবে তো বলছি। পুটু সাফ জবাব দিল।

বেদান্ততীর্থ ওর দিকে চেয়ে থাকেন। বৃদ্ধ কিছু টাকার জন্য এসেছিলেন, তাঁর বাগান বন্ধক রেখে সেই টাকা সংগ্রহ করতে রাজী হন। কাগজপত্রও সই করে দিয়েছেন, এমনি সময় ডি, এম দলবল নিয়ে এসেছেন শুনে ত্রিদিব-পুটু কেরানী চলে গেছল। বেদান্ততীর্থ ভেবেছিলেন ওরা টাকাটা এসে দেবে। তাই ওরা ফিরে এলে তিনি টাকার কথা বলেছেন, তারপরই পুটু নিজ মূর্তি ধরেছে।

বেদান্ততীর্থ স্বপ্নেও ভাবেন নি এমনিভাবে ওরা মিথ্যা কথাটাকে সত্য করে তুলবে।

ওদের চীৎকারে তরুণও এসে জুটেছে। ও জানে বেদান্ততীর্থকে, পুটুকে ওই ভাবে কথা বলতে দেখে তরুণ চটে ওঠে।

—কি যা তা বলছেন কেরানীবাবু? উনি মানী লোক, মিথ্যা কথা বলেন না। দেখুন আপনার ভুল হয়েছে, আবার দেখুন। ক্যাশ মিলিয়ে দেখে না দেওয়া থাকলে দিয়ে দেন টাকাটা। ভুল হতে পারে তো?

পুটু গর্জন করে ওঠে ছোকরার কথায়। জানে সে ক্যাশে ও টাকাটা মজুতই আছে। ওটা তার ভাগেই যাবে। তাই তরুণের কথায় জবাব দেয় পুটু :

—মানী লোক। থাক্ থাক্! সবাই মানী-গুণী ব্যক্তি, আমরা ফ্যালনা? হাত পেতে টাকাটা নিয়ে আবার বলা হচ্ছে নিই নি টাকা।

—না বাবা। টাকা নিই নি।

বেদান্ততীর্থের চোখ ফেটে জল বের হয়ে আসে। তার সখের বাগানটুকুও গেল—তবু আশা করেছিলেন ওই টাকায় ফটিকের চিকিৎসা করাতে পারবেন, কিন্তু সে আশাতেও ছাই পড়েছে। বাগান যায় যাক্, কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে ওরা তাঁকে মিথ্যাবাদী চোর সাজাবে এই কথাটা ভেবেই তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে।

বেদান্ততীর্থ স্পষ্ট স্বরে বলেন—না, নিই নি ও টাকা। তুমিই মিথ্যা কথা বলছো। ত্রিদিব তুমিও জানো—টাকা আমি পাই নি হাতে।

—আমি কি করে জানবো বলুন? আমি তো উঠে গেলাম।

ত্রিদিববাবু নিপাট ভালোমানুষ সেজে গেছে।

ভিড় ঠেলে পটলা এমনি সময় এগিয়ে এসে বলে—ওই তো টাকা নিয়ে চাদরের খুঁটে বাঁধলেন। আমি দেখেছি ঠাকুর মশাই।

বেদান্ততীর্থ পটলার দিকে চাইলেন। শুট্‌কো পটলার কথার জবাব দেন তিনি।

—না, বাবা! নিই নি টাকা। তুমি ভুল দেখেছো।

পুটু সাফাই সাক্ষী পেয়ে খুশি হয়। সেও চড়া স্বরে বলে,

—ওরা দেখেছে তাও মিথ্যা?

পুটু এবার গলা সপ্তমে তুলে শাসায়।

—থাক্, থাক! যান দিকি। ঝামেলা করবেন না। না গেলে—

পুটু উঠে দাঁড়িয়েছে এবার।

বৃদ্ধের দু' চোখ বেয়ে জল নামে। বঞ্চনা, প্রতারণা আর জমাট

হতাশার কালোছায়া ওর ছু' চোখে, সারা মনে কি অপরিসীম বেদনা, ছুনিয়ার রূপ তাঁর কাছে বদলে গেছে। কান্নাভেজা কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে ওঠেন,

—আমি ব্রাহ্মণ পুটু। এখনও ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করি, গায়ত্রী মন্ত্র ধ্যান করি। সব গেছে, তবু ধর্মকে বিসর্জন দিই নি। আমার একমাত্র নাতির নাম করে বলছি, বিশ্বাস করো তুমি। একমাত্র নাতির নামে শপথ করে বলছি—টাকা আমি পাই নি। ধর্ম দেখবে, সেই-ই এর বিচার করবে। শিউরে ওঠে বিজয়া।

—বাবা! বাবা!

বিজয়াও এসে দাঁড়িয়েছিল, ব্যাপারটা শুনেছে সে। বৃদ্ধ শ্বশুরকে অসহায়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে ওই শপথ উচ্চারণ করতে দেখে চমকে উঠেছে সে। বিজয়া ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বৃদ্ধের হাতটা ধরে ওকে সান্ত্বনার স্বরে বলে,

—ও সব কথা থাক বাবা। টাকার আমাদের দরকার নেই। আপনি চলে আসুন। চলে অসুন ওখান থেকে, আর অপমান সইতে হবে না বাবা।

বৃদ্ধ অসহায় কণ্ঠে বলতে চান—কিন্তু মা, ওরা মিথ্যেকে সত্য বলে জানাতে চায়।

বিজয়ার ছু' চোখে ছুঃসহ জ্বালা। ওই লোকগুলোকে চিনেছে সে। আজ তার সারা মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। একমাত্র সন্তানের চিকিৎসাও হবে না, তবু এই বৃদ্ধের ওপর এই অত্যাচার তাঁর এই লাঞ্ছনা বিজয়ার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। ও বলে,

—সত্য মিথ্যার তফাত ওদের নেই। চলে আসুন বাবা। ঈশ্বর আছেন কি না জানি না—থাকলে তিনিই এর বিচার করবেন।

অসহায় বৃদ্ধের ছু'চোখ বয়ে জল নামে, বিজয়া ওঁকে হাত ধরে নিয়ে চলেছে। পুটু তখনও গজরায়—ন্যাকামি। পুরো টাকা নিয়ে বলে কিনা পাই নি! আবার ধম্মো দেখানো হচ্ছে!

কিশোরী ধাড়া কলকাতায় ফিরছে। তার জন্য একটা নৌকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিশোরী ব্যাগটা নিয়ে টলতে টলতে আসছিল। এদের ব্যাপারটা সেও দেখেছে। শুনেছে ওই সব কথাগুলো। কিশোরী কি ভেবে বেদান্ততীর্থকে দেখে দাঁড়াল। বিজয়াও ওকে দেখছে।

মাতাল লোকটা এগিয়ে এসে ময়লা পাঞ্জাবির পকেট থেকে দলা পাকানো দু'খানা একশো টাকার নোট বের করে বলে—এ-টাকাটা রাখুন তীর্থকাকা! অন্যায়ের টাকা এ লয়—খাটুনির পয়সা। যখন হোক দেবেন।

কিশোরী ধাড়া বলে,

—অন্যায় ন্যায়ের বিচার জানি না তীর্থকাকা। তবে মনে হয় ওই পুটু শ্লার কাছে এর কোনো দাম নেই।

পুটু বলে,—কি বলছো কিশোরী?

কিশোরী বলে,—তুমি শ্লা নাম্বার ওয়ান খচ্চর। দিলে তো বাবা সব গ্যাঁড়াফাই করে।

—মাতলামি করো না কিশোরী।

—কিশোরী! বেদান্ততীর্থ অবাক হন। টাকার তাঁর দরকার। কিন্তু একজন তাঁকে ঠকালো—অন্যজন অযাচিতভাবে দিতে আসবে ভাবেন নি। কিশোরী বলে,

—আজই চলে যাচ্ছি। টাকার দরকার হবে না। ওটা রাখুন! পেন্নাম হই! চলি তা' হলে—

কিশোরী এগিয়ে এসে পুটুর সামনে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকে। হঠাৎ কিশোর বলে—বেড়ে এক্‌টো করলি মাইরি পুটুলাল! প্রভাত অপেরার ঝানু এ্যাক্টর কিশোরী ধাড়াকেও তাক্ লাগিয়ে দিলি শ্লা। বাহবা কি বাহবা! দিনকে রাত বানিয়ে দিলি এক্‌টো করে। নাট্যকার-অভিনেতা-স্রষ্টা! সাবাস বরাহতনয়!

কিশোরীর মুখ-চোখ রাগে আর ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠেছে।

জায়গাটায় যেন বদ গন্ধ উঠছে। টলতে টলতে চলে গেল কিশোরী ধাড়া।

পুটু প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি ; হঠাৎ ওর কথাটার অর্থ সঠিক বুঝতে পেরে গর্জে ওঠে পুটু।

—মদো মাতালের জায়গা পাও নি হে! ভদ্দরলোকের জায়গা এটা। রীতিমতো আপিস।

কিশোরী ধাড়া অবশ্যি ওসব কথা শুনতে পায় না, এগিয়ে গেছে সে নৌকার দিকে। ওঁদের কথারও কোনো দাম দেয় না সে।

আর শোনার মতো অবস্থাও তার তখন নেই। শুনতে পেলে জবাবও দিতো। কিন্তু শোনে নি সে।

তরুণ দাঁড়িয়ে দেখছে—শুনছে সব কিছু। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ অসহায় বেদান্ততীর্থের ওই বাগানটুকু ওরা বিনা পয়সাতেই নিয়ে নিল। আরও অনেকেরই জমি নিয়েছে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে। কিন্তু গরীব বৃদ্ধকে ওরা নির্মমভাবে ঠকালো।

তরুণের মনে হয় ওই ত্রিদিব মুখুজ্যে আর পুটু কেরানী দুটো রাঘব বোয়াল। ওরা এই চরম দুঃসময়েও গরীবের সর্বস্ব শুধু গ্রাস করবার জন্যই ওৎ পেতে বসে আছে। মুখে ওদের দেশসেবার বাণী ভিতরে ওরা অন্য মানুষ। যেন দুটো বাঘ মানুষের মুখোশ পরে সমাজের বুকে শুধুমাত্র ফাঁকি দিয়ে বাস করে আছে। মনে মনে কঠিনতর হয়ে ওঠে তরুণ। তার সর্বশক্তি দিয়ে সে এই মুখোশটাই খুলে দেবে এই চরম অত্যাচারের অবসান ঘটাবে।

বেলা হয়ে গেছে। মলিনার রান্না-বান্নাও তৈরি। বিভূতি মাষ্টার খেয়ে নিয়ে ওরই মধ্যে একটু বিশ্রাম করছেন। তিনি ওসব ঝামেলায় থাকেন না। নিরীহ মানুষ। তরুণের মতো সারাদিনরাত এই কাজে

তিনি ভুবতে পারেন নি। কোনো রকমে হেডমাষ্টারিটি বজায় রেখেছেন মাত্র। ইচ্ছে থাকলেও শরীরে সয় না।

বেলা হয়ে গেছে, তরুণ তখনও খেতে আসে নি।

মলিনা বলে,—একবার যা না চামেলি—ডেকে আন তরুণকে। ধন্যি ছেলে যাহোক। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই তার ?

বাইরে লোকজনের ভিড় দেখেছে চামেলি। ও বলে,

—ডি-এম সাহেবেরা এসেছিলেন, রিলিফের কাজে কি কথা হচ্ছিল। আর বিজি লোককে ডেকে ডেকে এনে খাওয়াতে পারবো না। কেন ওর কি খিদে তেষ্টা লাগে না যে ওটা তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে বার বার? তরুণদাও ঠিক পছন্দ করে না এই ডাকাডাকি।

চামেলি যেন এত লোকের মাঝে গিয়ে ওকে ডেকে আনতে রাজী নয়।

মলিনা হাসে মনে মনে। তবু বলে,

—যা বাছা, যা একবার।

চামেলি তাই ডাকতে এসেছিল তরুণকে। তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। মুখে চোখে ওর বেদনার ছায়া। চামেলিও দেখেছে পুটুর ব্যাপারটা।

ও গিয়ে তরুণকে ডাকে—মা আসতে বললেন।

তরুণের এখানে করার কিছুই নেই। তাই চামেলির ডাকে মুখ নিচু করে এগিয়ে এল,—চলো যাচ্ছি।

পুটুর এই ঘটনাটা চোখ এড়ায় না। ওর নজর তরুণের দিকে। সে দেখছে চামেলি ওকে ডাকতে এসেছে।

পুটুই ব্যাপারটা দেখে ত্রিদিববাবুকে বলে,

—দেখলেন স্যার, ওই যে। পুটুর কথায় ত্রিদিববাবু ওদের দিকে চেয়ে থাকে।

পুটু বলে,—হেডমাষ্টার বিভূতিবাবুও কাজের লোক। তলেতলে ওই দলবাজ মাষ্টারকে হাতে রেখেছে। অর্থাৎ উনিই এসব ব্যাপার পাকাচ্ছেন। ভাবসাব দেখলেন ওদের ?

ত্রিদিববাবু এসব কথা এখন ভাবছে।

পুটু বলে চলেছে—তরুণবাবু মাষ্টারী করবে কখন বলুন? দলবাজি আর লভ—তুটো করে আর কিছু করা যায়? আর এইসব কাজের প্রতিবাদও করা হয় না। তাই বেড়ে চলেছে।

পুটু আজ কথা বলার সুযোগ পেয়েছে।

ত্রিদিববাবুর নীতিজ্ঞান টনটনিয়ে ওঠে—এসব কি বলছো হে? মানে ওই লভটভএর ব্যাপার?

হাসে পুটু বিজ্ঞের মতো। এসব প্রসঙ্গ যে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়—সেইটা বোঝাবার জন্যই পুটু বলে,

—বেলা হয়ে গেছে, যান স্যার। স্নান আহার করে বিশ্রাম নিন গে। ওবেলায় দেখা হবে। ওসব বাজে কথা নাইবা ভাবলেন।

পুটুর কথাগুলো তবু ভুলতে চায় না ত্রিদিববাবু। কারণ এখন সে দেখছে আরও অনেক উঁচুতে উঠবে। এই বন্যাত্রাণএর কাজই হবে তার এবার ভোটে দাঁড়াবার পাসপোর্ট, তাছাড়া এর মাধ্যমে রোজগারও ভালো হবে। তাই সবদিক ভেবেচিন্তে সে পথ চলতে চায়।

ত্রিদিববাবুর ওই একটা দুর্বলতাই বলা যেতে পারে। তার নিজের ভাববার ক্ষমতা অনেক কম। বিভিন্ন কাজ আর কারণগুলোর মধ্যে যে নিবিড় কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা তার মোটা মাথায় সহজে ঢোকে না।

কিন্তু একবার যদি ঠেসে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেই ভাবনাটা শিকড় গেড়ে বসবে, আর বের হবে না সহজে। তাকে কেন্দ্র করেই জট পাকাতে থাকবে।

তরুণের বিভিন্ন কাজগুলো তার মনে তেমনি জটিল একটা পরিস্থিতি গড়ে তুলেছে। তরুণের সম্বন্ধে ওই কথাগুলো ভেবেছে গভীরভাবে। মনে হয় ওসব ব্যাপার একেবারে মিথ্যে নয়, উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

তরুণ বাইরে থেকে এসে এখানে ধীরে ধীরে যেভাবে শিকড় গাড়ছে তাতে পরে ওকে হটাতে গেলে গোলমালই হবে। তাই সুযোগটা এখন থেকেই নিয়ে তৈরি থাকতে চায় ত্রিদিববাবু। যেন এক ধাক্কাতেই ওকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় দরকার মতো। আর তার জন্য বিভূতিবাবুকেও তাঁর দরকার।

ত্রিদিববাবুর গিন্নীও বাইরের মাঠে ও পাশের ইস্কুল বাড়িতে সারা গাঁয়ের ইতিজাতের ভিড় আর ওদের দুর্দশা দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। পয়সাওয়ালা লোকের বৌ সে—তাছাড়া ছেলেরাও ভালো ব্যবসা করছে। সেই জন্য তার দেমাক আকাশছোঁয়া।

ওই সব হাহাকার—দৈন্যদশা তার দেখতে বিশ্রী লাগে, ওই হতভাগা মানুষগুলোর চোখে বোধহয় বিষ আছে—আগুন আছে। ওরা তার ওই সাজানো সংসারকে হিংসা করে।

ত্রিদিববাবুকে তাই গিন্নী শুধোয়,

—ওরা কবে যাবে এখান থেকে? ওই ধুন্দুর দল; মাগো মা! জ্বালিয়ে দিলে। দিন রাত ভিখেরীর দল যেন হাঁ হাঁ করছে—এটা দাও—ওটা দাও। কড়াইএর দুধ, হাঁড়ির ভাত সব দিতে হবে? ওসব আপদ তাড়াও বাপু। আর সইতে পারছি না।

ত্রিদিববাবু গিন্নীকে এড়িয়ে চলে। তাই বলে—যাবে এইবার।

গিন্নী তখনও বলে চলেছে,

—ওই বুড়ো বামুনের বৌটা সেদিন এসেছিল, ছেলের অসুখ, একটু দুধ দাও।

ত্রিদিববাবুর স্ত্রীর দিকে চাইল। বুড়ো বামুন ওই গিরীশ বেদান্ততীর্থের কথা মনে পড়ে। ওর নাতির খুব অসুখ তার কাছে টাকার জন্যে এসেছিল। এই সুযোগে ওর সুন্দর বাগানখানা সে

হাতিয়েছে—কিন্তু পয়সাও দিতে হয় নি। পুটু কেরানী কৌশল করে বিনা পয়সায় ওই সম্পত্তি তার ঘরে তুলে দিয়েছে।

ত্রিদিব মুখুজ্যে হঠাৎ কেমন দয়ালু হয়ে ওঠে।

স্ত্রীকে জানায়—তা তুমি একটু দুধ দিয়েছো তো? মানুষের এই সব বিপদে সাহায্য করতে হয়।

গিন্নী স্বামীদেবতাটিকে ভালো করেই চেনে—ওর সব গুণাগুণের কথা তার অজানা নেই। হঠাৎ ওই বৌটার জন্যে ত্রিদিববাবুর দরদ উথলে উঠতে দেখে ওর দিকে চাইল তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে। বলে ওঠে গিন্নী,

—অ! তা দিতে হবে বৈকি? ছাই দোব—উনুনের ছাই। তাই শুধোচ্ছিলাম—ওই আপদগুলো এখান থেকে যাবে কবে? না গেলে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করবো কিন্তু।

ত্রিদিববাবু খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেয়। বেশ বুঝেছে ওই পরোপকার—নীতি-টিতি সম্বন্ধে এখন আর কথা বলা নিরাপদ নয়। তাই চুপ করেই রইল।

গিন্নীর গজগজানি বেড়ে চলেছে। ওর এই সন্দেহের নিরাকরণের জন্যই বলে ত্রিদিববাবু,

—চিরকালের জন্য ওরা যাবে এইবার, বুঝলে গিন্নী, তারই ব্যবস্থা করছি। বাগান—বাড়ি—জমি—সবই যাবে ওদের।

ত্রিদিব কথাটা শেষ করতে পারে না, তখন মাছের মুড়ো চিবুতে ব্যস্ত। রোজ তার খাবারের সঙ্গে একটা করে রুই মাছের মুড়ো খেতে হয়—ওটা ডাক্তারের ব্যবস্থা। মুড়ো চিবুতে চিবুতে ত্রিদিব ইশারায় জানায়।

—সব বিক্রমপুর হয়ে গেছে বুঝলে? এই শর্মার কাছেই।

—তাই নাকি!

গিন্নী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তার মনে হয় এই পাপী-তাপীদের সবই যাওয়া উচিত, তাদের বিষয়আশয় সবগুলো এসে

জমবে তাদের হাতে। এইটাই তার কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার, আর সেটাই ঘটতে দেখে মনে মনে খুশী হয়েছে মুখুজ্যে গিন্নী। স্ত্রীর এই খুশীতে সেও খুশী হয়। ত্রিদিববাবুর মনটাও অনেক হালকা হয়ে আসে।

বিভূতিবাবুকেই ডেকে পাঠিয়েছিল ত্রিদিববাবু। এখানকারই লোক বিভূতিবাবু। ইস্কুলটা চালু হয়েছে তারপর থেকেই তিনি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার হয়ে আছেন। নানা দলবাজি আর নীতির কচকচানির জন্যই সেবার ত্রিদিববাবু ওকে হেডমাষ্টার করতে পারে নি, বিশেষ করে বিভূতিবাবুর বি-টি ডিপ্লোমা নেই, তাই বাইরে থেকে ছোকরা ওই তরুণকে আনতে হয়েছিল ইস্কুলে এখন বিভূতিবাবু বি-টি পাস করেও সেইখানে রয়ে গেছেন।

তরুণ সম্বন্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই, ভালো ছেলে ও। শিক্ষিত, বিনয়ী নম্র। সে হেডমাষ্টার সত্যি—কিন্তু বিভূতিবাবুর মত না নিয়ে সে কোনো কাজই করে না। শ্রদ্ধা সম্মান করে যথেষ্ট, বিভূতিবাবুর তাই এখানে কাজ করতে কোনো অসুবিধাই বোধ হয় নি। সেই কারণেই তিনি রয়ে গেছেন এখানে। বানের এই সর্বনাশা তাণ্ডবে বিভূতিবাবুর ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে, এখনও জল নামে নি, যে কোনো রকমে ওই ভিটে যাহোক একচালাও তুলবেন সাফ সুতরো করে। বিভূতিবাবুর সংসারের দায়টা যেন বহুগুণ বেড়ে উঠেছে ক'দিনেই। জমির ধান-কাটা সারা গেছে। সমূহ লোকসান হয়ে গেছে। চাকরিই এখন ভরসা। মেয়ে চামেলিও সমর্থ হয়ে উঠেছে। তার বিয়ে-থার কথা ভাবতে হচ্ছে।

সব মিলিয়ে বিভূতিবাবু চাপেই পড়েছেন। ভাবেন অনেককিছু। তবু ভেবেচিন্তেও কোনো সুরাহা কিছু করতে পারেন নি। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে মল্লিনা তবু একটা আশা করে মনে মনে। তরুণ

ছেলে হিসাবে ভালোই, পালটি ঘর। আর দুজনকে মানাবেও চমৎকার তাই মেয়েকেও হয়তো এই মেলামেশায় বাধা দেয় নি।

বিভূতিবাবু তবু দুএকবার বলার চেষ্টা করেছেন—এটা ঠিক হচ্ছে না বড় বৌ। মানে এই মেলামেশায় কে কি ভাববে। অবশ্য চামেলি তোমার তেমন মেয়েই নয়। তবু লোকের কথা থামাবে কি করে বলো ?

মলিনা স্বামীকে নিয়ে মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে। লোকটা নিরীহ ভালো মানুষ। পড়াশোনা নিয়ে থাকে, আর ইস্কুল করেও পুরো মাইনে ঠিক সময়মতো মেলে না বলে টুইশানিও করতে হয়। ওই অকাট ছেলে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তার বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে গেছে। তাই সাংসারিক ব্যাপারগুলো ওর মাথায় ঠিক ঢোকে না। মলিনা স্বামীর কথায় বলে—লোকে যে যা ভাবে ভাবুক। এমন ছেলে সহজে হাতের কাছে পাবে ?

কথাটা নিছক মিথ্যা নয়। মলিনার এই মনোভাবকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না তিনি। মলিনা গলা নামিয়ে বলে,

—দুজনে মানাবে ভালো। মলিনা এসব কথা ভেবেছে। তরুণ চামেলির চোখে মুখেও দেখেছে তরুণের জন্য একটু খুশীর আভাস। মলিনা বলে,

—আজকাল এসব হচ্ছে। কোনোরকমে বিয়ে-থার ব্যাপারটা চুকে যাক তাহলেই নিশ্চিন্ত।

বিভূতিবাবু ওসব ভাবনা এখন আর ভাবতে পারেন না ; ইস্কুলে লোকজন এখনও ভিড় করে আছে। চারিদিকে জমছে এঁটো পাতা. নোংরা ছেঁড়া চট, তালাইএর স্তূপ। পচে গন্ধ উঠেছে। বেঞ্চগুলোও অনেক ভেঙে গেছে। সেগুলো সারাতে হবে।

জল সরছে তবে কোথাও মাটির ঘরবাড়ি কারোও নেই, ওই জলকাদায় মানুষগুলো যাবে কোথায় সেইটাই হয়েছে সমস্যা। সারা গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

বিভূতিবাবুর নিজের অবস্থাও ওদের মতোই শোচনীয়। দু'দশ বিঘে ধান জমি যা ছিল তার ফসলও শেষ হযে গেছে। পাট ছিল অনেক ; কেটে মোড়া বেঁধে সেগুলো ভিজানো ছিল, তবু পাট থেকে নগদ কয়েকশ টাকা পেতেন তিনি, কিন্তু বানের স্রোতে কাটা-গাছগুলো কোথাও উধাও হয়ে গেছে।

ঘরবাড়িরও নেই, এখন মাটির স্তূপে পরিণত হয়েছে, সাবেকী আমলের একখানা পুরানো ইটের ঘর কোনোমতে ওই ধসেপড়া মাটির স্তূপের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাতেও বাস করা এখন দুঃসাধ্য, পলি কাদা জমে আছে কোমরভোর আর তেমনি স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে।

বিভূতিবাবু এই জলকাদা ঠেলে হাঁটুভোর জল পার হয়ে সেই বাড়িটা দেখে এসেছেন।

দেখতে গিযে চমকে উঠেছেন তিনি। এককালে এখানে যে কেউ বাস করতো তার কোনো চিহ্নই মেলে না। সর্বনাশা বন্যা মানুষের সেই প্রীতির সব চিহ্নকে নিঃশেষে মুছে ফেলেছে। জায়গাটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

কলাই-ধান যা ছিল তাও ভেসে গেছে ; গোয়ালবাড়ি—মাটির পৈত্রিক বাড়িটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

তাঁর জীবনে এতদিন ধরে গড়ে তোলা এই স্বপ্ন নিঃশেষ বিকৃতি আর বেদনায় আজ ভরে গেছে। বিভূতিবাবুর মনে হয় আজ তিনি অসহায়—সব শক্তি-সাহস ওই আশ্রয়টুকু ধসে পড়ার থেকেই হারিয়ে গেছে।

মলিনা স্বামীকে জলকাদা ভেঙে ফিরতে দেখে এগিয়ে আসে। বিভূতিবাবুর মুখের সেই হতাশা আর বেদনা তার নজর এড়ায় নি।

ওই জলকাদার মধ্যে বিভূতিবাবু কোথায় গেছে তা জানতো

মলিনা। তাই ওকে ফিরতে দেখে বাড়ির খবরের জন্য মলিনাও উদ্‌গ্রীব হয়ে এসে শুধোয়,

—কী দেখে এলে গো ?

বিভূতিবাবু স্ত্রীর দিকে চাইলেন কোথাও কোনো আশ্বাস নেই। বিভূতিবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে মলিনা ব্যাপারটা অনুমান করে নেয়। তাই সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলে,

—ওসব আবার ঠিক হয়ে যাবে।

—কি করে হবে জানি না ?

বিভূতিবাবু কোনো পথই দেখেন না। ওর কথায় সেই হতাশাই ফুটে ওঠে। মিইয়ে গেছে গলার স্বর।

—হবে না বড় বৌ। সব শেষ হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম অনেক কিছু, কিন্তু সব ভেস্তে গেল।

বিভূতিবাবু যেন হেরে গেছেন বিরাট একটা অদৃশ্যশক্তির সঙ্গে পাঞ্জা কষতে গিয়ে।

—মাস্টার মশাই !

পটল তাঁকে ডাকছে। এখানে ঘরের আব্রু আর নেই। বারান্দার সামনেই ঘরখানা। চামেলি জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। পটলাকে দেখে ওর দিকে চাইল। শীর্ণ পিট্‌কে লোকটা চামেলিকে দেখছে; বিভূতিবাবু ওর দিকে চাইল।

পটল বলে,—পেসিডেন্টবাবু একবার আসতে বললেন আপনাকে।

বিভূতিবাবু ঠিক কারণটা বুঝতে পারেন না। তবু খোদ সেক্রেটারীর ডাক, তাই অমান্য করতে পারেন না।

বলেন,—চলো, যাচ্ছি।

পটলার তবু সর্দারি ভাবটা যায় না। বলে,—আসেন তাহলে।

ত্রিদিববাবু কথাটা ভেবেছে। এই সময় থেকেই তরুণকে সরাবার

প্রস্তুতি করতে হবে। বিভূতিবাবুকে আসতে দেখে ওর দিকে চাইল ত্রিদিববাবু।

—এসো মাষ্টার। ক'দিন দেখা নাই। তা ভালো আছো তো ?

বিভূতিবাবু একটু অবাক হন ত্রিদিববাবু মুখে আজ এইসব কথা শুনে। সেই বিস্ময়ের ভাবটা চেপে রেখেই বিভূতিবাবু জবাব দেন।

—না, না। চলে যাচ্ছে কোনোরকমে। তবে ঘরবাড়ি তো গেল। জমিজারাতও জলের নিচে, কয়েক শো টাকার পাটও ভেসে গেল।

—তাই নাকি। ত্রিদিববাবু মনে মনে খুশী হয়। ওদের বিপদ অভাবঅভিযোগ বাড়ুক, তাতে ত্রিদিববাবুদেরই সুবিধা হবে। ওদের কেনার ব্যাপারে বেশী বেগ পেতে হবে না। ওদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হলে এদেরই সুবিধা। সেই খুশী ভাবটা চেপে ত্রিদিববাবু বলে,—সত্যিই তো ভাবনার কথা হে। এতবড় সব্বোনাশ ঘটে গেল!

বিভূতিবাবু বলেন—কি আর করা যাবে। দেশসুদ্ধ লোকেরই এমনি অবস্থা।

ত্রিদিববাবু বলে,

—তবু চেষ্টা করতে হবে মাষ্টার। তাই বলছিলাম—অনেক দিন তো বি-টি পাস করেছো প্রমোশন নেবে না কেন ? এবার ওটা নাও। সিনিয়ার লোক।

বিভূতিবাবু ওই কথা শুনে চমকে ওঠেন। ত্রিদিববাবু যেন বিশেষ একটা ইঙ্গিত করতে চায়। ওর মুখের এই পরিবর্তন ত্রিদিববাবুর নজর এড়ায় নি। তাই কথা ঘোরাবার জন্যে বলে ত্রিদিববাবু। —অবশ্যি কথাটা ভেবে দেখো মাষ্টার, যা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে—মানুষের বিপদের দিনে সরে থেকো না হে। মাস্টার মানুষ—পাঁচ জন মানে গণে, তাদের কথাও ভাবো।

বিভূতিবাবুর মনে হয় অপরাধটা মিথ্যা নয়। একটা বিপদ আর সবহারানোর দুঃখে বিভূতিবাবু চুপ করে ছিলেন। এখন সেই ঘোরটা কেটে গেছে। তাঁর এগিয়ে আসা দরকার।

তবু বলেন বিভূতিবাবু—তরুণ তো রয়েছে। কাজের ছেলে, ওতো কাজ চালাচ্ছে ভালোই।

হাসে ত্রিদিববাবু, পুটু কেরানীও শুনেছে কথাটা। সে শুধরে দেয়,

—তা সত্যি। তবে কি জানেন মাষ্টার মশাই, ও তো বিদেশী। একজন বিদেশী ছেলে আমাদের দুঃখু কি বুঝবে বলুন? আমরা চুপ করেই থাকবো রিলিফের কাজের ব্যাপারে?

বিভূতি মাষ্টারের মনে লেগেছে কথাগুলো। বলে ওঠেন বিভূতিবাবু,—কি করতে হবে বলুন? তবে জানেন তো শরীরের অবস্থা আমার।

ত্রিদিববাবুও এমনি কথাই শুনতে চাইছিল। বিভূতিবাবুকেই তার দরকার। তরুণের সব কাজে ওকে দিয়েই বাধার সৃষ্টি করানো যাবে। তরুণের প্রাধান্যও কমবে তাতে। আর ওই হেডমাষ্টারীর লোভটা দেখিয়ে হয়তো কাজে লাগানো যাবে বিভূতিমাষ্টারকে এই সময়।

ত্রিদিববাবুর আগেই পুটু বলে,

—বেশতো বসে বসেই কাজ করুন। রিলিফের লোকজনের হিসাব-কাগজ পত্তর রাখুন। খাতা কলমেই কাজ করুন, আমরা তো আছি। দরকার হলে সবরকম সাহায্য আমরা করবো। তাই বলছিলাম রিলিফের কাজে তরুণকে নয়—আপনাকেই থাকতে হবে।

ত্রিদিববাবু বললেন—আমিও তাই চাই মাষ্টার।

ত্রিদিববাবুকে চটাতে সাহস করছেন না বিভূতিবাবু।

তাই বিভূতিবাবু রাজী হয়ে যান।

পটলাও সায় দেয়—তাই ভালো স্যার। প্রবীণ মানী লোক আপনি, তবু আপনি থাকলে ভালোই হবে। কি গা পেসিডেন বাবু?

পটলা রাতারাতি যেন ত্রিদিববাবুর ইয়ার বক্সীতে পরিণত হয়েছে।

মণি দত্ত শহর থেকে মালপত্তর এনেছে নৌকায় করে। সেইই আনে খবরটা। এইবার রাস্তা মেরামত হয়ে যাচ্ছে। ট্রাকবন্দী রিলিফের চাল—ডাল—মালপত্র আসছে। এইবার আর ভাবনা থাকবে না। বানও কমেছে। ডুবো ক্ষেত জেগে ওঠে ঠাঁই ঠাঁই।

ভূষণ শুনছে কথাগুলো। আবার জল সরে যাবে—ধানক্ষেত বাঁশবনগুলো আবার মাথা নাড়বে, পাখিগুলোর কলরবে ভরে উঠবে উঠান, ওই সবুজ ঝোপগুলো। বকুল ফুলের গন্ধে মো মো করবে চারিদিক, এই দিনও ফুরিয়ে যাবে!

তার বুকের সেই ব্যথাটা তবু মিলোবে না। বানের মুখে ভেঙে পড়া ঘরবাড়ি আবার নতুন করে গড়বে ওরা, কিন্তু যাঁরা হারিয়ে গেল তারা আর কোনোদিনই ফিরবে না। তাই এই বান মিলিয়ে যাবার পর আবার নোতুন বসতের স্বপ্ন তার কাছে যন্ত্রণার-আভাসই আনে।

তবু আজকের সব হারানো মানুষগুলোর সামনে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার স্বপ্নটাই বড়। ক্ষুধা—এই বন্দীদশার জাল থেকে ওরা মুক্তি পেয়ে আবার সহজভাবে বাঁচতে চায়, তাই ওই সাহায্যটুকুর প্রয়োজন আজ অনেক।

পটল ভূষণও নিজের মনের অতলের এই চিরকাঙাল মানুষটার অস্তিত্বের খবর জানতো না। সে স্ত্রী—ছেলের চেয়েও নিজেকেই ভালবাসে সবচেয়ে বেশী। ও ব্যাকুলস্বরে শুধোয়,

—রাস্তা তাহলে তৈরি হচ্ছে? লরি ট্রাক আসবে গ এবার?

শশী মোড়ল মাথা নাড়ে।

—তাই শুনছি নৌকা তো এখন চলছে না। দুয়ের বার

হয়ে গেছে। ক'দিন এক নেতাড় বান ছিল, নৌকা চলেছে, এখন এখানে চটান—ওখানে রাস্তায় ট্রাক,—ওখানে ভাঙলা, জল—তাই রাস্তাই মেরামত করছে।

বন্দী অসহায় বুভুক্ষু মানুষগুলো কি দুঃসহ প্রতীক্ষা নিয়ে দিন গুণছে। একটু জল নেই, টিউবওয়েল অধিকাংশই ডুবে গেছে—খাবার নেই, আশ্রয় নেই। আছে মাত্র অনাহার—ব্যাধি দুঃসহ যন্ত্রণা। তারই ব্যাপক তমাসায় মানুষগুলো দিন গুণছে।

পটলা চেয়ে থাকে, ইতিমধ্যে সে পুটু কেরানীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। আজই সকালে পুটুকে সমর্থন করেছে সে ওই বেদান্ত-তীর্থকে টাকা না দিয়ে হাঁকিয়ে দেবার ব্যাপারে। পটলা জানে কোনদিকে যেতে হবে তাকে। টাকার দরকার। তাই এক এক-সময় এক এক রূপ পরিগ্রহ করে সে।

পুটু কেরানীও পটলাকে চেনে। ধূর্ত লোকটা অনেককেই অনেক আশা দেখিয়ে হাত করেছে। তাই কিছু ঝামেলা সামলাবার জন্য ওকে দরকার। বিভূতিবাবু এই ভিড়ে থাকেন না। তবে কাজ দেখবার আশ্বাস তিনি দিয়েছেন। পুটু ত্রিদিববাবু তাতেই খুশী।

পটলা পঞ্চায়েত অফিসে বসে রিলিফের কাগজপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে। রিলিফের জিনিসপত্র আসছে। তার আগেই বিভিন্ন লোকজনের নাম লিখে কাগজ তৈরি করছে। সেই নামে নামে নাকি কাপড় কম্বল গম চাল বিলি করা হবে, আর ভিড় জমেছে তারই জন্যে। পটলা এ খবর জানে, তাই সে এসে সর্দারি করতে শুরু করেছে।

ওরা কলরব করে।

—ওগো বাবু, আমার নামটো লিখেছো ? আমরা চারজন পেরাণী বাবু। নয়নতারা বিপদবারণ আর তিরনাথ দাস। সাকিম খয়রাবেড়া গ' বাবু।

কেউ ভিড় মাড়িয়ে বোর্ড অফিসের দাওয়ায় উঠে সজোরে হাঁক পাড়ে।

—আমার নামগুলো লিখবে বাবু—এ্যাই যে পটলদাদা!

পুট্ কেরানী দেখছে ব্যাপারটা। লোকগুলোর ওই কলরব আর আর্তনাদ, ওই ব্যাকুলতাই তার কাছে বাণিজ্যের সামগ্রী, পটলাও তা জেনেছে। তাই বলে—সব হবে বাবা।

পটলা বের হয়ে আসে ভিড ঠেলে। ইতিমধ্যে তার হাতে এসে পড়েছে কিছু পয়সা, অনেকেই কাদের নামটা আগে আগে লেখাতে চায়। পটলাও ওদের আশ্বাস দেয়—হবে হে! ঠিক হবে।

একটা ইঙ্গিত করে পটলা আর দেখেছে সে ওরা তবু সামান্য কিছু রিলিফ পাবার জন্যই আগে নাম লেখাবে, তার জন্য কিছু প্রণামী ধরে দিতে দ্বিধা করে না। ভিড বেড়ে ওঠে।

ত্রিদিববাবুও এসেছে। পটলা তখন দলবল নিয়ে ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। শশী মোড়লও ব্যাপারটা দেখেছে। অনেকের পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই। ভূষণ বলে,

—আমার নামটাও লিখো গো, আমরা তু'জন।

পটলা ওকে সরিয়ে দিয়ে চীৎকার করে—লাইনে দাঁড়াগে।

ভূষণ ওই অতর্কিত ধাক্কায় ছিটকে পডে। ক'দিন খাওয়াদাওয়া নেই, শরীরটাও খারাপ, তাই ছিটকে পড়ে সে মাথা ধরে।

শশী মোড়ল ব্যাপারটা দেখে এগিযে আসে। পটলা যেন কদিনে মাতব্বর হয়ে উঠেছে। তাকে এখানে ওই সর্দারি করতে দেখে শশী মোড়ল বলে,

—কেন ধাক্কা মারবে ওকে? ও তো কিছু করে নি।

পটলা তখন বেশ মেজাজেই আছে। তার এই মাতব্বরীকে পুট্ কেরানী সমর্থন করে। পটলা গলা তুলে জবাব দেয়,

—বলছি লাইনে দাঁড়া, তা ও লাফ দিয়ে আসবে?

ভূষণ উঠে বসেছে। তার তুচোখে জলের আভাস। খাবার

নেই, আছে ওই অপমান আর আঘাত। চারিদিককার আঘাতে লোকটা মুষড়ে পড়েছে।

কিন্তু ওই শশী মোড়লের দল বিনা প্রতিবাদে এটাকে মেনে নিতে পারে না। তাই ভজহরি রুখে ওঠে,

—পটলা তোর ডাঁট ভেঙে দোব।

—মানে! পটলাও ফড়িংএর মতো লাফিয়ে ওঠে। পরনে ওর সেই কাকতাড়ুয়ার বিবর্ণ মিলিটারী জামা প্যাণ্ট মেডেলও ঝুলছে। দলের লোকজন এগিয়ে আসে।

—হুঁশিয়ার রে ভজা।

ইতিমধ্যে দুটো দলই গড়ে উঠেছে। ওই বঞ্চিত বভুক্ষু মানুষগুলো মনে মনে ফুঁসছিল রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মতোই; এতদিন তারা অনেক কিছু অন্যায় সহ্য করেছে। আজ তারা কঠিন মূর্তিতে রুখে দাঁড়িয়েছে। সবহারানোর শূন্যতার বুকে তাই বোধহয় বিদ্রোহের আগুন সহজে জ্বলে ওঠে।

মেয়েরাও ভয় পেয়ে গেছে। সৌরভী কোত্থেকে এসে জুটেছে। তার খ্যানখ্যানে গলা সপ্তমে তুলে সৌরভী চীৎকার করে,

—মুখপোড়া যমভরার মরণ নাই। সবখানেই সর্দারি আর শয়তানী। ওই যমের অরুচি পটলার কথাই বলছি; আবার রোয়াব দেখ না?

ভজহরিকে শশী ধরে বসেছে। ওদিক থেকে অন্য কারাও দল-বেঁধে হৈ চৈ শুরু করেছে। মেয়েগুলো চীৎকার করে প্রাণপণে। মানুষগুলো যেন ক্ষেপে উঠেছে। ওরা ত্রিদিববাবুকেই ঘিরেছে।

তার কাছে ওরা কি জানতে চায়। কিন্তু সব মানুষগুলো একসঙ্গে কলরব করছে—কে কি বলছে তা এতটুকু বোঝা যায় না।

মণি দত্তের বাঁজা বৌটা দেখেছে কোনো গোলমাল বাধলেই মণে

এক নিমিষের মধ্যে দোকানের দরজা কপাট আগে বন্ধ করে দিয়ে সামলে নিয়ে তবে বের হয়। লোকটা অতিমাত্রায় চতুর আর সাবধানী। তাই গোলমালের মধ্যে না গিয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে ব্যাপারটা দেখে শুনে এগিয়ে যায়।

ত্রিদিববাবুকে ঘিরে ফেলে ওইসব চিৎকার করছে দেখে মণি দত্তের বৌ আহ্লাদী মনে মনে খুশী হয়। ওই টাকমাথা লোকটাকে সে সহ্য করতে পারে না। ওই লোকটাকে দেখে মনে হয় একটা বিরাট বোয়াল মাছ। সবকিছুকেই সে উবু উবু গিলে ফেলে আবার নিপাট নিরীহ সেজে থাকতে চায়। রাতের অন্ধকারের ওর সেই পাশব মূর্তিটাকে ভুলতে পারে না। বাঁজা বৌটার সারা শরীরটাকে যেন ওর কঠিন দুটো হাত দিয়ে পিষে ফেলতে চেয়েছিল। ওর সব লজ্জা, সব সম্ভ্রমটুকু ওই লোকটা কেড়ে নিতে দ্বিধা করে নি।

ত্রিদিববাবু ভিড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে চমকে উঠেছে। আজ এই বুভুক্ষু শীর্ণ লোকগুলোর নোতুন কি এক মূর্তি দেখেছে সে, সেই মূর্তি আরও ভীষণ ভয়াবহ আর নিষ্ঠুর।

এতদিন ওদের দেখেছে ওই শশী মোড়ল, নামোপাড়ার জগদীশ, বাঁধগড়ার ধারের ভূষণ ভজহরি আরও অনেককে। তারা ছিল শান্তশিষ্ট আর অনেক বিনয়ী। দেখা হলে শশী মোড়ল ভজহরির দল গলায় কাপড় দিয়ে হেঁট হয়ে তাকে প্রণাম করতো। গলার স্বর নামিয়ে কথা কইতো।

এই কদিনের প্রচণ্ড সর্বনাশের ধাক্কায় আজ সবকিছু হারিয়ে তারা একেবারে বদলে গেছে। কোটরাগত চোখগুলো জ্বলছে কি দুর্বার হিংসার জ্বালায়। ওদের শূন্যহাত আজ মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কি প্রতিশোধ আর দাবির কাঠিন্য ঘোষণা করে।

ত্রিদিববাবু পুটু কেরানীর দল শিউরে উঠেছে। এর আগে ওরা দেখেছিল ওই জনতাই মারমুখী হয়ে উঠেছিল ধানের দাবিতে, আর

সেই দাবি তারা আদায় করেছিল। আজও অন্যায়ের প্রতিবাদে তারা মুখর।

ভিড়ের মধ্যে পটলা নেই। সেও ফাঁক বুঝে শিয়ালের মতো কেটে পড়েছে, গোলমাল দেখে তরুণই এগিয়ে আসে। ওরা তখন চীৎকার করছে।

বিভূতিমাষ্টারও এসেছেন, কিন্তু ওই গোলমালে তার কোনো কথাই শোনা যায় না। তার থামাবার সব চেষ্টা আর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ওদের চীৎকারে ডুবে গেছে।

বিভূতিবাবুও তরুণকে দেখে একট ভরসা পান।

সৌরভীও চীৎকার করে—মেরে ফেলাবেক নাকি লোকটাকে? হেই মা গ'

তরুণ এগিয়ে যায়, গলা তুলে চীৎকার করছে সে।

—কি হচ্ছে তোমাদের? অ মোড়লমশাই, ভজহরি! কোথায় কি তার ঠিক নেই এখন থেকেই যুদ্ধ বাধাবে তোমরা?

ত্রিদিববাবু পুটু কেরানী তরুণকে দেখে একটু ভরসা পায়। শশী মোড়ল আর অনেকে চীৎকার করে তরুণকে কি জানাতে চায় একসঙ্গে।

তরুণ এগিয়ে যায়, ওদের তেজ দর্প একটু কমেছে—এবার অনুযোগ আর অভিযোগের পালা শুরু হয়েছে।

মন্দির-চাতালের পিছনে কয়েকটা গাছ জড়াজড়ি করে ঠাঁইটাকে আঁধারে ঢেকে রেখেছে।

ওখানে জমেছে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার। লোকজন নেই। দীঘির জল তখনও ফুলে রয়েছে—স্রোত বইছে। পাড়গুলো মড়ার মতো ঠেলে ভেসে উঠেছে ঠাঁই ঠাঁই।

পটলা এই গোলমালেও বেশ কিছু রোজকার করেছে। রিলিফের

কার্ড করানোর ব্যাপারটা বেশ কঠিনই। তাই পটলাকেই ওরা মাথাপিছু একটাকা হিসেবে দিয়েছে অনেকে।

ওদের গোলমাল থেকে পটলা তাই সরে এসেছিল কারণ ঝগড়ার মুখে এসব কথা কেউ ফাঁস করে দেবে।

পটল গোলমাল থামার পর একটু স্বস্তি বোধ করে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এখানে।

এমন সময় শব্দটা ওঠে। স্তব্ধ গ্রামের জল জমা পথে গাছ-গাছালিতে পাখিগুলোও চমকে উঠেছে। দুচারটে পাখি চীৎকার করে উড়ে যায়, তারাও ক্ষুধার্ত, ওরা কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরে ফেলেছে খাবার আসছে।

মানুষগুলোও সেই খবর পেয়েছে। ছেলোগুলো খিদে ভুলে কান্না থামিয়ে দৌড় দিয়েছে জলকাদার বুক দিয়ে। বাতাসে ওঠে ভট্ ভট্ শব্দ।

নদী বয়ে এসেছে একটা লঞ্চ ওর সঙ্গে দুপাশে দুটো মাঝারি ধরনের বোট বাঁধা তেরপল জড়ানো ওর মাথায়। পটলা জানায়,

—রিলিফের মালপত্র এসেছে অ পুটুবাবু! প্রেসিডেন্ট মশাই গ!

পটলার ওই হাঁকটা চকিতের মধ্যে যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। লোকজনের জটলা থেমে যায়।

ইস্কুলবাড়ির ভেতরে মেয়েগুলোর খেউরএর আসরও ভেঙে গেল তখুনিই। ওরা নেমে আসে।

পুটু কেরানী এরই জন্য এতদিন যেন ওত্ পেতে বসেছিল। এর আগে টেস্ট রিলিফের কাজ অনেক করিয়েছে সে। কি করে কম কাজ করিয়ে পুরো টাকা আর গম আদায় করতে হয় কাগজপত্র ঠিক সাজিয়ে তা ভালো ভাবেই জানে সে।

এবার মালপত্র আসবে হাজার হাজার টাকার। চাল গম তো আছেই। পুটু টেস্ট রিলিফে জমি কিনেছে পুকুর কিনেছে এবার কি হয় দেখা যাক।

পটলাই খবরটা জানায়,

—মালপত্র ঘাটে এসে গেছে গো কেরানীবাবু!

পুটু হাসছে। শিকারী বিড়াল সে তাই গোঁফ দেখলেই চেনে। পুটু বলে গলা নামিয়ে—এত তড়বড় করিস না পটলা। পিছনে কেউ কেউ আছে কিন্তু।

পটলা যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না এমনি ভাব দেখায়। পুটু ওর এই না বোঝার ভানটা দেখে আরও বেশী ভাবিত হয় কারণ ও তার চেয়ে শয়তান যে কম নয় সেইটাই মনে হয়।

পুটু বলে—প্রেসিডেন্টকে খপর দে। আর হ্যাঁ ওপাশের দুতিন-খানা ঘর খালি করে রাখ। চাবি নিয়ে যা। আর লোকজনদের ঘাটে যেতে বল।

পটলা ওর দিকে চেয়ে থাকে, জানায় সে—অনেক মাল কিন্তু।

পুটু কেরানী জানে ওদেরই রিলিফের দরকার বেশী, কিন্তু সেই মালপত্র কেউই ঘাড়ে করে আনবে না। তোমরা বয়ে এনে ওদের মুখের কাছে তুলে দাও ওরা কষ্ট করে গ্রহণ করে তোমায় কৃতার্থ করবে মাত্র।

তবু তার স্বার্থ রয়েছে। কুলিখর্চাও মঞ্জুর হবে—গুদাম খর্চাও আসছে। আর সেটার থেকেও কিছু বখরা বসাবে সে। তাই পুটু বলে—যারা বইবে মজুরী পাবে।

পটলা খুশী হয়—তাই বলেন।

এবার অভয় দেয় সে—লোকজন সব নিয়ে যাচ্ছি, চলেন আপনি। কি ভেবে পটলা বলে।

—তরুণ মাস্টারকে ডাকবে নাকি? বিভূতি মাস্টারকে?

পুটু ওর দিকে চাইল। পটলারও ওকে ডাকতে খুব ইচ্ছে নেই। তবু মতামতের জন্য কথাটা বলেছিল মাত্র।

পটলা পুটু কেরানীর অপ্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ও বুঝেছে কেরানীর মনের ভাবটা। তাই ব্যাখ্যা করার ভঙ্গীতে বলে পটলা,

—বিভূতি মাস্টার নাকি রিলিফের কত্তা ?

পুটু কেরানী ধমকে ওঠে—থাম দিকি ! যা করতে বল্লাম কর গিয়ে।

পটলা সেই আদেশগুলো পালন করার জন্য বশংবদ ভৃত্যের মতো দৌড়ল। পুটু ফতুয়ার উপর হাফ হাতা পাঞ্জাবি চাপিয়ে ছাতাটা নিয়ে বের হবার আয়োজন করে।

ওর ঘরের দেওয়ালে মা কালী-দুর্গা-শিব অনেক প্রভুর ছবিই টাঙানো আছে। পুরোনো ছবিগুলোয় রোজ সন্ধ্যা সকালে ধূপধুনো দেয়, দুএক ছিটে গঙ্গাজল ছিটিয়েও দেয়। ছবিগুলো তাতেই কেমন পুরোনো পুরোনো হয়ে গেছে।

পুটু কেরানীর ওদের উপর ভক্তি অপরিসীম। ওদের দয়াতেই পুটু কানাকড়িতেই বাজীমাৎ করেছে। আজও শুভযাত্রার আগে পুটু দুহাত কপালে তুলে ভক্তিভরে প্রণাম করছে—যেন মনোবাসনা পূর্ণ হয় মা ! মাগো !

—কেরানীবাবু ! অ কেরানীবাবু !

তীক্ষ্ণ সতেজ কণ্ঠস্বর, বন্ধঘরের দরজা থেকে খনখনিয়ে ওঠে। পুটু কেরানীর সব ভক্তি আর একাগ্রতা খান খান হয়ে যায় ওই ডাক শুনে। পুটু চোখ মেলতেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সৌরভী। আর লোক পেল না—যাত্রার আগেই ওই খান্‌কী মেয়েটাকে দেখে ফোঁস্ করে ওঠে পুটু—মলো ! গলা কাড়ছিস্ কেন ? এ্যাঁ।

সৌরভী হাসে—বাব্বাঃ এত ভক্তি কিসের গ ? বলে না—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ !

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি। তাই পুটু বোমফাটার মতো গম্‌গমিয়ে ওঠে—এ্যাই ! মাগী ! কথার ছিরি দেখনা ! যা-যা এখান থেকে।

সৌরভী যায় না। ওসব কথা শোনা তার অভ্যেস আছে। আবার রাত বিরেতে ওই পুরুষ সিংহই তার দরজায় গিয়ে কতো কাকুতি মিনতি করে—দরজাটা খোল সুরো !

গলায় যেন মধু ঝরছে পাপগুলোর। সৌরভী ওদেরও তাড়িয়ে দিতে চায়। তবু ওরা যাবে না। কুকুরের মতো কেঁই কেঁই করে।

রুদ্ধ দরজার ওপাশ থেকে সৌরভী কতোদিন বলেছে,

—লোক আছে গ! তোমার নামটা বলবো তাকে?

—এ্যাঁ! যাই! যাচ্ছি! চলে যাচ্ছি।

ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে এসেছে ওই ভক্তিপরায়ণ পুরুষসিংহ। আর দরজার ওপাশে সৌরভী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়েছে।

সৌরভী ওদের চেনে। তাই ওসব কথা কানে তোলে না আজ। জানায় সৌরভী,

—সদর থেকে ডাক্তারবাবুরা এসেছেন গ! ওদের থাকা-টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। নিচে রয়েছেন অপিস ঘরে।

ডাক্তার!…ওতে কি হবে পুটুর? ওরা শুধু ঝামেলাই বাড়াবে। আমদানি হবে না তাতে পুটুর কানাকড়ি। শুধু উৎপাতমাত্র। তাই পুটু বলে—বিভূতি মাষ্টারকে বলগে। আমি কাজে বেরুচ্ছি। বিভূতিবাবু, তরুণ মাষ্টার এরাই তো লীডার বাবু; ওদের কাছে যা। আমি বাবু তুচ্ছ মানুষ এসবের কি জানি?

সৌরভী হাসছে। পুটুর কথায় কেমন অভিমানের সুর ওঠে। আর পুটু সেই সুরটাকে বেশ নিখুঁতভাবেই তুলেছে, যাতে সৌরভীর মতো ধড়িবাজ মেয়েও বিশ্বাস করে রিলিফের ব্যাপারে পুটুর কোনো হাত নেই। এমনি ফাঁকে থাকাটাই প্রচার করতে হবে—আর তাতে পুটু নিরাপদে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে কাজ হাসিল করতে পারবে।

সৌরভী বের হয়ে যেতেই পুটুও দরজায় তালাচাবি দিয়ে বের হয়ে এল।

নদীর ঘাটে গিয়ে মালপত্র সব খালাস করতে হবে, গুদামজাত করে খাতাপত্র সারতে হবে।

কি ভেবে মণি দত্তের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। সিগ্রেট চাই দুএক প্যাকেট। পুটু সিগ্রেট খায় পেলে আর পার্বণে। অবশ্য পরের পয়সায়। তবু রিলিফের বাবুদের খাতির করতে হবে—ওর তাই সিগ্রেটএর দরকার। ব্যাপারটা কানে জল দেবার মতো, কানের জল বের করতে গেলে ওটা দিতেই হয় কমবেশী।

দোকানে ভিড় তত নেই। আদুরীকে দেখে পুটু দাঁড়ল। মণি দত্ত ওপাশে জাবেদা খাতায় হিসেব নিকাশ করছে। পুটু দাঁড়াল। পুটু বৌটাকে দেখে খুশীই হয়।

ওর নধর গোলগাল চেহারাটার দিকে ওর নজর।

—কি দোবো গ !

আদুরীর লজ্জা লজ্জা ভাবটা মন থেকে মুছে যাচ্ছে ক'দিনেই। মেয়েটাও মাথা তুলছে। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ দুটোয় দোলা লাগে—পুকুষ্ট হাত দুটো নড়ে ওঠে।

পুটু বলে—দুপ্যাকেট কাঁচি সিগ্রেট দে দিকি !

আদুরী স্পষ্টস্বরে বলে—টাকা দাও! দামটা। তা সিগ্রেট কেনে গ ?

পুটুকে সিগ্রেট কিনতে দেখে মেয়েটাও অবাক হয়েছে। পুটু অবশ্য দামএর কথা শুনে খুশী হয় না। পয়সা বের করতে তার কষ্ট হয়। তবু বলে—কেনে সিগ্রেট খেতে নাই আমায় ?

মণি দত্ত দেখছিল বৌটাকে। মেয়েটার ইদানীং বেশ বোল ফুটেছে। অবশ্য পুটু কেরানীকে তার দরকার। তাই ওই আসনাইটুকু করতে দেয় বৌটাকে। আপত্তি করে না। বরং মনে মনে খুশী হয় সে। মণি দত্ত তবু বলে,

—বাবু কি চাইছে রে ? সিগ্রেট ! দে ! দামফাম পরে হবে গ' নিয়ে যান।

পুটু হাসল। কি ভেবে পুটু ইশারায় ডাকল মণিকে।

যেমন করে মনিব কুকুরকে ডাকে ঠিক সেই ভাবেই ডাকছে পুটু।

আর মণেও খাতা ফেলে উঠে বের হয়ে গেল। আহুরী দেখছে ব্যাপারটাকে।

পুটু ফিসফিসিয়ে কি বলছে ওকে। কথাটা ঠিক শুনতে পায় না আহুরী তবু মনে হয় কোনো গোপন কথাই। কে জানে তার জের টানতে হবে তাকেও। গা ঘিন্‌ঘিন্ করে আহুরীর। দোকানের নুন তেল-চাল ডালের মতোই তাকেও যেন পণ্য করে তুলেছে ওই অপদার্থ লোকটা।

পুটু চলে গেল। মণি দত্ত মনে মনে খুশী হয়েছে।

তার সামনে আজ বেশ লাভেরই ব্যাপার এসেছে। চাল-গম-ডাল আসছে। মায় তুলোর কম্বল অবধি। রিলিফের মাল কিছু সরে যাবে আর সেগুলোকে সামলে দিতে হবে তাকে।

বখরা সেও পাবে। বিনা মূলধনে মোটামুটি কিছু মুনাফা হাতে আসবে।

—কি বলে গেল কেরানীবাবু?

আহুরী ওকে শুধাচ্ছে। মণি ফিরে এসে আবার খাতা খুলে জমাবন্দীগুলো দেখতে থাকে। আহুরীর কথায় জবাব দেবারও প্রয়োজন বোধ করে না। মেয়েটা আবার শুধোয় কথাটা।

—কি বলে গেল এ্যাঁ, খুব যে খুশী খুশী ভাব।

মণি দত্ত সব কিছুই গোপন রাখতে চায়, এটা তার কারবারের মূলমন্ত্র। কারণ তার কারবারে এসব অনেকই গলদ থাকে। তাই বৌটার কথায় ফোঁস করে ওঠে।

—থাম দিকি! তোর এসব কথা শুনে কি হবে?

আহুরী ওর দিকে চাইল। একটু ঝাঁলালো স্বরে বলে,

—কোথাও যেতে হবে না তো? দেখো বাপু!

হাসছে মেয়েটা, হাসি নয়—জ্বালাই ফুটে ওঠে ওই হাসিতে। ও যেন নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করছে তাকে। মণি দত্ত রাগতে গিয়েও পারল না। কারবারী মানুষের রাগতে নেই।

বিনয় তাদের লক্ষ্মীর সমান। চড় খেয়ে যেন গালে হাত বোলাচ্ছে ধূর্ত ওই লোকটা। এই আহ্লরীকে চেনে না, ক'দিনেই মেয়েটা বদলে গেছে।

—বিড়ি দাও দিন! একবাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাই।

পটলা এসেছে। এদিককার কাজ গুছিয়ে তার দলবল আর বশংবদ লোকদের নিয়ে নৌকা খালাস করতে চলেছে সে। আহ্লরীকে দেখে বিড়ির খেয়াল হয়—এই যে দাম।

বিড়ির বাণ্ডিলটা ওর হাতে তুলে দিতে গিয়ে হাতটা ঠেকে যায় পটলার হাতে, একটি মুহূর্ত! পটলা ওর হাতটায় ইচ্ছে করেই একটু চাপ দেয়। আহ্লরী কথা বলে না। ওর হুচোখের তারায় একটু শিহর জাগে। পটলা দেশলাইটা হাতে নিয়ে বলে,

—জ্বলবে তো গ! না মিয়োন দেশলাই দিয়েছো?

মণি দত্ত ওর দিকে চাইল। লোকটাকে সে দেখতে পারে না। আহ্লরীই বলে—জ্বালতে জানলে পাথরেও আগুন জ্বলে, ওতো দেশলাই।

পটলা কথা বলে না, আহ্লরীর গতরের বাহার আর চোখের তারার ঝিলিক দেখে সে খুশী হয়েছে। সওদার উপর ফাউও মিলেছে সেই খবরটাই জানিয়ে গেল হাসিতে।

মণি দত্ত ফোঁস করে ওঠে—দোকানে তুই বসিস না।

আহ্লরী হাসে, গাগতর ঢেউ তুলে বলে—কেনে গ! একটু আগেই বিন পয়সার গাহাককেও বল্লে লক্ষ্মী, ইতো নগদ পয়সার গাহাক! হাসলম বা।

—থামবি! মণে দত্ত গর্জন করে।

আর বুড়িও ঠিক সময়েই এসে পড়েছে। মেজাজ তার ভালো নেই। একটু আগেই ওই বৌকে নিয়েই আজে বাজে কথা শুনতে হয়েছে। নিজের চোখেও দেখেছে ওই ফষ্টিনষ্টি। তাই বুড়ি গর্জে ওঠে,

—বৌটাকে সামলা মণে। কুলমজানি বৌ তোর সব্বোনাশ করবে একদিন।

বৌটা চুপ করে যায়। মণি দত্ত তখনও গর্জাচ্ছে।

—তাই দেখছি। দোব একদিন টুটিতে পা দিয়ে ন্যাতার মেরে। নষ্টামিপনা ঘুচিয়ে দোব।

আহুরীর নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। রাগলে গোলগাল মাংসল চেহারা হুলো বেড়ালের মতো ফুলে ওঠে। নিজেরই ঘেন্না করে।

স্বামী! তার আবার দাপট!

সেই রাতের কথা মনে পড়ে। সর্বাঙ্গে যেন কাদা ওর থিকথিক করছে। এই মানুষের লোভ তার সব ধারণাকে বদলে দিয়েছে।

চাপা রাগে ফুলছে মেয়েটা।

বুড়ি আর মাতৃভক্ত সন্তান তখনও সতীত্ব নিয়ে লেকচার দিয়ে চলেছে।

বিজয়া কথাটা ভেবেছে গভীর ভাবে।

এতদিন সে ভেবেছিল ফটিকের চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা কিছু হবে। কিন্তু বৃদ্ধ বেদান্ততীর্থ আজ মানুষের সমাজের বাতিল একটি প্রাণী। তাই তার সাধ্য সীমিত আর সেই জন্যই বিমল ডাক্তারের হু চারটে ট্যাবলেট ছাড়া তার ছেলের ওষুধ আর কিছুই মেলে নি। আর পথ্যও দিতে পারে নি।

বিজয়ার মায়ের অন্তর ওই জন্যই আজ ক্ষুব্ধ, সে নিজেই এবার চেষ্টা করে দেখবে যাতে ছেলেটার চিকিৎসা হয়। নিজের উপর এতদিন সে এই বিশ্বাস আনতে পারে নি; বিজয়ার বাবা কাশীতেই ছিলেন দীর্ঘকাল। এঁদো গলির একতলায় স্যাঁতসেতে একটা কুঠুরি, তাতেই দুটো দড়ির চারপাই, এই ছিল তাদের সংসার। পাথরের দেওয়াল তাতে চুনবালি তৈরীর দিন থেকেই পড়ে নি। অন্ধকার

ভিজে ভিজে ভাব আর ঠাণ্ডা তার জন্মসাথী। তেমনি একটা ঘরে বিজয়ার বাবা বাসা নিয়েছিল। টুলো পণ্ডিত—দেশ থেকে ভেসে ভেসে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

গঙ্গার ঘাটের ধারে বসে বৈকালে রামায়ণ পাঠ না হয় কথকতা করতেন। বিজয়ার বাবার সম্বন্ধে স্মৃতি ছিল এইটুকুই। গায়ের রং টকটকে ফর্সা।

সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক ওখানে ভিড় জমায়। তার মধ্যে বাঙালীকে চিনতে দেরি হয় না অনিমেষের।

বিজয়া ওকে ওর দিকে স্থির সন্ধানী দৃষ্টিতে চাইতে দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু ওই চাহনিটুকুই তার মনে অজানা সুর তুলেছে। বিজয়ার দুচোখের পাতা কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি সে নামিয়ে নিল।

—কিছু বলবে? অনিমেষ ওকে প্রশ্ন করে।

বিজয়ার সারা মনে বাঁধ ভাঙা জোয়ারের ঢল নেমেছে। বলার তার কি আছে জানে না, তবু মনে হয় অনেক কথাই বলতে চায় সে, কিন্তু পারে না।

তাই চুপ করেই থাকে। অনিমেষ জানায়।

—গোধূলিয়ার ওদিকে থাকো তোমরা? পঞ্চানন তর্কতীর্থের মেয়ে না?

বিজয়া চমকে ওঠে। ওর বাবাকেও চেনে সে।

বিজয়া যেন কি একটা অন্যায় করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। তাই দাঁড়ালো না। ঘাড় নেড়ে কোনোরকমে জবাব দিয়ে সরে গেল সে। অনিমেষ তখনও দাঁড়িয়ে, তাকে দেখছে।

বিজয়ার বুক চিরে আজও একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে।

তার হারানো জীবনের সেই দিনগুলোয় অভাব ছিল, কিন্তু এমনি

হতাশার বেদনার আঁধার ছিল না। আশায় বুকভরা আনন্দে তার কুমারী মন কলকলিয়ে উঠতো।

বিজয়া বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কোথায় মিলিয়ে গেছে কাশীর সেই দিনগুলো, চোখের সামনে গঙ্গার জলধারা ছায়াসবুজ ওপারের তটরেখা, মন্দিরএর চূড়াগুলো আকাশ ভরা সামস্তোস্ত্র আর বন্দনার সুর আজ নেই। চারিদিকে পলিমাখা মৃত ধানক্ষেত ধ্বংস-প্রায় বাড়িগুলোর স্তূপ আর বিকৃতির রাজ্য। তার জীবনের মতোই চারিদিকে আজ বেদনার বিবর্ণ বিকৃতি আর নিঃস্বতার প্রকাশ।

—মা।

ফটিক অস্ফুট কণ্ঠে কি বলবার চেষ্টা করছে। বিজয়া তার অতীতের স্বপ্নজগৎ থেকে কঠিন বাস্তব এই পরিবেশে ফিরে আসে।

সেদিন যে মেয়েটি নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল আর সেইজন্য এগিয়ে গিয়েছিল অনিমেষের দিকে, সেই নারী আজ নিজের সন্তানের জন্যই সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করবে। আজ সব ব্যবস্থাই বিজয়া করবার চেষ্টা করবে। ঘরের কোণে বসে থেকে এতদিন অনেক হারিয়েছে সে। আর তার জন্য ওই বৃদ্ধ বেদান্ততীর্থের মুখ চেয়েই সেইসব ক্ষতিকে মেনে নিয়েছিল বিজয়া।

বার বার সেই কথাগুলোই আজ মনে পড়ে এমনি স্তব্ধ অলস মধ্যাহ্নে।

ম্যাট্রিক পাস করে নিজের চেষ্টাতেই কলেজে ভর্তি হয়েছিল বিজয়া। তার মনের কোণে পড়ার উৎসাহটা মাথা তুলেছিল ওই অনিমেষের কথাতেই। হয়তো এই পড়ার মাধ্যমেই বিজয়া তার আরও কাছে আসবে।

এই লোভী নারীমন ধীরে ধীরে বিজয়াকে কোথায় চরম স্বার্থপর করে তুলেছিল, হয়তো সাহসীও করেছিল বিজয়াকে।

ওকে পড়াতে মায়ের শেষ সম্বল দুচারখানা গহনাতেই টান পড়েছিল। বিজয়ার মা তার স্বামীকেও এসব কথা জানাতে চায় নি।

ভেবেছিল মেয়ের বিয়ে দিতে এগুলো লাগবে, কিন্তু বিজয়াই বলে,

—ওসব কথা তুমি ভেবো না মা, পড়াশোনা করে একটা কাজকম্মো জুটিয়ে নেব। গয়না পরলেই কি পেট ভরবে?

মেয়ের এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে মা মনে মনে খুশী হয়েছিল। কথাটা সত্যিই। মেয়ের উপরই ভরসা করেছিল সে।

বিজয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

—তুমি এখানে? বিজয়া কলেজ থেকে বের হয়ে আসছে। বৈকালের সোনা হলুদ রোদ লেগেছে ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসের গাছ গাছালির মাথায়। সবুজ ঘাসের গালচের উপর রঙিন প্রজাপতিরা মেলা বসিয়েছে। মুঠো মুঠো রং ছড়ানো মাটি—রংএ রাঙানো আকাশ।

বিজয়ার গালে তার অজানতে লেগেছে সেই রংএর ঘোর। বিজয়ার হাতে বইখাতা দেখে অনিমেষ বলে,

—এখানেই পড়ছো?

মাথা নাড়লো বিজয়া। দুজনেই একদিকে থাকে। বেশ খানিকটা পথ। বিজয়া টের পায় না সেই পথটা কোনদিকে পার হয়ে গেল। দুজনের কথা বলার সেই শুরু।

জীবনের বহু বাধা বহু বেদনা পার হয়ে সেই পথচলা আজও বিজয়ার শেষ হয় নি, পথের বাঁকে অনিমেষ কোথায় হারিয়ে গেছে। এমনি করে সবাই হারায়। পথ তবু ফুরায় না—সে শুধু ডাকে সব হারানোর সুরে।

তাই বিজয়ার জীবনেও এই পথ অনেক আলো অনেক আঁধার পার হয়ে চলেছে।

অনিমেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এম-এ পাস করেছিল, বিজয়াই সবথেকে

খুশি হয়। সেদিন দুজনে ওরা নৌকায় করে ঘুরেছিল গঙ্গার বুকে।

অনিমেষ বলে—এমনি করে ভেসে যেতে মনে চায়। কেউ জানবে না, হারিয়ে যাবো।

বিজয়ার মুখে তৃপ্তির আভাস। মনে হয় জীবনটাই এমনি সুরে ভরা, নদীর বুকে ভেসে যাবার স্বপ্ন তাকে আনমনা করে তোলে। সন্ধ্যা নামছে।

পাখিগুলো কলরব করে ফিরছে। অন্ধকার আকাশে মাথার কাছে মন্দির শীর্ষে শঙ্খ ঘণ্টার সুর ওঠে।

হঠাৎ মনে পড়ে অনিমেষের বাড়ির কথা।

বাবাকে সংবাদটা জানানো হয় নি। আজ তারই বিচিত্র বোধ হয়। জীবনের সব আনন্দ আর কৃতিত্বের সংবাদ যেন বিজয়াকেই জানানো দরকার সকলের আগে। সেইই তার মনের অনেকখানি জুড়ে বসেছে। সেখানে বাবাও অনেক পিছনের সারির লোক। বিজয়াও সেটা জেনেছে। মনে হয় তার পক্ষে একটা প্রথম জয়। এমনি করেই সর্বহারা রিক্ত মেয়েটি তার সবকিছুকে নিজের অধিকারে আনবে।

বিজয়া তাই এনেছিল।

সুরেলা গলায় গঙ্গার ধারের চাতালে বসে নান্দীপাঠ করতেন বিজয়ার বাবা। বিজয়া তখন অনেক ছোট। নিচুর ক্লাসে পড়ে। ওর মা বলতো মেয়ে আমার লক্ষ্মী।

বিজয়ার কিন্তু ক্রমশ এগুলো ভালো লাগতো না, স্কুলের মধ্যে পড়াশোনায় সে ভালো। মাস্টার মশাইরা, মেয়েরা অনেকেই চেনে, ভালবাসে তাকে। কিন্তু মেয়েরাও বাড়ির গল্প করে। তাদের অনেকেরই বাবা ভালো চাকরি করেন, অনেকের কাজ কারবার আছে। তাদের পরিচয় দেবার মতো অনেক কিছু আছে, দেয়ও। তাদের পোশাকপত্তরও অনেক দামী আর ঝকঝকে।

বিজয়া এই প্রথম বুঝতে পারে একটা কঠিন পার্থক্যের পাঁচীল রয়ে গেছে সর্বত্রই, তার জীবনেও। সে ওদের তুলনায় অনেক গরীব, অনেক শূন্য। তার বাবার পরিচয় দেবার মতো কিছুই নেই। ঘাটুরে বামুন। এমন অনেক বামুনকে দেখেছে বিজয়া দশাশ্বমেধ মণিকর্ণিকার ঘাটে ঘাটে হাত পাততে।

বিজয়ার নিজের সম্বন্ধেও ধারণাটা কেমন বদলে যায়। মনে হয় সে অনেক ছোট ওদের সকলের তুলনায়।

সন্ধ্যা নামে গঙ্গার ঘাটে, এখানে ওখানে সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে, গঙ্গার বুকে তুএকটা নৌকায় মিটিমিটি আলো কাঁপে। জলে সেই প্রকম্প আলোর রেখা দীঘল হয়ে উঠেছে। বিজয়ার মনে হয় সব থেকেও সে এমনি নিঃস্ব আর একা।

এই নিঃস্ব নিঃশব্দ মন ধীরে ধীরে বিজয়ার মনে নতুন একটি বেদনাকে এনে দেয়। সে সব পেতে চায়—ওদের সকলের মতোই সে আরও অনেক কিছু পেযে বাঁচবে এমনি শূন্য নিঃস্ব থাকতে সে চায় না।

বিজয়া পড়াশোনায় বরাবরই ভালো, বিজয়ার মা-ই ওই সামান্য রোজগার থেকে মেয়েকে পড়াবার চেষ্টা করেছে। নিজেও পালপার্বণে নেয় কোনো চেনা বাড়িতে তুদশদিন রাঁধুনীর কাজ, এমনিকরে সেও মেয়েকে মানুষ করে তুলতে চায়।

বিজয়া জানে বাবা মায়ের এই কৃচ্ছ্রসাধন কিন্তু এ নিয়ে কোনো কথা বলে নি। সে তখন থেকেই বুঝেছিল তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। যে ভাবে হোক স্কুল ফাইন্যাল পাস করতে হবে কৃতিত্বের সঙ্গে।

এমনি সময় বিজয়া প্রথম দেখে অনিমেষকে, সুন্দর একটি তরুণ। এর আগেও বিজয়া ওই তরুণটিকে দেখেছে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সেরে সে উঠে আসে। সুন্দর চেহারা গায়ে যজ্ঞোপবীত। তবে টুলো বামুনের মতো প্রচলিত সংস্কারগুলোর দিকে একবারে নজর

নেই। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য। ওকে প্রথম দেখে চমকে ওঠে বিজয়া। স্কুল যাবার সময় দেখেছে ওকে।

এই মহল্লাতেই থাকে, বিজয়া জানে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ছাত্র। অনিমেষ সম্বন্ধে এর মধ্যে দুচারটে খবরও নিয়েছে। আর এই খবর নেবার মূলে ছিল কৌতূহল, হয়তো আরও কিছু, কিন্তু সেটা কি তা জানে না।

স্নান সেরে উঠে আসছে অনিমেষ সামনে বিজয়াকে দেখে একবার চাইল। কাশীর গঙ্গার ঘাটে দাঁড়ালে ভারতবর্ষের অনেক কিছুই দেখা যায়।

দিল্লীতে অধ্যাপনার চাকরি পেয়েই খবরটা ওকেই জানাতে আসে অনিমেষ। বিজয়াদের সেই ছোট্ট একতলার ঘরখানা তার চেনা। সামনের একফালি বারান্দায় দুপুরবেলায় এক চিল্‌তে রোদ চোরের মতো এসে সাবধানে দখল জারি করে। বিজয়ার মা বড়ি দিচ্ছিল। বাবা ঘরের মধ্যে বসে কবচ তৈরি করছিল। ও জানে অনিমেষকে। বিজয়ার এই মেলামেশাকে সে বাধা দেয় নি। পালটি ঘর।

মায়ের মনের কোণে লোভ একেবারে ছিল না তা নয়। তবু মেয়ের ভালোই হবে এতে।

বিজয়া অনিমেষের কথায় বলে, ভালোই তো। ও চাকরি নেবে বই কি।

—দূরে দিল্লীতে। অনিমেষ ইতস্তত করে। বিজয়া ওর দিকে চেয়ে থাকে। অনিমেষ ভাবছে বিজয়ার কাছ থেকে সরে যেতে হবে।

কিন্তু বিজয়াই বলে,

—কি এমন দূর?

অনিমেষ কথাটা জানাতে পারে না তবু ওর চোখে মুখের না-বলা সেই কথার ভাব বুঝেছে বিজয়া। তার উপর এতখানি বিশ্বাস করেছে এটা যে কোনো মেয়ের কাছেই আনন্দের আর গর্বের।

সেদিন কথাটা অনিমেষই জানিয়েছিল তাকে

রাত নেমেছে।

গঙ্গার ঘাটের লোকজনদের ভিড় কমে আসছে। ভাগবত পাঠের সুর স্তব্ধ হয়ে গেছে। নদীর বুকে দু একটা নৌকা দাঁড় টেনে টেনে অসীর দিকে হারিয়ে গেল। তারাগুলোর ম্লান আভা দুলছে গঙ্গার জলের বুকে—কি তৃপ্তির কোমল আর উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে।

বিজয়াও সারা মন দিয়ে এই সান্নিধ্যটুকু চিরন্তন করে তুলতে চেয়েছিল। অনিমেষকে আজ নিঃশেষে জয় করেছে সে।

তবু জানে ওর বাবার অমত রয়ে গেছে। বেদান্ততীর্থকে দেখেছে বিজয়া। কঠিন একটি পুরুষ। গোধূলিয়ার ওদিকের স্কুলের শিক্ষক পণ্ডিতব্যক্তি। তাই কাশীর অনেক তর্কসভায় তাঁর ডাক আসে। পণ্ডিত বলেই তিনি বিজয়ার বাবা ওই ঘাটের পাঠকঠাকুরকে বোধহয় হীন চোখে দেখেন। আর সেই কারণেই তিনিও খুশী হন নি বিজযার সঙ্গে অনিমেষের মেলামেশায়। বিজয়াকেও দেখেছেন তিনি আর দেখে যে খুশী হন নি এটাও টের পেয়েছিল বিজয়া বেদান্ত-তীর্থের মুখ চোখ দেখে।

বিজয়ার মনেও তাই বোধহয় একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জেগেছিল, তার বাবার উপর দাবিকে নস্যাৎ করে তুলবে। অনিমেষই সেদিন নিজে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসবে তার কাছে।

তারাগুলোর বুকের তৃপ্তির শিহরের সংক্রমণ বিজয়ার বুকে। অনিমেষের হাতখানায় প্রকম্প আবেশ জাগে তার সুর বিজয়ার সারা মনে ছড়ানো। তবু বিজয়া অভিমানভরা স্বরে বলে,

—তোমার বাবার মত নিয়েছো?

—বাবা! অনিমেষ ওর দিকে চাইল। ও জানে বাবা ঠিক

খুশী হবেন না একথা শুনে। কিন্তু এও জানে অন্যায় সে করে নি। তাই বাবা বাধা দেবেন না।

তার কোনো কাজেই বাবা বাধা দেন নি। তাছাড়া আজ সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, নিজের এই দিকটার কথা ভাবার যোগ্যতা আছে। তাই বিজয়ার কথায় বলে,

—বাবা বাধা কেন দেবেন? তাছাড়া আমরা এখানে থাকছি না। দিল্লীতে চাকরি নেব একশর্তে—

বিজয়া ওর দিকে চেয়ে থাকে নীরব দু'চোখের আয়ত চাহনি মেলে। ও জানতে চায় কি সেই শর্ত। ওর চোখে সেই প্রশ্ন।

অনিমেষ বলে—তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

—ধ্যাৎ! আবদার! হাসছে বিজয়া। ওর চোখে সুগৌর গালে লজ্জার মিষ্টি আবেশ জাগে।

—মর-মর! যমভরার দল। মুয়ে আগুন তোদের। বলি আমার বৌ লষ্টা আর তোরা হলি সতী! এ্যাঁ—বলি তোদের কেচ্ছা কে না জানে লা?

খ্যানখ্যানে গলার কর্কশ ফাটা কাঁসির মতো শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে বিজয়া। কোন স্বপ্নজগৎ থেকে সে কঠিন এই মাটিতে ফিরে আসে। স্থান কাল পরিবেশ আজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিছুই মেলে না।

মণি দত্তর বুড়ি মা বৌটাকে নিয়ে পড়েছে।

—বলি, মরতে পারিস না লা? দেশ ডোবা বানে এত শ্যাল কুকুর ডুবলো—তুই ডুবে মরলি না?

বৌটা ফোঁস করে ওঠে—তাই মরবো এইবার। আমি মলে তোমাদের হাড় জুড়োয়।

—ফের চোপা। বুড়ি গর্জন করে ওঠে। তারপরই ঝন্‌ঝন্ শব্দ ওঠে। বৌটার অস্ফুট আর্তনাদ শোনা যায়। বৌটার ওই

চোপা থামাবার জন্যই নীতিবাগীশ স্বধর্মপরায়ণা শাশুড়ী হাতের কাঁছে পড়ে থাকা একটা কাঁসিই ছুঁড়ে দিয়েছে।

আদুরীও এই আঘাতের জন্য তৈরি ছিল। অতর্কিতে থালাটা এসে কপালে লেগেছে। কেটে গেছে বেশ খানিকটা।

বিনা দোষে বাক্যবাণ লাঞ্ছনা চরম অপমান সে অনেক সয়েছে, আজ হাতও তুলেছে ওরা। আদুরী দুচোখ রাগে জ্বলে ওঠে। সেও গলা তুলে চীৎকার করে।

—টাকার জন্য করোনি কি তোমরা মায়ে পোয়ে? চামার কসাই অক্ষম একটা মাদী তোমার ছেলে! স্বোয়ামী! স্বোয়ামী হবার মুরোদ আছে ব্যাটার?

বেদান্ততীর্থ ওই চীৎকারে পূজা থামিয়ে বসে থাকেন। বিজয়াও শুনছে কথাটা। শাশুড়ী বৌএ ওদের চুলোচুলি ঝগড়া বাধে; আর তাদের মত বিরোধটা ঘটেছিল গোপনে। বাইরে তার কোনো প্রকাশ ছিল না।

তবু অস্তিত্ব তার ছিল গভীরভাবে।

বিজয়া আজও সেটা পরিষ্কারভাবে স্মরণ করতে পারে। আরও অনুভব করেছে সেটা ফটিকের অসুখে। শ্বশুরমশায়ের সাধ্য নেই, কিন্তু সম্মানবোধ আছে। তাই একমাত্র নাতির চিকিৎসার জন্যে ঠিকমতো অনুরোধও করতে পারেন নি সাহায্যের জন্য।

কিন্তু ওই সম্মান আর মর্যাদাবোধের কি মূল্য থাকতে পারে জানে না বিজয়া। ওটা নিছক কল্পনাই। আর মনগড়া সম্মানের তৃপ্তি নিয়ে ও বসে আছে। বাস্তবে তার দাম কানাকড়িও নয়।

বিজয়া উঠে পড়ল। ফটিক জ্বরের ঘোরে ছটফট করছে। তেষ্টা পেয়েছে ওর। জল খাবার রুচি নেই। দু একটা ডাব সংগ্রহ করতে হবে। তাছাড়া ওষুধের দরকার। সেইই নিজে নিয়ে যাবে ওকে সদরের হাসপাতালে।

—কোথায় চললে বৌমা?

বেদান্ততীর্থ দেখেছেন বৌমাকে। বিজয়ার মুখচোখের এই কাঠিন্যকে তিনি দেখেছিলেন অতীতে। ওই মেয়েটিই তার ছেলেকে ওর কাছ থেকে সেদিন ছিনিয়ে নিয়েছিল। বাধা দিয়ে ছেলেকে শাসন করার কাঙালপনা তিনি দেখান নি। নীরবে ছেলের দেওয়া আঘাত মেনে নিয়েছিলেন।

বিজয়া সেদিন অমনি চাহনি মেলে তার দিকে চেয়েছিল।

আজ বিজয়া বলে—একটু আসছি বাবা। ফটিকের জন্য একটু ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে। শুনলাম মেডিক্যাল টিম এসেছে।

বেদান্ততীর্থ কথা বললেন না। বৌমার দিকে চেয়ে থাকেন। আগেকার সেই কঠিন মেয়েটি আজ হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে। বিজয়া নেমে গেল।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বেদান্ততীর্থ।

মনে হয় দীর্ঘ এতগুলো বছর পার হয়ে গেছে। অনিমেষ মারা যাবার পর আবার বেদান্ততীর্থই সব ভার তুলে নিয়েছিলেন।

বিজয়া লেখাপড়া শিখেছিল। এখানে গ্রামে এসে ও কাজকর্ম নিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাধা দিয়েছিলেন তিনিই।

—ও সব থাক মা। যেভাবে হোক দিন চলে যাচ্ছে। অনেক ছিল তাতেও অভাব—জ্বালা মেটে নি। আজ সামান্য আছে—তাই তৃপ্তি পেতে চাই, শান্তি পেতে চাই।

বিজয়া কি ভেবে থেমে গেছল।

দীর্ঘ অনেকগুলো বছরের শূন্যতার উপর পড়েছিল কালের প্রলেপ। সেই ক্ষত বুজে গিয়ে এসেছিল পূর্ণতার স্বপ্ন। বেদান্ততীর্থ খুশি হয়েছিলেন। তাঁর সংসারে শান্তি এসেছিল কিন্তু এই বন্যার আবর্ত সেই সবুজ স্নিগ্ধতাকে প্রবল স্রোতে কোথায় মুছে নিয়ে গেছে। আবার অতীতের সেই নিষ্করুণ শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গে মনের জ্বালাটাও ব্যাপক হয়ে উঠেছে ও তীব্রতর হয়েছে। বন্যার ক্ষুরধারাপ্রবাহ জীবনের কদর্যতা আর রিক্ততার বেদনাকে আজ মুখোমুখি করে

দিয়েছে। প্রমাণ করেছে তিনি অযোগ্য অক্ষম বাতিল একটি প্রাণী। আর এই ব্যর্থতা তাঁর সারা মনের প্রশান্তি ছাপিয়ে এনেছে দুঃসহ নিঃসঙ্গতার বেদনা আর অপমানের জ্বালা।

চারিদিকের এই নোংরা কলরব আর কুৎসিত ঘটনাগুলো তাকে বিচলিত করেছে। ইষ্টমন্ত্রও ভুলে গেছেন। জপ করার নির্জনতা নেই। অসহায় একটি স্থবির বৃদ্ধের সামনে এতদিনের সব ধ্যান ধারণা অসার আর অর্থহীন হয়ে উঠেছে।

মনে হয় তিনি হেরে গেছেন নিদারুণভাবে জীবনযুদ্ধে।

স্তব্ধ বেদনাহত চাহনিতে তিনি চেয়ে থাকেন ফটিকে দিকে। ছেলেটা ক'দিনের জ্বরে বিবর্ণ হয়ে গেছে। একটি ক্ষীণ দীপশিখা যেন বাইরের ঝড়ো হাওয়ায় প্রকম্প—নিভু নিভু।

এই তার ভবিষ্যৎ! অতীত আর বর্তমানের মাঝে একমাত্র যোগসূত্র। তার একমাত্র সন্তান অনিমেষের পরিচয়—তার ভবিষ্যৎ।

—দাদুভাই!

বৃদ্ধ শীর্ণ হাত দিয়ে ওর শিরস্পর্শ করেন। ফটিক চোখ মেলে চাইল। বাইরের সেই বিচিত্র খেউড়ি—আর কান্নার শব্দ সমানে চলেছে। ফটিকের মনে হয় ওরা সকলেই তাকে শাসাচ্ছে অমনি চড়া গলায়।

ভীত শিশু বলে—বাড়ি যাবো দাদু।

কোথায় ওর চিরন্তন কোন গৃহের স্বপ্ন দেখে সে। সে ঘরের সন্ধান আজ বৃদ্ধের সামনে হারিয়ে গেছে।

বাগানে শিউলি ফুটেছে—কলাগাছগুলোর পাতা কাঁপবে হাওয়ায়। ও শুনবে না, সেই সবুজ বাগানটা ওরা কেড়ে নিয়েছে। বেদান্ততীর্থের এতদিনের বিদ্যা প্রজ্ঞা ধী সব একালের কঠিন আঘাতে অর্থহীন হয়ে গেছে। ওই বাগানটুকু ছিল তার জীবনে শান্তি আর শ্রীর প্রতীক, সেই অবলম্বন আর সম্পদটুকুও বিকিয়ে দিয়েছেন বিনিকড়ির মূল্যে।

কথাটা শুনেছিল গোবিন্দ মুন্সী। বুড়োর জিব দিয়ে এখনও লালা পড়ে। মেয়ে মহলের ওই কুৎসিত ঝগড়াটা কানে আসতেই গোবিন্দ মুন্সী তার ওপাশের ঘর থেকে নেমে আসে। রাতের অন্ধকারের জমা পাঁক ছিটচ্ছে ওরা। অনেক বৌ-মেয়ের দামাল রূপের দিকে ওর নজর। খেঁকি কুকুরের মতো এঁটো পাতার সন্ধানে সে ঘুরে বেড়ায়।

সৌরভীর দেহের নেশা আছে, কিন্তু মাদকতা অনেক কম। ওই সেজে থাকা বৌ বেটিদের অনেকের পলিজমা জীবনের কাহিনীই আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে এসে গোবিন্দ মুন্সী শুনেছে বেদান্ততীর্থের বৌএর কথা।

বৃদ্ধ অক্ষম লোকটা বৌকে এতদিন যেন বেড়ার মধ্যে আটকে রেখেছিল। বিজয়াকে দূর থেকে দেখেছে সে। দেহের বাঁধন এতটুকু ভাঙে নি। ফর্সা টকটকে রং, ডাগর চোখ।

মাথার একরাশ কোঁকড়ানো চুলে যেন ঢেউ খেলে যায়। কি উতরোল ঢেউ।

গোবিন্দ শুনেছে ছেলেটার জ্বরের ঘোরে ওই ঘরে ফেরার কথা। মনে মনে কি ভাবছে সে। গিরিশ পণ্ডিতের ভিটে আর নেই। তাই পথটা ভাবছে সে। জেনেছে শ্বশুরের সামর্থ্য আর নেই, এখন বৌকেই দেখে শুনে করতে হবে। অভাব দুঃখ আর সর্বনাশের মধ্যেই সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে যায়, নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতে ফাটল ধরে।

ধরুক। গোবিন্দ মুন্সীর মতো লোকেরাই চিরযুগের শ্মশান চণ্ডাল। চরম বিপদের দিনে এসে দাঁড়ায় সর্বনাশের শেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করতে।

বৌ-ঝিদের রাতের কাহিনী শুনছে। চারিদিকে কাদা পলি

থিকথিক করছে। ওরই মাঝে মানুষগুলোও সর্বাঙ্গে নোংরা মেখে ভূতের মতো যেন টিকে আছে।

—বৌমা!

গোবিন্দ মুন্সী ডাকছে ওকে। বিজয়া দোতলা থেকে নেমে আসছিল। নিচের ওদিককার মাঠে জীপটা দাঁড়িয়ে আছে। রেড ক্রশ আঁকা জীপ। সামনের ঘরেই বোধহয় ডাক্তাররা রয়েছেন। তরুণবাবুকেও দেখেছে ওদের নিয়ে ঘুরতে।

ওইখানে যাবার মুখে গোবিন্দ মুন্সীর ডাক শুনে দাঁড়ায় বিজয়া। লোকটা এগিয়ে আসছে। বয়স হয়েছে, তবু এখনও বেশ সৌখীন। পরনে ইঞ্চিপাড় ধুতি। কোঁচাটা ফুলের মতো গুটিয়ে হাতে পরিপাটি করে ধরা।

—আমাকে ডাকছেন? বিজয়া একটু অবাক হয়।

গোবিন্দ ওকে একটু নির্জন সিঁড়ির কোণেই দাঁড় করিয়েছে ইচ্ছে করে। বিজয়া ওর দিকে চাইল।

গোবিন্দ মুন্সী বলে,

বাড়িঘর তো নোতুন করে করতে হবে। এই নরকে থাকা যায় না। তাই ভাবছিলাম কথাটা পণ্ডিত মশাইকেই বলবো। কিন্তু দেখলাম তার বয়স হয়েছে, এখন তোমাকেই সব দেখে শুনে নিতে হবে। তা খোকা কেমন আছে?

বিজয়া ওর আন্তরিকতার সুরে একটু অবাক হয়। অন্যসময় হলে ওর কথার জবাবই দিত না। আজ বিজয়াকে সবই মেনে নিতে হবে। তাই বলে—তেমনিই রয়েছে, তাই যাচ্ছিলাম নোতুন ডাক্তারবাবুদের কাছে।

—অ! তা ভালো। তোমাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখবো না। কথাটা তোমাকেই বলি, যদি ঘর বাড়ির জন্য বাঁশ কাঠ-খড়ের দরকার হয়, আমাকে বলো। যেভাবে হোক ঘর তুলে নিতে হবে।

বিজয়া কথাটা ভাবছে। গোবিন্দ বলে,

—এখুনিই কিছু বলতে হবে না। কথাটা ভেবে পরে জানিও। ওই যে উপরের পর্দা দেওয়া ঘরটা, ওখানেও খবর পাঠাতে পারো।

বিজয়া রীতিমতো অবাক হয়েছে ওর অযাচিত এই সাহায্য দেবার কথা শুনে।

এটা তাদের এখন খুবই দরকার। টাকাও পায় নি শ্বশুরমশায়।

গোবিন্দ মুন্সী ঘড়েল ব্যক্তি। ও দেখছে বিজয়াকে। ওর মনে দ্বিধা সংস্কার থাকবেই, সেটাকে এখুনি কাটানো সম্ভব নয়। তাই নিজে থেকেই ওকে সময় দিয়ে বলে,

—এখন ডাক্তারবাবুদের কাছে যাও। পরে ভেবেচিন্তে যা হয় জানাবে। পণ্ডিতমশায়কেও শুধিয়ো। এ্যাঁ!

বিজয়া ঘাড় নেড়ে মাথার খসেপড়া কাপড়টাকে তুলে দিয়ে সরে গেল। গোবিন্দ মুন্সী প্রায়ান্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাসছে, ওর দাঁতগুলো বের হয় পড়েছে। বিজয়ার নিটোল দেহের দিকে চেয়ে থাকে সে।

তখনও বাইরের খেউড়ী চলেছে। নাতুর বৌ কবে কার সঙ্গে মেলা দেখতে গিয়ে কি করছিল তারই গবেষণার ফলাফল বিঘোষিত হচ্ছে। বাতাসে উঠছে ভাপ্সা বিকৃত একটা পচা গন্ধ। চারিদিকের বানেডোবা কচুরীপানা-ঘাস-সবুজ গাছগুলো পচচ্ছে। সবুজ স্নিগ্ধতা আজ পূর্তিগন্ধময় বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। মানুষের বিশ্বস্ততা ভালবাসার প্রতীক কুকুর, গৃহপালিত গরু ছাগলগুলোও বানে ডুবে পচে ঢোল হয়ে উঠেছে।

—ওয়াক্! কে বমি করছে। ওর বমির বিজাতীয় শব্দ ওঠে।

কোনো একটা মেয়ের গলা ঘন্ঘনিয়ে ওঠে—বলি ও বমি কিসের লা? রোগ না শরীরের পাপ লা! এত সব্বোনাশেও তোদের খিদে গেল না! মরণ!···

তখনও বমির শব্দ উঠছে। বিকট শব্দে বমি করছে কে। কয়েক-জনকেই দেখেছে সে ওই ভাবে বমি করতে। সেই সঙ্গে আছে দাস্ত, জলের মতো বয়ে চলেছে।

ঝিমিয়ে আসছে ওরা।

ওদের কাছে ওই বমির পিছনে অন্য কোন গভীর রহস্য উঁকি মারতে পারে। কিন্তু বিমল ডাক্তার কান করে শুনে এগিয়ে আসে। চমকে উঠেছে সে।

বন্যার পরই এত তাড়াতাড়ি এমনিভাবে কলেরা শুরু হয়ে যাবে ভাবে নি সে।

—কি রে? কে বমি করছে?

মেয়েটার জবাব দেবার সাধ্য নেই। বিমল ডাক্তার যা ভেবেছিল তাইই ঘটছে। বন্যার সঙ্গে সঙ্গেই সব দুর্ভাগ্যই ঘনিয়ে আসছে।

এসব ব্যাপার কিছুই জানে না বিজয়া। এই চত্বরের নানাদিকে নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনা ঘটছে, এতগুলো মানুষ তাদের নিজের নিজের হাসি কান্না সমস্যা নিয়ে এখানে মাথা গুঁজেছে; সে সব মিলিয়ে বিরাট এক জীবনকাব্যই গড়ে ওঠে। এও যেন একটি জনপদ, এর ঘরে ঘরে সমস্যা মনে মনে যন্ত্রণা।

বিজয়ার সে সব জানার কথা নয়। তবু গোবিন্দ মুন্সীর কথাগুলো আজ বিচিত্র ঠেকে।

বিজয়া ওর কথার জবাব দেয় নি। নিচের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

ঘরের প্রশ্ন আছেই। তার আগে ফটিকের ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে তাকে।

কয়েকজন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট আর দু'জন ডাক্তার এসে পড়েছেন। ইস্কুলের ওপাশের ঘর দুখানা তাদের জন্য পরিষ্কার করাচ্ছে তরুণ। নবাগত ছাত্ররা—তাদের ইনচার্জ ডাঃ সেনও দেখছেন চারিদিক।

নোংরা ময়লা আর ছিটিয়ে আছে এঁটো পাতা, আবর্জনা।

এমনকি প্রাকৃতিক ব্যাপারও ওরা সেরেছে যত্রতত্র। টিউবওয়েলের এদিক ওদিকে বাচ্চাদের এনে বসিয়ে দিয়েছে।

তরুণ নিজেও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। মেডিক্যাল টিমের জন্য সব ব্যবস্থা করবেন বলেছিল ত্রিদিববাবু, অবশ্য ত্রিদিববাবু নামে প্রেসিডেন্ট, পুটুই যেন কর্তা। পুটুই ওই মেডিক্যাল টিম আসার খবর পেয়েও এদিকে আসে নি।

তরুণ খবর পেয়েছে পুটু কেরানী এখন নৌকা থেকে রিলিফের মাল খালাস করতে ব্যস্ত। এঁরা কষ্ট করে জলকাদা ভেঙে এসেছেন তাদের দিকে নজর দেবার দরকার নেই।

তরুণের কাছে কারণটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

বিভূতিবাবু যেন হালে পানি পাচ্ছেন না। পুটু, ত্রিদিববাবু তাঁকেও খবর দেয় নি ওই সব মালপত্র আনার। কি কি এল—কত পেলেন মালপত্র তার হিসাব তাঁকে ওরাই দেবে। বিভূতিবাবুর কেমন বিশ্রী লাগে।

তাই তরুণের কাছে এসেছিলেন তিনিও দাঁড়িয়ে থেকে মালপত্র দেখে নেবেন কিনা জানতে। ভয় হয় এই সব কাজ নিজে করতে গেলে আবার ত্রিদিববাবুও মনে করতে পারেন যে তাঁকেই অবিশ্বাস করছে বিভূতিবাবু। চাকরির মায়াটাও আছে। বিভূতিবাবু বেশ বুঝতে পারেন তিনি একটা জালে জড়িয়ে পড়েছেন। আর সেই জন্যেই এসেছেন তরুণের কাছে।

—কি হবে হে! সব মালপত্র উঠবে শুনছি এখানে। কিন্তু মাল তো দেখলাম না—কি আছে না আছে। তুমিও রইলে এখানে।

তরুণও দেখছে বিভূতিবাবুর অবস্থাটা। ওরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিভূতিবাবুকেই সর্বেসর্বা বানিয়ে দিয়েছে। অথচ প্রথম থেকেই সেখানে মাতব্বরী শুরু করেছে পুটু কেরানী আর পটলার দলবল।

তরুণ বলে—এঁদের থাকা-টাকার ব্যবস্থা পুটুবাবু কিছু করেন নি। আমিই যা হয় ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। আপনি বরং মালপত্রের ওখানে গিয়ে দাঁড়ান গে। তবু খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন।

বিভূতিবাবু কি ভেবে নদীর ঘাটের দিকে এগোলেন।

ততক্ষণে কলরব শুরু হয়েছে। কারা সব চাল গমের বস্তা-কম্বলের গাঁট বয়ে নিয়ে আসছে। বিভূতি ওদের দেখে দাঁড়ালেন।

তরুণ দু'একজনকে ধরে চেয়ার টেবিল আনিয়ে ঘর দুটোকে একটু ভদ্রস্থ করে তুলেছে।

ডাঃ সেন বলেন, আপনি নিজেই হাত লাগিয়েছেন মশাই! ওহে ওষুধের বাক্সগুলো আনো। এইখানেই রাখো ওগুলো।

তরুণ বলে—চেম্বার, কনসালটিং-রুম কাম বেডরুম সব একসঙ্গে হয়ে গেল?

হাসেন ডাঃ সেন—উপায় কি! ওপাশের বারান্দাটা ঘিরে নিয়ে ওখানেই রোগী দেখবো।

এমন সময় বিজয়াকে ঢুকতে দেখে তরুণ একটু অবাক হয়। ডাঃ সেনও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুন্দর চেহারা, কাপড়টা, ময়লা মুখে চোখে কি ভাবনার কালো ছায়া নেমেছে বিজয়ার। তবু বাইরের মালিন্য ছাপিয়ে একটা মলিন শ্রী ওই সাদা শাড়িতেও ফুটে উঠেছে। শেষ রাতের রজনীগন্ধার মতো বিষাদে টলোটলো, শিশির ধোয়া কারুণ্যের মতো মনে হয় ওকে। তরুণ ওর দিকে চাইল।

বিজয়া নিজেই আজ এগিয়ে এসেছে। বলে সে,

—আমার ছেলের ক'দিন জ্বর। পণ্ডিতমশাইও বলেছিলেন আপনাকে।

তরুণের কথাটা মনে পড়ে। ভদ্রমহিলাকে এইবার চিনতে পারে সে।

বেদান্ততীর্থের পুত্রবধূ বিজয়া। এককালে গার্লস সেকশনে পড়াবার জন্য দরখাস্তও দিয়েছিল।

কিন্তু এই দুঃখ বিপর্যয়ের মধ্যে ওকে দেখবে এইভাবে ভাবতে পারে নি তরুণ। বলে সে,

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ডাঃ সেন। এঁর ছেলের ক'দিন ধরে জ্বর। কোনো চিকিৎসাই হচ্ছে না তেমন।

ডাঃ সেন ওর দিকে চেয়ে থাকেন, কেমন যেন বিষণ্ণতার মূর্তি—তবু দৃঢ়তার ছাপ রয়ে গেছে ওর মুখে। প্রচ্ছন্ন শ্রীটুকু মাধুর্যে ভরে উঠেছে।

ডাঃ সেন বলেন—কোথায় আছে সে?

বিজয়া আঙুল দিয়ে দেখালো ওই পুরোনো বাড়িটার দিকে। ডাঃ সেন বলেন—জ্বর। ছাড়ছে না?

এমনি সময় ঝড়ের মতো ঢোকে বিমল ডাক্তার। পরনে একটা চেক চেক লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া আর গলায় স্টেথো জড়ানো। বিমল ডাক্তার বলে,

ওন্‌লি জ্বর? মাই গড্। ওদিকে যে মা শীতলা এসে গেছেন মাস্টার! রীতিমতো তিন চারটে গড়িয়েছে। আরও গড়াবে কিনা কে জানে? তারপর টাইফয়েড ধরেছে।

ওই যে। ফটিক কেমন আছে? আমার মনে হয় ওটা টাইফয়েড, অবশ্য আমি তো হ্যামার ব্রাণ্ড। ডাঃ সেন দেখলেই বুঝবেন। নমস্কার স্যার।

ডাঃ সেন ওই বিচিত্র দর্শন লোকটির দিকে চেয়ে থাকেন। তরুণই পরিচয় করিয়ে দেয়—

বিমলবাবু, এখানের ডাক্তার। ভেরি অনেস্ট অ্যাণ্ড সিন্‌সিয়ার লোক।

হাসে বিমল ডাক্তার—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো স্যার। স্রেফ অকাজের লোক, একেবারে মিস্ ফিট, বোকামিকে ওই অনেস্টির নাম দিয়ে চালাচ্ছি।

এও এক ধরনের আত্মতুষ্টি বলতে পারেন।

বিজয়া একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বিমল ডাক্তারের খেয়াল হয়।

—তাহলে একবার দেখতে যাবেন স্যার? মনে হয় কি জানেন? ওই ক্যাম্পএর অন্ধকার ঘুপসী থেকে পেসেন্ট সরানো দরকার। তাছাড়া এপিডেমিক যদি লাগে—সমূহ বিপদ হবে। একেবারে হেল্ হয়ে গেছে মশায়। নরক।

বিজয়াও কথাগুলো শুনছে। নরকই হয়েছে। এতলোকের ভিড় ওই নোংরার পাহাড় আর মালপত্র সব মিলে একটা দুর্গন্ধ উঠেছে ওখানে। টেকা যায় না। বিজয়া ভাবছে এখান থেকে সরে যাবার কথা। কোনোমতে একখানা ঘর একটু বাঁশ কাঠ দিয়ে তুলে নিতে পারলে এই নরক থেকে সরে যাবে সে।

তরুণের দিকে চাইল বিজয়া। কদিনে দেখেছে তার সেই অক্লান্ত পরিশ্রম। এই বন্যার মুখ থেকে সেইই বাঁচিয়েছে এত মানুষকে, ওদের গ্রামের ছত্রভঙ্গ মানুষদের সমবেত করে সেইই এই বিপদের মাঝেও বাঁচবার পথ দেখিয়েছে।

জানে বিজয়া—ওই তরুণই বন্যার জল ভেঙে—কোথাও সাঁতার কেটে, হেঁটে, সে সদরে গেছে কর্তাদের কাছে এই দারুণ সংবাদ দিতে। সাহায্যের আবেদন পৌছে দিয়েছে ওদের কাছে। খবরের কাগজ আপিসে গেছে—এ এলাকার সংবাদ জানিয়েছে চারিদিকে। এদের বাঁচার প্রশ্ন তুলে ধরেছে জনসাধারণের সামনে।

আজ তাই এখানে এসব এসেছে। আয়োজন হচ্ছে এদের বিপদে সাহায্য করার। বিমল ডাক্তারের কথায় ডাঃ সেন বলেন,

—একবার দেখে আসি চলুন, বিমলবাবু, আপনিও সঙ্গে থাকুন। বিমল ডাক্তার ফতুয়ার পকেট থেকে বিবর্ণ একটা চ্যাপ্টা কৌটা বের করে আঙুলের টিপ দিয়ে খুলে দুটো বিড়ি বের করে নিরীক্ষণ করে বলে—

চলবে নাকি স্যার? অবশ্য মণি দত্তের বৌয়ের হাতে বাঁধা বিড়ি।

পিওর কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিই বলতে পারেন। তবে জিনিসটা মন্দ নয়। তরুণ ভায়ার এসব চলে না। একেবারে পিউরিটান।

ডাঃ সেন বললেন—ধন্যবাদ। ওসব চলে না। মাঝে মাঝে দুএকটা চুরুট খাই। তাও কখনও সখনও। তাহলে চলুন—

বিমল ডাক্তার বলে—আবার আমাকে কেন স্যার ? এ্যাদ্দিন বৃক্ষ-হীন দেশে ভেরেণ্ডাই বনস্পতি হয়েছিল, এখন আপনারা এসেছেন—

ডাঃ সেন হাসেন—না, না। সেকি কথা! আপনাদের একটা জিনিস আছে—সেটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা। তার দাম যে অনেক। চলুন তরুণবাবু, দেখে আসি একবার।

বিজয়া আশাভরে ওদের নিয়ে চলেছে।

—ডাক্তার বাবু গ! নামোপাড়ার জগদীশের বৌটা এসে হাউমাউ করে পড়ে ওদের সামনে। একেবারে পথ আটকিয়ে ডাক্তার সেনের পায়ের উপরই পড়ে চীৎকার করে।

—মেয়েটা কেবল বমি করছে গ', বমি আর পায়খানা। হাত পা কালিয়ে আসছে।

বিমল ডাক্তার বলে—এখন পথ ছাড়। উপর হয়ে দেখে তোর ওখানে যাবেন ডাক্তারবাবু।

জগদীশের বৌটার সঙ্গে আরও দুচারজন এসে জুটেছে। পটলার বাহন—পীতুর গিন্নীও ইতিমধ্যে এখানে মাতব্বর হয়ে উঠেছে। পীতুর বৌও দেখেছে ডাক্তারবাবুকে বিজয়া ডেকে নিয়ে চলেছে। তরুণবাবুর সঙ্গে মেয়েটা কি সব কথা বলছিল। ওদের পীতুর বৌ বলে ওঠে,

—তা কেন যাবে গ'। ডাক্তোর বাবুরাও ওদেরই হাতধরা। তোর আমার কি ছরাত আছে লা জগুর বৌ ?

মণি বেনের মা একটু আগে একপ্রস্থ বচন দিয়ে থেমেছে। ওর বৌয়ের নিন্দে আর অপবাদটা তখনও গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে নি। গা জ্বালা জ্বালা করছে। অপবাদটা তার কাছে এসে

জমে গেছে, সেই কেচ্ছার জ্বালাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত বুড়ির শান্তি নেই। আর কোনো অপরাধীর ঘাড়ে ও কলঙ্কের বোঝাটা চাপানো দরকার।

হঠাৎ ওই ঘটনার জায়গায় এসে নোতুন ডাক্তারবাবু আর তরুণকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়াকে যেতে দেখে আর ওই পীতুর বৌএর কথাগুলো শুনে বুড়ির দাঁত পড়া মাড়িতে হাসির ঝিলিক খেলে যায়।

পণ্ডিতের বৌ-ওর নামেও দুচারটে কথা শুনেছিল। পণ্ডিতের ছেলে নাকি বাপের অমতে বিয়ে করেছিল এই মেয়েকে প্রেম ট্রেমের ব্যাপার ঘটিয়ে। মেযেটার ওই রূপ আর তেমনি উছল যৌবন। তবু পণ্ডিতের মুখ চেয়েই ওরা কিছু বলতে পারে নি। একটা অদৃশ্য শ্রদ্ধা কোথায় ছিল।

আজ দেখছে সেই মানুষটাও তাদেরই মতো অসহায়, এমনি অর্ধাহারে তাদের সঙ্গেই দিন কাটাচ্ছে। তার নাতিকেও খেতে দেবার—চিকিৎসা করাবার সাধ্য নেই। তাকেও জমি বাগান বন্ধক দিতে হয়েছে টাকার জন্য।

মণি দত্তের অবস্থা তাদের থেকেও অনেক ভালো। এই অসময়ে সে টাকা কিছু কামিয়েছে। বুড়ি আজ ওদের তার থেকে অনেক নীচের প্রাণী বলেই জানে। জাত সংস্কার—এসবের কৌলিন্যকে সে মানে না, টাকাটাই একালে বড়। সবচেয়ে বড়। সেই কারণেই মণের মা আজ বেদান্ততীর্থের বৌকেও ইঙ্গিত করে তার ঘাড়ে চাপানো অপবাদটার বোঝা লাঘব করে। বুড়ি বলে,

—ও কি দেখছিস লা জগুর বৌ। ঘোমটার তলে খ্যামটা নাচ ঢের আগেই শুনেছি। প্রেম করে বিয়ে, না ছাই। সাঙ্গা করা মেয়ে লা। এতদিন রূপের ধাপ্‌ৱী নিয়ে কি হাপু গেয়েছে? বললাম তো মাছ খায় সব পাখিতে, দোষ হয় শুধু মাছরাঙারই।

বিজয়ার কানে ওই তীক্ষ্মস্বরের কথাগুলো গরম সীসের মতো বেঁধে। তবু করার তার কিছুই নেই। সয়ে যেতে হবে।

বিজয়া তবু চমকে উঠেছে। রাতারাতি ছবিটা একেবারে বদলে গেছে। আর এসব কথা কোনোদিনই শোনে নি সে। মনে হয় বিজয়ার, অভাব আর হতাশার যন্ত্রণায় জ্বলে জ্বলে ওদের মন রুচিবোধও বিশ্রী হয়ে উঠেছে।

সবকিছু সইবার চেষ্টাই করবে সে।

তরুণ অবাক হয়। ও শুনেছে ওই মেয়েদের কথাগুলো। বিশ্রী ওই ইঙ্গিতটাও বুঝেছে সে। নিজেরই লজ্জা করে। বন্যার আবর্তে আর প্রবল স্রোতে ওদের সবকিছু ধুয়ে গেছে, যা সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল গভীর বিষ পলিতে তা ঢাকা পড়ে গেছে। সবুজ মৃত্তিকা, সুন্দর ধানক্ষেতের বুকজোড়া আজ শুধু দগদগে বিষ ক্ষত।

ওরা অন্ধকার গুমোট ধোঁয়া আর বিশ্রী গন্ধ ভরা ঢাকা বারান্দা দিয়ে চলেছে। ডাঃ সেন দালানের ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। বাতাসে ধিকধিক করছে বিশ্রী গুমোট বদ গন্ধ। খোপে খোপে লোকগুলো বিচিত্র কোনো জীবের মতো বাস করে আছে।

ডাঃ সেন বলেন—এখানে যে সুস্থ মানুষই অসুস্থ হয়ে যাবে তরুণবাবু?

তরুণ চুপ করে থাকে। বিজয়া ওদের ঘরটার সামনে এনে দরজা খুলে বলে—দেখুন কী সুখে আছি আমরা!

বিবর্ণ শীর্ণ ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকেন ডাঃ সেন। বদ্ধ গুমোট ধোঁয়ায় ভরা ঘরের ওপাশে বসেছিলেন বেদান্ততীর্থ—যেন অতীতের সমৃদ্ধির ধ্বংসস্তূপ। নির্বাক চাহনি মেলে দেখছেন বেদান্ততীর্থ ওঁদের দিকে।

ডাঃ সেন বলেন—এখানে থাকলে রোগ বেড়েই যাবে যে!

—উপায় কি বলুন। বেদান্ততীর্থের ভারি গলায় কথাগুলো ফুটে ওঠে। হতাশাভরা কণ্ঠে বলেন তিনি—এই আমাদের ভবিতব্য

ডাক্তারবাবু, আপনি কেন, ভগবানও এর প্রতিবিধান করতে পারবেন না।

তরুণ একথা মানে না। সে দেখেছে মানুষের মধ্যে এই নোতুন সাড়া যা তার প্রকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দুঃখ-হতাশা-বেদনা সবই আছে। কিন্তু তার মাঝেও মানুষ বাঁচার চেষ্টা করবেই, এ তার সহজাত ধর্ম। তাই তরুণ বলে।

—তবু মানুষ এর বিহিত করবেই পণ্ডিতমশায়। আজকের যুগ শুধমাত্র যন্ত্রণার যুগই নয়, যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খোঁজার যুগ। পথ একদিন আমরা পাবোই।

বেদান্ততীর্থ ওর দিকে চাইলেন। বিজয়াও শুনছে তরুণের কথাগুলো। ওর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাসের সুর।

বেদান্ততীর্থ যেন জীবনের এই বিশ্বাসের মূলে কোনো সত্যকে খুঁজে পান নি। তাঁর অতীতের সেই সমৃদ্ধি আর শান্তির দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ চারিদিকে জ্বালা—অক্ষমের আস্ফালন আর ব্যর্থতা। এর অন্ধকারে পথের রেখা কোথাও নেই। তাই বলেন তিনি,

—কিন্তু পথ আর কতদূরে জানো মাষ্টার? এ পথের কি শেষ নেই?

তরুণ শোনায়—ষোল আনা দাম এখনও দিই নি পণ্ডিতমশাই, পাবার জন্যই হাহাকার করে চলেছি। এই ভুল যেদিন ভাঙবে, নোতুন করে সমাজের সবকিছুর মূল্যায়ন যেদিন হতে পারবে, তারপর আসবে গড়ার পালা।

—ততদিন? বেদান্ততীর্থ এই ভাঙনকেই দেখেছেন। এর বাইরে আর কিছু চোখে পড়ে নি। বোধহয় তার বার্ধক্য আর আজকের যৌবন এই দুটোর মাঝে বিরাট একটা ব্যবধান রয়ে গেছে। তাই আজকের মনকে, তাদের ভাবনাকে তিনি চেনেন নি।

তরুণ জবাব দেয়—ততদিন এই যন্ত্রণা-অবক্ষয়কে সইতে হবে।

বেদান্ততীর্থ চুপ করে থাকেন। মনে হয় একথাও সত্যি! রাত্রির তমসার পরই আসে নোতুন সূর্যোদয়। এ অমারাত্রিরও একদিন শেষ হবে, সেই হিরণ্যবর্ণ আদিত্যকে দেখবার জন্য স্থবির বৃদ্ধও এই রাত্রির প্রহর গণনা করবেন।

পূর্ণতার পথ চেয়ে, সব অপূর্ণতার বেদনাকে বুকে নিয়ে কালাতিপাত করতেই হবে।

ডাঃ সেন ফটিককে দেখছেন। নির্বাক নিস্পন্দ ক'টি মানুষ ওঁর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ওরা নৌকা থেকে মাল খালাস করে ঘরে তুলছে। পটলাও রয়েছে। তার হৈচৈ-এর শব্দ শোনা যায়। লোকটা কাজের চেয়ে চীৎকারই বেশী করে।

বিভূতিবাবু ঘাটের ধারে যাবার মুখে ওদের মালপত্র বইতে দেখে দাঁড়ালেন। নদীর ঘাট থেকে লোকগুলো ঠাঁই ঠাঁই ভাঙা রাস্তার জল কাদা পার হয়ে রিলিফের জিনিসপত্র আনছে। এদিকের গুদাম ঘরে রয়েছেন ত্রিদিববাবু।

বিভূতিবাবু কোনোখানেই নেই।

ক্ষুধার্ত লোকগুলো—মেয়েছেলের দল এদিক ওদিক ঘুরছে। ওদের বুভুক্ষু মলিন কালো মুখ আর কোটরে ঢোকা চোখে একটু তৃপ্তি আর আশার ঝিকিমিকি।

রোদও উঠেছে। চড়চড়ে রোদ। ভাদ্র মাসের শেষ দিকে বেশ গরম রয়েছে। বিভূতিবাবু আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাজ দেখছেন, হঠাৎ মণি দত্তকে ওদিক থেকে এসে একটা লোককে কি বলতে দেখে একটু খেয়াল করে চাইলেন।

মণি দত্তের মুখে চোখে সাবধানী ভাব। গাছের আড়ালে বিভূতিবাবুকে সে দেখে নি। লোকটার মাথায় কম্বলের একটা বড়

বাণ্ডিল। মণি দত্ত তার সঙ্গে কথা বলে স্কুলবাড়ির পিছন দিকে চলে গেল, বেশ খানিকটা দূর থেকে ওকে ইশারা করতে সেই লোকটা আরও দুজন লোক বোঝা সমেত পিছনের দিকে এগিয়ে গেল দল ছেড়ে।

ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপের আড়ালে ওদের দেখা যায় না। বিভূতিবাবু দূর থেকে ব্যাপারটা দেখে একটু অবাক হন। বেশ কয়েকটা গাঁট মাল সরে গেল।

মণি দত্ত ওদের নিয়ে গিয়ে পুরোনো ইস্কুল বাড়ির ওপাশের একটা ঘরে তুললো। চাল গমের বস্তাগুলোর দিকেও নজর রাখছেন বিভূতিবাবু। কেমন বিশ্রী লাগে তাঁর।

একটু পরে দেখে মণি দত্ত আবার ওই ভাঙাবাড়ির আড়ালে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে, সাবধানী চাহনিতে এদিক ওদিক দেখছে সে। লোকগুলো মাল নিয়ে ফিরছে আবার।

বিভূতিবাবুর বিশ্রী লাগে। নিজেরই মনে হয় তিনিও যেন ওই চুরির নায়ক। তাকে এখানে দেখলে হয়তো অন্য লোকরা ভাববে তিনিও এইসব করে চলেছেন। ওদিক থেকে বাঁশবনের ভেতর দিকে সরু জলকাদা ঢাকা পথ দিয়ে ফিরে গেলেন তিনি।

দেখলেন মণি দত্ত নয় পটলাও এসেছে এবার। দুজনে গলা নামিয়ে কি শলাপরামর্শ করছে। চাল-গমের বস্তাগুলো আনা হচ্ছে গুদামে। দুটো বস্তা সরে গেল আবার।

বিভূতিবাবু ভীত ত্রস্ত হয়ে সরে এলেন।

মলিনাও কথাটা শুনেছে। চামেলির বাবাকে নাকি রিলিফের মাথা করছে। এর মধ্যে তার ঘরেই বেশ কিছু রাঁঢ়ী অনাথা এসে হাজির হয়েছে। মলিনার পদমর্যাদা যেন রাতারাতি বেড়ে গেছে।

গরীব মাষ্টারের বৌ। বিভূতিবাবু মাষ্টারীতেও উন্নতি একবারে হয় নি। অভাব অভিযোগের সংসারে মানুষ হয়েছিলেন বিভূতিবাবু। আই-এ পাস করে গ্রামে ফিরে স্কুলে চাকরি পেয়েছিলেন, থার্ড মাষ্টারের চাকরি।

তবু পড়াশোনার আগ্রহ তাঁর চলে যায় নি। বিভূতিবাবু প্রাইভেটে বি.এ. পাস করেন, তারও কয়েক বৎসর পর বি. টি। তারপর এম.এ।

মলিনা সংসারের দারিদ্র্য দেখেছে। সেদিন তাকে কি ভাবে দিন কাটাতে হয়েছে তা জানে। এখন বিভূতিবাবুর পদমর্যাদা বেড়েছে, সেই সঙ্গে মাইনেও বেড়েছে। মলিনা শুনেছে সেক্রেটারীবাবু নিজে বিভূতিবাবুকে ভালবাসেন, আর সেই সুবাদেই ডেকে নিয়ে গিয়ে এই রিলিফের ব্যাপারে বসিয়ে দিয়েছেন।

চামেলি বলে—ওসব ঝামেলায় বাবা কেন যে গেল ?

চামেলি জানে আশপাশের মানুষগুলাকে। সে দেখেছে এদের স্বরূপ, গোবিন্দ মুন্সী, ত্রিদিববাবু, পুটু কেরানী—এই পটলার দলই রিলিফএর জিনিসপত্র গুদামে তুলছে। হিসাব রাখছে।

তরুণবাবুর মতো লোকও সেখানে আজ যায় নি। তরুণবাবুকে দেখেছে ডাক্তারদের নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরতে। তরুণবাবুর রিলিফের ব্যাপারে এই অনুপস্থিতিটাই চামেলিকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাছাড়া দেখেছে মণি দত্তকে রিলিফের কর্তাদের আশে পাশে ঘুরতে। চামেলির কেমন ভালো লাগে না। তাই এই কথাটা বলেছিল।

মলিনা মেয়ের দিকে চোখ থাকে। চামেলির ওই এক স্বভাব। কোনো কিছুকেই ঠিক ঠিক ভাবে মেনে নেবে না। সব তাতেই ওর কথা বলা চাই।

মলিনার কাছে এর মধ্যে খুহু পিসী, নোটন, জগদীশের বউ আরও দুচারজন এসেছে।

খুহুপিসী বলে—কেন বাছা, এতলোকের মুখের অন্ন পরনের বস্ত্র দিতে হবে ইকি যে সে কাজ, পুণ্যির কাজ।

মলিনা এদের কথা শুনেছে। জগুর বৌ গলা নামিয়ে বলে,

—বুঝলে দিদি, কত বড় মান খাতিরের কাজ, জেলার কত্তা হেন ব্যক্তি কিনা মশায় মশায় করছে।

খুদুপিসী কথাটা লুফে নেয়—তা আবার বলতে।

গলা নামিয়ে খুদুপিসীই বলে—শুনছি উপরিও বেশ আছে বৌ, তা এই বাজারে যা পারিস দেখেশুনে নিতে বল ভাইপোকে।

মলিনা কি ভাবছে।

নোটন দাঁড়িয়েছিল। নোটন এককালে চাষবাস করেছে ভালোভাবেই! তরি তরকারী বিক্রি করে দুপয়সা করেছিল। নোটন এসেছিল মাঠান্‌কে কৃষিক্ষেতের জন্য তদ্বির করতে। সে সুযোগ খুঁজছে।

খুদু বুড়ির দল যাবার আগে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়,

—তালে কাডের কথা বলছি বিভূতিকে। আর কাড পিছু যা লাগে—

দত্তর বৌও সায় দেয়—তা তো দিতে হবে বাছা। তাই বলছিলাম 'বিভূতিকাকা যখন আছে সব হয়ে যাবে।

খুদুপিসী কানে কানে শোনায়—চিনি বস্তা খানেক সরিয়ে আন। তবু একাদশী বার তিথি আছে। নগদ পয়সায় দিবি। বুঝলি বৌ, ওই মণিটা একেবারে চশমখোর, চামার, চিনিতে কেবল ধুলো—স্বোয়াদ নাই।

ওরা চলে গেল। মলিনা মনে মনে কথাটা ভাবছে। ওরা তার সামনে কি বিচিত্র একটা জগতের খবর দিয়ে গেল। সে জগৎ অনেক সম্ভাবনায় ভরা, পুটু কেরানী ত্রিদিববাবুকে দেখছে। ওরা অনেককিছুই পেয়েছে। পুটু সামান্য চাকরি থেকে পুকুর বাগান জমিজারাত করেছে, আর বিভূতিবাবু এতদিন পড়াশোনা করে স্কুলের চাকরি করে দুকাঠা জমি কিনতে পারে নি। বাড়িটার একটা ঘরও পাকা করতে বলেছিল মলিনা তাহলে বান বরষায় এমনিভাবে হাটের মধ্যে

পড়ে থাকতে হত না। সে সব কিছুই পারে নি। মলিনা শুধু অভাব আর অভিযোগের মধ্যেই বাস করেছে। একটা মাত্র মেয়ে চামেলি, তাকেও পাত্রস্থ করতে পারে নি।

—মা ঠান্!

নোটন ফাঁকা পেয়ে এগিয়ে এসে মলিনাকে ভবিযুক্ত হয়ে প্রণাম করে পায়ের কাছে দুটো টাকার নোট নামিয়ে দিতে মলিনা একটু অবাক হয়।

—কিরে নোটন? টাকা?

নোটন ততক্ষণে ট্যাঁক থেকে দোমড়ানো দরখাস্তখানা বের করে বলে—মাস্টারমশাইকে একটু বলে দেবেন খুড়িমা, কৃষিঋণএর টাকা না পেলে পথে দাঁড়াতে হবে। উনি লিখে দিলে হয়ে যাবে উটো।

নোটন ইতিউতি করে জানায় কুণ্ঠিতস্বরে—এখন বেশী কিছু নাই। দেখছেন তো বিপদের সময়, ঋণ পেলে তখন কিছু দিয়ে যাবো মিষ্টি খেতে।

অর্থাৎ পথটা দেখা যাচ্ছে যেপথে দিন বদলাতে পারে। মলিনাকে খুদুপিসী ও এমনি কথা বলেছিল। মলিনার কেমন হাত কাঁপে টাকা দুটো তুলে নিতে। মালক্ষ্মী বলে কথা—মাটিতে ফেলে রাখতে নেই। হাওয়ায় উড়ে যাবে।

মলিনা টাকা দুটো প্রকম্প হাতে তুলে নিল। প্রথমে একটু খারাপই লাগছিল ওটা নিতে। কিন্তু মনে পড়ে সকলেই এমন প্রণামী নিয়ে থাকে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপারই। মলিনা নোটনের কথায় বলে,

—সন্ধ্যার দিকে আসিস বলে রাখবো।

নোটনও দেখেছে গিন্নীমা টাকাটা নিয়েছে, অর্থাৎ পূজো দেওয়া নিছক ব্যর্থ হবে না। সেও খুশিমনে ফিরে আসে সম্মতি জানিয়ে।

ব্যাপারটা চামেলির নজর এড়ায় নি।

কলেজে পড়ে সে। বাইরের সমাজে মিশে মনটা তবু উদার,

আর আজকের দিনের এই নোংরামির পরিচয়ও কিছুটা জানে। তার মাকেও ওই টাকা নিতে দেখে চামেলি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে। ও জানে গরীব মাস্টার গিন্নীর পক্ষে এমনি লোভ সামলানো কঠিন।

বৈকাল গড়িয়ে আসছে। গাছগাছালির মাথায় গাঢ় হলুদ রোদ মলিন বিবর্ণ ফিকে ফিকে হয়ে আসছে। সূর্য সারাদিন তেতেপুড়ে আর আকাশের এমাথা থেকে ওমাথা অবধি ঘুরপাক দিয়ে ক্লান্ত, পাখিগুলো কিচমিচ করে, ওদের ঝগড়া যেন বেড়ে চলেছে, কি নিয়ে তার ঠিকানা নেই। আর মানুষগুলোও অকারণেই কলরব করছে।

চামেলি বাইরে এসে একটু ফাঁকায় দাঁড়িয়েছে, তার এই পরিবেশ বিশ্রী লাগে। ক'দিনই মানুষের সম্বন্ধে চামেলির মনে বিতৃষ্ণা এসেছে, মনে হয়েছে দুঃখ অভাব এদের ঘোচানোয় কারোও ইচ্ছা নেই, যা আছে সেটা হচ্ছে ভান মাত্র। যাতে করে হানাহানি লেগেই থাকে—আর সেই সুযোগে মাত্র কিছু লোক সুবিধা পায়।

তার মাকেও দেখেছে—ক'দিনে সেও বদলে গেছে। রিলিফের বাঁটোয়ারা নিয়ে নিচের কলরবটা শুনছে, একপাল কুকুর যেন এঁটো পাতার শরিকানা নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে। চামেলির ঘেন্না হয়। ওর বাবাকে সে ওই নরকের থেকে সরে আসতে বলবে। তরুণকে দেখেছে সে ওই ভাগাভাগির ব্যাপারে নেই। ও বেছে নিয়েছে সেবার ব্যাপারটাই। তবু সেই কাজে কিছুটা করার আছে। মায়ের এই ব্যবহারটাতে বিস্মিত হয়েছে চামেলি।

বিভূতিবাবু এতক্ষণ নিচের গুদামগুলোর, না হয় নৌকাঘাটায় মাল-এর কাছে ছিলেন। দেখেছেন ওরা মাল খালি করেছে, আরও অনেক কিছুই দেখেছেন। আরও মালপত্র আসবে। কাল সকাল থেকে রিলিফের কাজ শুরু হবে।

বিভূতিবাবু কথাটা ত্রিদিববাবুকে বলতে চেষ্টা করেছেন।

—এসব কি হচ্ছে প্রেসিডেন্টবাবু?

ত্রিদিববাবু গুদামের পাশে অফিসঘরে বসে আছেন। ইতিমধ্যে পুটু কেরানীও ফিরে এসেছে ঘাট থেকে। ওদিকে পটলাও যেন অনেক পরিশ্রম করে হাঁপাচ্ছে বসে বসে। দু'একবার মণি দত্তকেও দেখা যায়। বিভূতিবাবু ঠিক বুঝতে পারেন না ওদের এই কর্মব্যস্ততার কারণ।

ত্রিদিববাবু বিভূতিমাস্টারের কথায় যেন অবাক হবার চেষ্টা করেন।

—কি হ'ল আবার?

পুটু জানে বিভূতিমাস্টারের সত্যি কথা বলার সাহস নেই; পুটু কেরানী পটলার মধ্যে চোখাচোখি হয়ে যায়। ত্রিদিববাবু ওদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ব্যাপারটা জানে সে। কয়েক বস্তা মাল আগেই সরে গেছে। বিভূতিবাবু আমতা আমতা করে।

—মানে, মালপত্র ঠিক ঠিক তোলা হয়েছে কিনা দেখেছেন?

পুটু কেরানী জবাব দেয়—ওসব ঠিক আছে মাস্টারমশাই। নিন, স্টকবই এ সই করে দিন। ওসব ভাবতে হবে না।

ত্রিদিববাবুও বললেন—হ্যাঁ, হাঁ। দেখবেন সবাই যেন লিষ্ট মত পায়। টিপসই নিয়ে নেবেন নামএর এগনেস্টে। সই করে দিন খাতায়।

বিভূতিমাস্টারের বুক কাঁপে। এ কি জালে জড়িয়ে পড়ছেন তিনি। স্কুলের মাইনের খাতায় যা লেখেন তা পান না এখনও। সেটা তবু সইতে হয়। কিন্তু এখানেও সেটা করতে হবে ভাবেন নি। অথচ সই না করলেও নয়।

পটু কেরানী-পটলা-ত্রিদিববাবু চেয়ে আছেন ওর দিকে। বিভূতি-মাস্টারের সাধ্য নেই ওদের মুখের উপর কথা বলার। পুটু বলে, —ওসব ঠিক আছে, নাহয় গুদামে গিয়ে বস্তা মিলিয়ে নিন।

সে অনেক ঝামেলা। ত্রিদিববাবুকে চটাবার সাহস তার নেই, বিভূতিবাবু কি ভেবে সই করে দিলেন খাতায়। মালের আইটেম-গুলোর হিসাব দেখলেন মাত্র। কিন্তু তা খাতা কলমেই, আসলে কি আছে ভগবান জানে।

ত্রিদিববাবু খুশী হয়—ব্যস। তাহলে পুটু, লেগে যাও কাল থেকে। পরোপকার বলে কথা।

হঠাৎ তরুণকে ঢুকতে দেখে ওরা চুপ করে গেল। পুটুও স্টক বইটা কৌশলে সরিয়ে নিয়েছে। পটলা এই সুযোগে বের হয়ে গেল। তরুণ লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। বিভূতিবাবু চুপ করে বসে আছেন।

তরুণের এই অতর্কিত প্রবেশ ওদের কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে তা তরুণ কেন বিভূতিবাবুও বোঝেন।

তরুণ এসেছিল ডাক্তারদের ব্যাপার নিয়ে। তাই জানায় সে,

—আর একটা ঘর ওঁদের খুলে দিলাম। দু চারটে ইমার্জেন্সী পেসেন্টকে রাখবেন ওঁরা। আর এদিকের অবস্থা খারাপ—কলেরা কেস কয়েকটা হয়েছে।

ত্রিদিববাবু চমকে ওঠেন সে—কি হে ?

—আজ্ঞে। তাই ওঁরা বলছিলেন কিছু পেসেন্ট যতো শীগ্রী হোক সরাতে হবে এখান থেকে। আর লোকজনদেরও জানিয়ে দিন এখান থেকে সরে যাক। নিজেদের বাড়িতে নাহয় কোথাও অন্যখানে যাওয়াই নিরাপদ। ভিড় জমে থাকলে বিপদ বাড়তেই পারে।

তরুণ কথাগুলো বলেই চলে গেল, ওর জানানো দরকার সেই কাজটাই করে গেছে।

ত্রিদিববাবু ভাবনায় পড়ে—তাই তো হে পুটু এসব কি ব্যাপার ? বলো না বাপু ওদের চলে যেতে, শেষকালে আমরা যে মরবো। কলেরা বলে কথা।

পুটু বলে—তা সত্যি। একবার তোড়জোড় করে রক্ষাকালীর পুজোও দিই স্যার।

—যাহয় করো বাপু। ত্রিদিববাবু আমতা আমতা করে।

পটলা আবার ঘরে এসে ঢুকেছে। পুজোটুজো মানেই কিছু আমদানির যোগ। তাই পটলা বলে,

—সেই ভালো স্যর। দেবদেবীর পূজো দিই।

বিভূতিবাবু বের হয়ে আসছেন। বেলা পড়ে আসছে। ওদিকে চত্বরে তখনও লোকজন তর্ক করছে। কচকচানির শব্দ ওঠে। রিলিফের কার্ড নিয়েই বখেরা—কে নাকি গুষ্টিসুদ্ধ কার্ড করিয়েছে। কাকে পুটু কেরানী কার্ড দেয় নি। কে কৃষিঋণের টাকার জন্য জামিনদার খুঁজছে। অবশ্য জামিনদার হতে চায় মণি দত্ত, তবে তাকে টাকাতে এক আনা বখরা দিতে হবে।

জগদীশ বলে—ওটা নাকি খুব বেশী। পুটু নিজে টাকতি তিন পয়সা নিয়ে জামিনদারী করছে।

বিভূতিবাবুর মনে হয় শুধু ওদের অবস্থা কলে পেষাইকরা আখের মতো। ছিবড়ে হয়ে গেছে তবু পেষাইপর্ব চলেছে নানা ছাঁদে।

—মাস্টার মশাই!

বিভূতিমাস্টার কি ভাবছেন। রোগ জ্বালা, কলেরাও শুরু হয়েছে। এখানে এই ভিড়ের মধ্যে থাকা ঠিক হবে না। তার পাকা ঘরখানা তবু দাঁড়িয়ে আছে। কিছু টাকা পেলে সেই ঘরখানাই সাফ সুতরো করে চলে যেতে পারেন। যাহোক করে কিছু বাঁশের ঝাটির বেড়া দিয়ে আব্রু রক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যেতো। কিন্তু গোল বেধেছে টাকার জন্যই। কৃষিঋণ বা গৃহনির্মাণ ঋণ দেবার কথা শুনেছেন, কিন্তু কবে সেটা আসবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। ততদিন এই নরকেই থাকতে হবে, উদ্ধারের কোনো আশাই নেই।

—মাস্টারমশাই!

কে এগিয়ে আসে। জায়গাটা থমথম করছে। ঝাঁকড়া তেঁতুল-গাছের ডালপালার ছায়া লেগেছে। আলোর বদলে ছায়া ছায়া অন্ধকারনামা ঠাঁই।

বিভূতিবাবু দাঁড়ালেন।

পটলা এগিয়ে আসে ঠাঁইটা শুধু প্রায়ান্ধকারই নয়—নির্জনও।

আবছা আঁধার ভাবটা পটলার চোয়াড়ে মুখে কেমন শিরশিরানি ভাব এনেছে, ওর স্বভাবের সঙ্গে ওই কালো কালো আভাসটার খুব নৈকট্য আছে। বিভূতিবাবুর মুখেও অমনি আধার ছলছল। পটলা পকেট থেকে একটা খাম বের করে বিভূতিবাবুর পাঞ্জাবির বুকপকেটে দিয়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে,

—ওটা একটু দেখবেন স্যার। মানে প্রথম দফায় ওই রইল পরে আবার দেখা যাবে।

বিভূতিবাবু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না।

—কি হে ওটা ?

পটলা হাসছে, ওর তোবড়ানো গালে মুখে হাসির বিষনীল ভাব মাখানো। মদ খাওয়ার ফলে ঝুলেপড়া পাতার নিচে চোখদুটো পিটপিট করে, পটলা জবাব দেয়,

—সামান্য কিছু মানে ইযে আর কি ? চলি স্যার।

পটলা ওকে ভাবতে সময় দেবার জন্যই সরে গেল। আড়ালে গিয়ে সে চেয়ে দেখছে মাস্টারকে। ওদের এসবে অভ্যেস নেই—তাই ধাত বশ করাতে সময় লাগবে। ওরা আবার অকারণেই ফোঁস করে ওঠে সততা নীতি-টীতির কথা কপচায়।

পটলা তাই সরে এসেছে সামনে থেকে। একাই দেখুক টাকা-গুলো, আদিম মনের লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ঘাত হেরে যাবে বিভূতিমাস্টার—তা জানে পটলা।

টোপ ওকে গিলতেই হবে, হাসছে পটলা আড়ালে। বিভূতিবাবু থাম খুলে টাকাগুলো দেখেছে, দেখছে।

মুখ চোখে একটা পরিবর্তনের কাঠিন্য জাগে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যই। কি ভেবে এদিক ওদিক চেয়ে টাকাগুলো বিভূতিমাস্টার পকেটে পুরে নিল্প সাবধানে। নাঃ কেউ দেখতে পায় নি।

তবু এটা কেমন ভয়ের ব্যাপারই। ভয়! বিভূতিবাবুর মনে হয় ঘরবাড়ি সাফ করিয়ে সরে যেতে পারবে।

পটলা দেখছে আড়াল থেকে। বুড়ো শিবের মন্দিরের ভাঙা দরজার আড়াল থেকে সবটাই লক্ষ্য করেছে। মাছ ধরার কথা মনে পড়ে। বেশ ফুৎ করে টোপ ফেলে দিয়ে বসে থাকে। রুই কাতলাগুলো টোপ খায় আর টোপের সঙ্গে গিলে ফেলে বড়শীটাও। সেটা গলায় গেঁথে বসে যায়। বড়শীর পরই আসে সুতো। ডাঙায় তোলবার ব্যবস্থাও হয়ে যায়। শুধু টোপ থেকেই এতো। সেই টোপ গিলিয়েছে সে।

—ধ্যাত্তেরি।

পিছু হটতে গিয়ে পটলা টাউরি খেয়ে মন্দিরের বাবা বুড়োরাজের ঘাড়েই পা দিয়েছে। কালো পাথরটার গায়ে যুগযুগান্তের সিঁদুর চন্দনের ছাপ। ফুল বেলপাতা পচার গন্ধ উঠছে।

ঠাকুরের গায়ে পা দিয়েছে। পটলা নমস্কার করে—হেই বাবা! পাপ নিও না বাবা! বাবা! শালা পাথর কিনা বাবা। ধম্মো!

হাসছে পটলা—ধম্মোকে ওরা পাথরই করে তুলেছে। সুতরাং পেন্নাম করে লাভ কি।

—বিভূতিমাষ্টার! মাষ্টার শিক্ষক দেশসেবক!

পটলা হাসছে। সেও তাহলে মহা দেশসেবক। শ্লা খচ্চর। অনেকক্ষণ মাল জোটে নি। মণি দত্তের কথা মনে পড়ে। টাকাগুলো তারই দেওয়া, অবশ্য বিনা স্বার্থে—মাগনা দেয় নি। ক বস্তা মাল সটকেছে আগেই, তারই দাম।

বুড়ো মাষ্টারকে ভাগ দেবার পর এখনও বেশ টাকা রয়েছে। পুটু ত্রিদিববাবু আর সে। পটলার খুব তেষ্টা পাচ্ছে। তবু তেষ্টা নয় আরও অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। মণি দত্ত শ্লা কঞ্জুস—বুড়ো ভাম। ওর বাঁজা বউটার কথা মনে পড়ে পটলার। বৌটা তাকে দেখে হাসে। কেন হাসে? ইয়ার্কি!

বিভূতিমাষ্টার পালাচ্ছে। পটলার হাসি আসে।

কুমারী মেয়ে চুরি করে প্রেম করলে এমনি লুকোছাপা দিয়ে রাখে, সতীত্বের মহত্ত্ব হারাবার ভয়ে। বিভূতিমাষ্টারেরও অমনি ভয় করছে নির্ঘাত। তবুও সে আসবে তা জানে। এসে গেছে। পুটু কেরানীর বুদ্ধি আছে। জোর বুদ্ধি ধরে সে। বেঁচে থাক বাবা পুটু। মাল না খেয়েই এতো বুদ্ধি ধরে এটা সাংঘাতিক চিজ। স্রেফ তামুক টেনেই মেয়েছেলের গায়ে গতরে হাত দেয ওই পুটু। ওসব তার কাছে যেন জল ভাত।

বিভূতিবাবুকে ওরা যেন অথৈ জলে ঠেলে ফেলেছে। টাকাগুলো পকেটে রয়েছে তাঁর। প্রথমে ওগুলো ছুঁয়ে চমকে উঠেছিলেন তিনি। পটলা তাকে টাকাগুলো কেন দিয়েছে জানে। পটলাই এ কর্মকাণ্ডের পিছনে আছে।

একা নেই, একটা চক্র আছে। তাতে কারা রয়েছে তাও জানতে বাকি নেই বিভূতিবাবুর।

তরুণও দেখেছে বিভূতিবাবুকে। লোকটা যেন বদলে গেছে ক'দিনেই। আজও ওই ত্রিদিববাবু পুটুর সঙ্গে কি কথা বলছিল। মনে হয় কি যেন অসুবিধায় পড়েছেন তিনি। ওদের সামনে কথাটা বলতে পারলেন না—তবু কোনো বিষয়ে যেন সাহায্য চান। এই ভেবেই তরুণ প্রকাশ্যে কোনো কথা না বলে বের হয়ে এসেছিল।

তাই এই সময় ওই পথের ধারে বিভূতিবাবুকে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তরুণ এগিয়ে আসে।

—মাষ্টারমশাই!

বিভূতিবাবু আনমনে ওই সব কথাগুলো ভাবছিলেন। টাকা পেয়ে গেছেন, পঞ্চাশ টাকা। সারা মাস দুটো ছেলে ঠেঙিয়েও পঞ্চাশ টাকা আসে না, একেবারে আপসে এসে গেছে। আরও

আসবে। তাছাড়া তিনিই পাকাপাকিভাবে হেড মাষ্টার হয়ে যাবেন। কমিটির কিছু মেম্বার তরুণের দিকেই রয়েছে। কিন্তু ত্রিদিববাবু তাঁকে অভয় দিয়েছেন। আর তরুণের সম্বন্ধে নানা কথাও বলেছেন।

তারও মনে হয় তরুণ তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চাইছে। ও বোধহয় জানতে পেরেছে কোনো গোপন সংবাদ। সেই কারণেই বিভূতিবাবুর মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। তিনি চাইলেন ওর দিকে।

তরুণ ওর মুখের ওই ঠাণ্ডা উত্তাপহীন ভাবটা দেখেছে। আর তাতে অবাক হয়েছে সে। বিভূতিবাবু শুধান,

—কি ব্যাপার?

তরুণই জানতে এসেছিল তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। কিন্তু উল্‌টে তাঁকেই ওই প্রশ্ন করতে দেখে তরুণ অবাক হয়। বিভূতিবাবু কি যেন লুকাতে চান তার কাছে।

তরুণ জাবাব দেয়—না। এমনিই। তাহলে কাল থেকেই রিলিফ-এর কাজ শুরু হচ্ছে?

মাথা নাড়েন বিভূতিবাবু। তরুণের এই প্রশ্নে খুব খুশী তিনি হন নি।

তরুণ বলে—এদিকে এপিডেমিক না শুরু হয়। খাবার নেই, ওষুধ নেই, আশ্রয় নেই।

বিভূতিবাবুই যেন এসবের জন্য দায়ী—তরুণের কথায় এমনি একটা আভাস খুঁজে পান তিনি। তাই বলেন,

—কি করা যাবে বলো। অদৃষ্টে যা আছে হবে। চলি।

বিভূতিবাবু চলে গেলেন। টাকার কথাও বললেন না। রিলিফ-এর কাজ, তার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করলেন না। তরুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বিভূতিবাবু চলে গেছেন তাঁর আস্তানার দিকে।

তাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে। আর তরুণকে কেমন

সহ্য করতে পারছেন না। তরুণ বোধহয় সেটা বুঝতে পেরেছে। একাই দাঁড়িয়ে আছে সে।

ওর হাতে কয়েকটা ওষুধ—বেদান্ততীর্থের নাতির ওষুধগুলো সেই-ই পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল, বিভূতিবাবুর সঙ্গে দেখা হতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বিভূতিবাবু চলে গেছেন। ঘন তেঁতুল গাছের নিচে বৈকাল সন্ধ্যার মাঝ বেলার থমথমে বিষণ্ণ অন্ধকার নামছে। আলোটুকু মুছে আসছে। হঠাৎ চামেলিকে দেখে দাঁড়াল তরুণ। মেয়েটাও সব ব্যাপারটা দেখেছে। তার বাবার ভাবান্তরটুকুও ওর দৃষ্টি এড়ায় নি। চামেলি দেখেছে তার মাকেও। এর মধ্যে স্তাবকতা আর সামান্য পয়সার স্বপ্ন ওদের স্বরূপকে বদলে দিয়েছে। বিশ্বাস ছিল তার বাবার উপর। কিন্তু বাবার পকেটে ওই শয়তান পটলা বোধহয় টাকাই হবে দিয়ে চলে গেল। বাবা তরুণবাবুর সঙ্গেও ভালো করে কথা কইল না। চামেলির তরুণ অনুসন্ধানী মন এতে বিস্মিত হয়েছে।

—তুমি!

চামেলি তরুণকেই শুধোয়—বাবা কি বললেন?

তরুণ চামেলির কথার স্বরে একটু অবাক হয়। ও কি যেন ইঙ্গিত করছে। হাসছে মেয়েটা। ফর্সা নিটোল দেহ, ঢেউজাগা পুকুরের জলের সাড়া জেগেছে। চামেলি বলে,

—বাবার পজিসন বেড়ে গেছে কিনা, তাই একটু চেনজ্‌ড ম্যান।

তরুণ কথা বলল না, তবে চামেলির চোখেও বিভূতিবাবুর এই পরিবর্তনটা ধরা পড়েছে। চামেলি বলে,

—ওঁকে এসবের মধ্যে না আনাই ভালো ছিল।

তরুণ চুপ করে থাকে।

চামেলি বলে—শিব গড়তে গিয়ে সাপই জন্মাচ্ছে। দিনই বদলে গেছে মাষ্টার মশায়, আবহাওয়াও। তাই অমৃত বৃক্ষ পুতুন—তাতে অমৃত ফল ফলবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আপনিও শিক্ষক—কি শিক্ষা দিতে পেরেছেন?

চামেলির কথায় অবাক হয় তরুণ। এরা নোতুন যুগের ছেলেমেয়ে, এদের কথায় প্রতিবাদ আর ব্যঙ্গের সুর। চোখের সামনে মানুষের রাজ্যজোড়া লোভ নীচতার ছবি দেখে এরা মনে মনে কোথায় মরীয়া হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদে এরা মুখর—সোচ্চার আর দুর্বার হয়ে উঠছে।

তরুণ বলে—বন্যা এ নয় চামেলি, এই বন্যা আমাদের সবকিছুর বাঁধন ভেঙে দিয়েছে, সব শ্রীকে বিষপলির অতলে তলিয়ে দিয়েছে।

হাসছে চামেলি—তাই নাকি! হয়তো সত্যি। এখনও অনেক কিছুকে মেনে চলেছি। অনেক নীতি অনেক সংস্কারকে। কিন্তু দেখছি চোখের উপর সেই নীতির ধারকদের স্বরূপও। সেদিন ব্যর্থ রাগে রোষে যদি ওই সংস্কার আর আদর্শকেই লাথি মেরে চুরমার করতে চাই, কে দোষী হবে জানেন? পরোক্ষ ভাবে দোষী ওঁরাই।

চামেলি ওর হাতে ওষুধগুলো দেখে বলে—আপনি সরেই রইলেন না ওরাই আপনাকে সরিয়ে দিল?

হাসে তরুণ—ওঁরাই এই দায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন আমায়।

চামেলির মুখে ভাবনার ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। বলে সে,

—চিন্তার কথা। আপনাকে ওরা চিনতে ভুল করে নি।

হঠাৎ বিজয়াকে এই দিকে আসতে দেখে চামেলি চাইল। বিজয়াবৌদিকে এর আগেও দেখেছে। গ্রামের পথে বিশেষ বের হতো না। ওর রূপের হাঁক ডাক ছিল, আর সেটাকে সে ঢেকেই রাখত সঙ্গোপনে—সযতনে।

আজ সেই লজ্জাবতী মেয়েটিকেও এই হাটের মধ্যে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে, আর দায়ে পড়ে পথেও বের হতে হয়েছে।

বিজয়াকে এই দিকে আসতে দেখে অবাক হয় চামেলি।

তরুণের খেয়াল হয়—এ্যাই যাঃ, ওষুধের কথা ভুলেই গেছলাম বৌঠান।

চামেলি তরুণের দিকে চেয়ে আছে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। তরুণ কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বলে—ফটিকের ওষুধ। ডাক্তারবাবু দিয়েছেন।

বিজয়া ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। চোখে মুখে ওর ব্যাকুল দৃষ্টি, মাথার ঘোমটা খুলে পড়েছে। ডাগর দুচোখ ছলছল। বিজয়া বলে,

—ফটিক কেমন করছে ঠাকুরপো।

চামেলিও জানে খবরটা। তার কণ্ঠেও ব্যাকুল স্বর ওঠে।

—তাই নাকি!

বিজয়ার সারা দেহ কি অজানা ভয়ে কাঁপছে। অসহায় মেয়েটি কান্না ভাঙা স্বরে বলে—কি হবে ঠাকুরপো! উনি তো চুপ করে বসে আছেন। বৃদ্ধ স্থবির মানুষ—

তরুণ বলে—আপনি যান, ডাক্তারকে নিয়ে আসছি।

ও চলে গেল হন্তদন্ত হয়ে। চামেলি কি ভেবে বলে—চলুন বৌদি, আমিও যাই।

বিজয়ার একা চলবার সামর্থ্যটুকুও নেই। চামেলির ঘাড়ে ভর দিয়ে সে ভাঙা এঁদো বাড়িটার দিকে এগোলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে থমথমে ভুতুড়ে বাড়িটায়, কারা কাঁদছে। আবছা অন্ধকার বিদীর্ণ করে বমি করার শব্দ ওঠে। জীর্ণ বুকের হাড় পাঁজরার অন্তর থেকে ওই বমির শব্দটা উঠছে আর্তনাদের মতো।

চামেলির মনে হয় এ যেন মৃতের জগৎ।

এখানের অন্ধকার জোড়া রূপটা সামগ্রিক ভাবে সমাজেরই পচা থিকথিকে পরিবেশের মতোই হৃদয়হীন যন্ত্রণায় ভরা। কোথাও কোনো আলো নেই।

মলিনা স্বামীকে ঢুকতে দেখে চাইল। বিভূতিমাষ্টার বলে,

—কালই বাড়িটা সাফসুতরো করিয়ে নিই, এখান থেকে উঠে যাবো। মলিনার মনে বার বার সেই কথাটাই এসেছে। এখানে এত লোকের চোখের সামনে থাকা বিশ্রী লাগে। তাই বলে মলিনা,

—সে তো ভালোই। কিন্তু বাড়ি সাফ্ সুতরো করে বেড়ার পাঁচিল আগল দিতে হবে, টাকা পয়সা কোথায় ?

মলিনার মনের জমা অভিযোগগুলো এমনিভাবে সময় অসময় ঠেলে বের হতে চায়। তার বরাত যে নেহাত মন্দ এই কথাটা ছুতোয় নাতায় বলে সে।

মলিনার মনের ক্ষোভ জমে উঠেছে এই চিরন্তন দারিদ্র্যকে ঘিরে। তাই আজও শোনায় সে,

—এমনি বরাত আমার যে একটু শান্তিতে নিরিবিলিতে থাকতে পাবো ? হাহাকার কোনোদিনই ঘুচবে না। শিক্ষিত ! ছাই।

বিভূতিবাবু স্ত্রীর এই গঞ্জনা-অনুযোগ শুনে এসেছেন অনেকদিন থেকে। তিনি যে একেবারে অপদার্থ আর পুরুষ নামের অযোগ্য এই সংবাদটা মলিনা বহুবারই কথায় কথায় জানিয়েছে তাকে। তার শিক্ষা—ডিগ্রীর কোনো দামই নেই। তার তুলনায় মণি দত্ত অনেক দামী পুরুষ, টাকা আছে তার। এইটা এতকাল শুনে এসেছেন। জবাব দিতে পারেন নি।

আজ বিভূতিবাবু মনে মনে ভাবেন—এবার মলিনার অনুযোগের কিছুটা জবাব দিতে পারবেন তিনি। বিভূতিবাবুর পকেটে সেই টাকাগুলো রয়েছে। বিভূতিবাবু বলেন,

—ওসব ব্যবস্থা করে এসেছি। কালই পটলের লোকজন গিয়ে কাজে লাগবে।

মলিনা যেন এই প্রথম স্বামীর বীরত্ব আর পুরুষকার দেখে খুশি হয়েছে। তবু কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। শুধোয় সে,

—সত্যি !

বিভূতিবাবু পৌরুষ দৃপ্ত গম্ভীর কণ্ঠে শোনান,

—হ্যাঁ। আর টাকাগুলো রেখে দাও।

মলিনা আরও অবাক হয়। সত্যি তার চমকাবার পালা। টাকাগুলো হাত পেতে নিল। মলিনাকে আজ অনেকটা চুপসে

যাওয়া বেলুনের মতো দেখায়। তার সামনে বিভূতিবাবু নিজেকে অনেক বড় বলেই মনে করেন আজ।

মলিনা ওর কাছে মিন্‌মিনে সুরে অনুরোধ করছে,

—নোটন এসেছিল। রিলিফের কার্ড নেই ওর ভাই-এর নামে, তুমি বাবু একটু দেখেশুনে কার্ডগুলো ওর করিয়ে দিও।

বিভূতিবাবুরও স্ত্রীর কাছে আজ দাম বেড়ে গেছে। আর সেটা এই পদাধিকার বলে তা জানতে পেরেছেন তিনি। টাকা, সম্মান, সামাজিক মর্যাদা এমনকি গিন্নীর কাছে এই স্বীকৃতি বিভূতিবাবুর ধারণাকে বদলে দিয়েছে। এতদিন তিনি কুড়িয়েছেন ঘৃণা অবজ্ঞা, ঘরে বাইরে তাই দেখেছেন তাঁর চারিদিকে।

আজ! নিজের মনেই এই পদটাকে তিনি ভালোবেসে ফেলেছেন। আর এই ভাবান্তরটা যে এত সহজেই আসবে—তা ভেবেও মাঝে মাঝে অবাক হন।

কিন্তু চামেলি বিশ্বাস করে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির দুর্বলতা এইখানে। বঞ্চিত-ক্ষুব্ধ আর লোভী মানুষগুলো এমনি সহজেই পণ্যে পরিণত হয় বিকিকিনির হাটে। চামেলির কোথায় বেধেছে। চোখের সামনে দেখেছে চামেলি বেদান্ততীর্থের অসহায় অবস্থা, ফুলের মতো ছোট ছেলেটা জ্বরে শুষছে, এদিক ওদিকে শুনেছে বমির শব্দ, অন্ধকার ঘরে মানুষগুলো অনাহারে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে আছে।

বিজয়াবৌদি নোংরা ঘরটায় দেখেছে একদানাও চাল নেই খাবার নেই। একপাশে কতকগুলো কচুশাক কাটা পড়ে আছে কড়াইএ। ওই কচুশাক সিদ্ধই বোধহয় আজকের খাদ্য ওদের।

চামেলি জীবনের নগ্ন দারিদ্র্যের এই দিকটা এত প্রকটভাবে দেখে নি। চুপ করে ফিরে আসছে। অন্ধকারে কানে আসে অসহায় মানুষগুলোর কথা। ওরা জেনে ফেলেছে কেউ তাদের বাঁচাবার চেষ্টা

করবে না। রিলিফ সাহায্য এসব যা আসবে তা কোনদিকে তলিয়ে যাবে। আর কিছু চলে যাবে অন্ধকারে।

বের হয়ে আসার সময় চামেলির কানে আসে কার খিস্তীর শব্দ।

—বানচোতদের টুটি টিপে শেষ করে দিতে হয়। সব ব্যাটাই চোর—আর হাড়চোষা কুকুর। হারামজাদার দল। দোব এক একটাকে শেষ করে। ওই পটলা—মণে বেনে—পুটু কেরানী ওই বিভ্তি ম্যাষ্টারও জুটেছে দলে। এখন থেকেই ওদের গবেব ঢুকছে মালপত্তর। পটলা শ্লার মাল খাওয়া দেখেছিস ?

কে বলে কাশির ধমক থামিয়ে—

আমরা মরছি, উদের ফূর্তি বেড়েছে হে, শালো জানি না কিছু ? মদ মাস্ আর মণে মাগটাও জুটেছে।

হাসছে অন্ধকারে কে খিক্‌খিক্ করে। চামেলিকে ওরা দেখতে পায় নি। একজন বলে—যা বুলেবো হে। শালো পেসিডেন এবার জববর ঘাটে চার ফেলেছে, ডব্‌কা ছুড়ি হে ওই বিবটি ম্যাষ্টারের ওর দিকেই লজর। খুব তেলাচ্ছে—

চামেলির কানের কাছটা ঝা ঝা করে ওঠে। ওর মুখেই যেন কে একটা থাপ্পড় কষেছে।

চামেলি সরে এল। বেশ বুঝেছে যে জল ঘুলিয়ে গেছে, পাঁক উঠছে। দুর্গন্ধময় পচা পাঁক।

চামেলি ভাবতে পারে নি তাকেও এইসব জঘন্য কথা শুনতে হবে। ওরা আরও অনেক কিছুই আলোচনা করে। চামেলি জবাব দিতে পারে না। মুখ নিচু করে সরে এল।

ওদের ঘরখানার দিকে এগিয়ে যায় চামেলি।

খুপরী খুপরী ঘরে মানুষগুলো ঘ্যানঘ্যান করছে। কে কাঁদছে, তীক্ষ্ণস্বরে কোন মা চীৎকার করে—মর। মর আপদগুলো। যম নেয় না তোদের ?

চারিদিকে শুধু বিরক্তি—রাগ আর যন্ত্রণা।

চামেলি ওদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়াল। বাবা আর মা কি কথা বলছে।

বাবা যে রিলিফের কত্তা হয়েছে আর তার জন্য বাবার খাতির বেড়ে গেছে এ দৃশ্যটা চামেলির চোখে ফুটে ওঠে। বাবা অসময়ে পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে মায়ের হাতে দেয়।

মায়ের চোখেমুখে হাসির আভা। টাকাগুলো মাথায় ঠেকিয়ে মা তুলে রাখল বাক্সে, কোত্থেকে হাতপাখা একটা এনে মা বাবাকে বাতাস করে।

—তেতে পুড়ে এলে, একটু জিরোও বাপু, কতো কাজ এখন ?

চামেলি মায়ের এই ব্যবহারে রীতিমতো অবাক হয়েছে। বাবার সঙ্গে মায়ের এমন মধুর সম্পর্ক সে আগে বড় একটা দেখে নি, মনে হয় কোথায় অদৃশ্য আর একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

চামেলির মনে তখনও সেই জ্বালাটা রয়েছে, তাই শোনায় সে বাবাকে,

—ওই রিলিফ টিলিফের ব্যাপারে তুমি থেকো না বাবা।

বিভূতিবাবু মেয়ের দিকে চাইলেন। তার মনে হয় ওর কথাটার মূল কিছু সত্য রয়ে গেছে। তিনিও খুব খুশী নন এই ব্যাপারে। ভেতরে অনেক গলদ আছে সেটা জেনেছেন। বিভূতিবাবুর স্বাধীন সত্তাও মনে মনে এইসবে থাকতে চায় নি।

তাই মেয়ের এই কথাটার মূল্য তিনি বোঝেন। তবু কোথায় বাধে, হয়তো এক জায়গায় তিনি ভীরু আর লোভীও, নইলে সব জেনে শুনেও একে মেনে নিয়েছেন কেন? ওর চোখেমুখে তাই ভীরুতার কালো ছায়া।

কিন্তু মলিনা ইতিমধ্যে টের পেয়েছে এখানে মধু আছে। আরও সবাই এই ভাবেই দম্‌কা রোজকার করছে, তার স্বামীই বা শুকনো আদর্শের ছোপড়া চুষে থাকবে কেন ?

মেয়ের কথায় মলিনা বাধা দেয়—কেন ? তোর সব তাতেই কথা বলা কেন ? পাঁচজন লোক মানে—গণে ; তাই ওরা বললো—

চামেলি মায়ের এই প্রতিবাদে কঠিন হয়ে ওঠে। মাও বদলে গেছে।

চামেলি বলে—আর কি বলে তা শুনেছো ?

বিভূতিবাবু চমকে ওঠেন চামেলির কথায়। মলিনাই তাঁকে যেন সাহস যোগাচ্ছে। মলিনা বলে—অনেক আজেবাজে কথাই বলবে লোকে।

—আর তাই শুনতে হবে ? চামেলির মনে অসহ্য রাগটা ফুটে উঠেছে।

সে শোনায়—তুমি সব জানো না। শোনো নি। তাই বলছিলাম বাবা ওতে নাইবা থাকলেন।

বিভূতিবাবু নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে করেন মেয়ের সামনে। ও সত্যি কথাই বলেছে। তাঁর প্রতিবাদ করার শক্তি নেই, কিন্তু চামেলির সেই সাহস আছে তাই সে মুখর-সোচ্চার। দরকার হলে আরও কঠিন হতে পারবে সে। বিভূতিবাবুর মনে হয় তিনি সত্যই অপরাধী।

মলিনা ফুঁসে ওঠে—থাম দিকি তুই! দিনরাত অল্ অল্ করে ঘুরছে। পড়া গেছে—শোনা গেছে। আর সবতাতেই সর্দারি। তাই বলছিলাম—মেয়ের তোমার ডানা গজিয়েছে।

চামেলি মায়ের দিকে চাইল। দুচোখ ওর রাগে অপমানে জ্বলছে। বিভূতিবাবু নীরব। চামেলি গলা তুলে শুধোয়,

—থামলে কেন ? বলো—আরও কিছু বলো।

বিভূতিবাবুই ব্যাপারটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করেন—থামো দিকি। দেখছি আমি। যা চামেলি এখন পড়তে বসগে, পরে কথা হবে। যা।

চামেলি সরে গেল, তবে সে যে খুশী নয় এটা তার হাব ভাবেই বোঝা যায়।

মলিনা তখনও গজগজ করছে। মেয়ের কথায় সে খুশী হয় নি। তাছাড়া চামেলি যে তার মুখের উপর এমনিভাবে রুখে জবাব দেবে তাও ভাবে নি।

মলিনা আজ নোতুন কি এক অনুভূতির স্বাদে কঠিন হয়ে উঠেছে। টাকার স্বাদ—প্রতিষ্ঠার মোহ তাকে বদলে দিয়েছে।

চামেলি মা আর বাবার মধ্যে দেখেছে সেই পরিবর্তনটা। মনে হয় চামেলি ওদের কাছ থেকে অনেক দূরেই সরে গেছে। আর তাকে ও এইবার বাইরের লোকের ওই সব হীন মন্তব্য সহ্য করতে হবে। অসহায় রাগে চামেলির সব ভেঙে চুরে তছনছ করে দিতে ইচ্ছে হয়।

মলিনা বলে—হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নে।

বিভূতিবাবু মেয়েকে দেখছেন। চামেলি জবাব দেয়—খিদে নেই।

ঘরের এককোণে ময়লা বিছানার উপর চাদর মুড়ি দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

মলিনা গুম হয়ে থাকে। বিভূতিবাবুর কথা বলার সাধ্যও যেন নেই। তার মনে হয় কোথায় ঝড় ঘনিয়ে আসছে। চারিদিক অন্ধকারে ডুবে গেছে, সেই নিবিড় অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তিনি চলেছেন। আর মাঝে মাঝে দিগন্ত ঝল্‌সে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে—কোথায় বাজ পড়ল।

বিভূতিবাবু যেন স্বপ্ন দেখছেন।

পটলা দমকা রোজগার করেছে, আর দেখেছে এমনি বেশকিছু রোজগার করা যাবে। তাই ভরপেট মদ গিলে এসেছে ওই গোবিন্দ মুন্সীর সঙ্গে।

লোকটাকে সেইই আজ খাইয়েছে, আর ওকে খাইয়ে নিজে যে মাতব্বর এলেমদার সেই কথাটা আরও যেন হৃদয়ঙ্গম করেছে। রাত কত জানে না পটলা। ওর নিজের ঘুপসী ঘরখানায় বসে আছে পটলা। ঘুম আসে না।

রাত জাগা পাখি একটা ডেকে ডেকে থেমে গেল। ওই ডাকটা পটলার নেশাটাকে চাগিয়ে তুলেছে। পটলার মনে হয়—পাখিটাও রাতের অন্ধকারে জোড়া খুঁজে ফিরছে।

তার! তার এতবড় দুনিয়ায় কেউ নাই।—এই গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে সে যেন বন্দী হয়ে পড়ে আছে।

অন্ধকারে পটলা এগিয়ে চলে। নিশুতিপ্রায় বাড়িটা। পুরোনো কালচে বাড়িগুলো অন্ধকারে থমথম করছে। অন্ধকার ওখানে জমাট বেঁধেছে। মন্দিরের কাছে এসে পড়েছে সে।

পায়ে হোঁচট লেগেছে পটলার। চোখ আধবোজা হয়ে আসছিল নেশার ধমকে—দেখেনি চৌকাঠটা।

ধ্যাত্তেরি। শ্লা মহাদেব আর জায়গা পেলে না বাবা?

মহাদেব। রথের মেলার পুতুলের কথা মনে পড়ে। পরনে বাঘছাল—চোখ ঢুলু ঢুলু—গাঁজার কলকে হাতে একটা মূর্তি। ও যেন দিনরাত নেশাতেই ডুবে আছে আর তিনি হলেন দেবতা!

পটলা চাতালে বসে বসেই প্রাকৃতিক কর্মটা সেরে ফেলেছে, কেউ দেখবার নেই—হাসি আসে পটলার। পুরোহিত ওই বুড়ো শিবের মাথায় চানজল ঢালে।

রাতের অন্ধকারে নিজেই যেন পুরুতঠাকুর হয়ে গেছে। যেন চানজল—শান্তিজল ছিটুচ্ছে। বাবা বুড়ো শিবের চরণে সেবা লাগে—এ—এ!

পটলার হাসি পায় ও কথা ভেবে।

মনে হয় অনেকটা হালকা হয়েছে সে। টাকা! দুহাত ভর্তি টাকা আসবে তার। দেবার লোকও আছে। রাতের অন্ধকারে শুধু বস্তা কয়েকটা বের করে দিলেই হবে, নাহয় দু একটা কাপড় কম্বলের গাঁট বের করে দেবে; এক হাতমে লেঙ্গে এক হাতমে দেঙ্গে।

পটলার গলা শুকিয়ে আসছে। আবার সেই উত্তাপটা বাড়ছে—বুকে-পেটে-তলপেটে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে সেই উত্তাপ; অন্ধকারে

হঠাৎ কি যেন দেখেছে সে। ছায়া নয়—আর কিছু! নিটোল শরীর—

হাতগুলো দেখা যায় তারার আলোয়। পটলার নেশা ছুটে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে কি দেখছে।

হঠাৎ সোজা হয়ে ওঠে—অন্ধকারে ঝাঁপি খোলা পেয়ে সাপুড়ের কোনো বুভুক্ষু সাপ ফণা তুলে ধরেছে। বাতাসে দুলছে—ওই সঙ্গে মিশেছে চাপা হিস্ হিস্ গর্জন। পটলা এগিয়ে আসছে, ওর চোখে, সারা মনে তেমনি আদিম আরণ্যক হিংস্রতা আর লিপ্সা।

—কে! পটলা ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে।

সাড়া নেই। ওই আদুড় মেয়েটা ওকে নীরব আমন্ত্রণের ইসারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেও বোধহয় অবাক হয়েছে পটলাকে এখানে দেখে।

মণি দত্ত ক'দিনে বেশ মোটা টাকা লাভ করেছে। তাছাড়া আজও বেশ জববর আমদানি হয়ে গেছে। আর এও জেনেছে মণে দত্ত যে আমদানি-পত্তর এবার জুৎসই হবে। কারণ রিলিফের জিনিস আসছে—চাল গম চিনি গাঁটবন্দী কাপড় কম্বল ইত্যাদি। সে সবের বেশ কিছু অংশ অন্ধকারে বের হয়ে আসবে তার হাতে।

মণে বাড়িতে ফিরে যাবে, কিন্তু গোবিন্দবাবুকে ও জানিয়েছে দোকান এখানেই থাকবে, কারণ এখনও ভাঙা ঘরগুলো সব গড়ে উঠবে না। ভিটির মাটির স্তূপ অনেকেরই পড়ে থাকবে। কৃষিঋণ—ঘর তৈরির ঋণ এসবের টাকা না পেলে অনেকেই বাড়ি তৈরির কথা ভাবতেই পারবে না। ফাঁকা পড়ে থাকবে সব জায়গা। চোরএর ভয় আছে। তাই মণি দত্ত কারবার এইখানেই রাখবে। তাছাড়া, এখানে থাকলে সুবিধাই হবে তার।

মণি দত্ত সাবধানে হিসেব করে পা ফেলে। চতুর-সাবধানী লোক।

রাত হয়ে গেছে। বিভিন্ন খুপরীর মানুষগুলো, সেই আধনেংটা বাচ্চার দল কলরব আর কান্না থামিয়ে এখন দম নিচ্ছে। আবার ভোর থেকে উঠে কলরব শুরু করবে আপদের দল। দুনিয়াতে এসেছে শুধু ওই একমাত্র খিদে নিয়ে। পেটের খিদে আর শরীরের খিদে। সেই খিদে মেটানো ছাড়া তাদের আর করার কিছুই নাই।

মণি দত্ত পুণ্যবান লোক। সকাল সন্ধ্যা হরিনাম করে। মালা জপ করে। অবশ্য বদলোকে বলে—ও ব্যাটা শয়তান, হরিনামের ঝুলির ভিতর আঙুল পুরে কর গোণে আর সুদের টাকার হিসাব করে।

মণে দত্ত অবশ্য হাসে, কারণ ও জানে ওসব অক্ষমের প্রলাপ। তার কাছেই ওই লোকগুলোকে আবার আসতে হবে। টাকাই তার জীবনে মূলমন্ত্র। মণি দত্ত সেটা ভালো করে জেনেছে আর তার জন্য সে অনেককিছু বিসর্জন দিয়েছে।

মণি দত্ত এই মৌকায় কিছু জমিও কিনেছে। ভূষণএর বৌটা পাগল হয়ে গেছে, চিকিৎসা করতে হবে। বাড়ি ঘরেরও দরকার। তাই তার কাছ থেকে ন'কড়ায় ছ'কড়ায় মণি দত্ত বিঘে কয়েক সেরা জমি কিনেছে। আরও দুচার জনের টিকিও বেঁধে ফেলেছে।

টাকা! এইতেই সব বাঁধা। মণি দত্ত এই বন্যা আর প্লাবনে খুশী হয়েছে। মাঝে মাঝে এমনি প্রলয় কাণ্ড ঘটুক, তারাই চড় চড়িয়ে উঠে যাবে উপরে। শশী মোড়লকেই এবার জালে ফেলবে সে। মাত্র দুহাজার টাকার দরে এমন সুন্দর পুকুরটা বিচছে সে। অবশ্য গোপনে, মণি জানে এ খবর বাইরে চাউর হলে ওই পুটু কেরানীই লাফ দিয়ে পড়বে। তাই শশীকে নিয়ে দুএকদিনের মধ্যেই সদরে গিয়ে রেজেষ্ট্রীর কাজটা চুকিয়ে আসবে।

টাকাগুলো গুণছে মণি দত্ত। জাবেদা খাতা খানা খোলা পড়ে আছে।

ওতেই এর হিসাব রয়েছে। টাকা! খসখসে নোটগুলোর ছোঁয়ায়

লোকটার মনে একটা চাপা আনন্দ আর তৃপ্তি জাগে, ওই আনন্দটুকুই তাকে জীবনের আর সব তৃপ্তির কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। এই নিয়ে সব ভুলে আছে মণি দত্ত।

—শোবে না ?

—এঁ্যা! মণি দত্ত ডাকটা শুনে চমকে ওঠে। মনে হয় কে যেন তার কাছ থেকে এই তাড়াবন্দী নোটগুলো ছিনিয়ে নেবার জন্য রাতের অন্ধকারে ঘরে ঢুকেছে। তাই হকচকিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে নোটগুলোকে। পরে খেয়াল হয় দরজাটা বন্ধ। তার বৌই ওদিকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আলো জ্বলতে দেখে ঘুমোয় নি। তাকে ডাকছে।

মণি দত্ত বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়—তুই ঘুমো দিকি। এখন কাজ আছে।

আদুরীর নজর এড়ায় নি ওই শীর্ণ লোকটার টাকার জন্য এই ভালো বাসা আর তাই নিয়ে হ্যাংলামো। আদুরী দেখেছে ওইগুলোই তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর কিছুই সে জানে না। তাই আদুরীকেও সে দেখে নি, পুরুষের স্বাভাবিক চাওয়াটুকুও ওর নেই। আদুরীকে সেইই টাকার লোভে বিক্রি করতেও দ্বিধা করে নি।

মেয়েটার বুকভরা জ্বালা আর অতৃপ্তি। ওর নিটোল পুরুষ্ট দেহের কোষে কোষে কি দুর্বার ক্ষুধা। আদুরী ইচ্ছে করেই লোকটাকে যেন তাতিয়ে তুলতে চেয়েছে বার বার। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। আদুরী ঠকে গেছে নিদারুণ ভাবে। তার মনে হয় লোকটার সাধ্য নেই, পুরুষ নামের অযোগ্য। ওর অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্যই মণি দত্ত টাকা রোজগার করে—টাকা জমিয়ে সব কিছুর ক্ষতিপূরণ করতে চায়। আদুরীর সারা মনে তাই দুঃসহ যন্ত্রণা আর হাহাকার, জীবনে কিছুই সে পায় নি। এমনি করে একটা প্রাণহীন উত্তাপহীন হৃদয়হীন অমানুষের সঙ্গে ঘর করতে সে চায় না।

—কই গো! রাত হয়েছে। আদুরীর এই কণ্ঠস্বর কেমন নরম

আর কাঁপা কাঁপা। বোধ হয় মনের অসহ্য একটা জ্বালা ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলে উঠছে হাওয়াকাঁপা প্রদীপের শিখার মতোই। কাপড়টা বুকে থেকে সরে গেছে।

মণি দত্তের হুঁশ নেই। বুড়িমা দোকানঘরে গিয়ে শুয়ে থাকে। সারারাতই ঘুম নেই বুড়ির চোখে, আপন মনে বকবক করে আর খক্ খক্ করে কাশে। চোর তাড়াবার এমন চৌকিদার আর নেই। এঘরে মণি থাকে বৌকে নিয়ে।

আহুরীর মনে হয় ওই শীর্ণ লোকটা গলায় একতাল কণ্ঠি পরে ছুনিয়ার তাবৎ লোককে ঠকাচ্ছে, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে চলেছে। স্বামী স্ত্রী! ছাই! ওরা জানে না, জানে আহুরী এও একটা ঠকানোর পন্থা। আজ যেন ক্ষেপে উঠেছে আহুরী। এভাবে থাকা তার অসহ্য হয়ে উঠেছে। লোকটা বোধহয় পুরুষই নয় অক্ষম অপদার্থ একটা শয়তান। কোনো সাড়া নেই লোকটার দিক থেকে।

ও তখনও টাকার বাণ্ডিল নিয়ে ব্যস্ত। এইগুলো নেড়ে চেড়েই লোকটা পেয়েছে অপরিসীম জৈবিক একটা তৃপ্তি। বাণ্ডিলগুলো সে গুণে গুণে লোহার ছোট সিন্দুকটায় তুলে কোমরের ঘুনসি থেকে চাবি বের করে তালা লাগিয়ে বারকতক হাতলটা টেনে টেনে দেখে তবে খুশী হয়ে এগিয়ে আসে।

—শুনছো।

লোকটা শুয়েছে। সারা শরীরে কতকগুলো হাড়, কঠিন কটকটে হাড়এর উপর সামান্য একটু মাংসের আবরণ মাত্র। কোনো কোমলতা নেই কঠিন একটা জীব।

আহুরীর নিটোল মাংসল দেহের অণু পরমাণুতে তীব্র একটা জ্বালা, সেই অতৃপ্তি যেন ঠেলে ফুটে বের হতে চায়। ছুহাত দিয়ে লোকটাকে ধরেছে সে। তার সব জ্বালার নিবৃত্তি খোঁজে কি উন্মাদ প্রচেষ্টায়।

—আঃ। ঠাকুর নাম করছি, সরো দিকি, ঘুমোও।

মণে দত্তের কোন চাওয়ার সাধ্য নেই। তাই টাকা আর হরি-নামের শুকনো ভড়ং নিয়েই রয়ে গেছে সে তার জগতে। ঠেলে সরিয়ে দিল আহুরীকে।

মেয়েটা হাঁপাচ্ছে। ওই লোকটা যেন তার মুখের উপরই সজোরে একটা চড় কষেছে। মণে দত্ত বিড়বিড় করে।

—যত্তোসব নষ্টামি! মহাপাপ! বুঝলি, শাস্তর জানিস?

মহাপাতক এইসব। নরকের পথ!

আহুরী আবছা অন্ধকারে ওর আঘাতে আর অপমানে ফুলে উঠেছে। নরক! জীবনটাকে ওই লোকটা নরকেই পরিণত করেছে। আজ রুখে ওঠে মেয়েটা চোট খাওয়া বিড়ালের মতো। জ্বালা জড়ানো তীব্র স্বরে বলে,

—তবে জেনে শুনে বিয়ে করেছিলে কেন? মরদ! ছাই কোথাকার!

—খানকী—লষ্টা তুই।

শীর্ণ লোকটা অসহায় রাগে জ্বলে ওঠে। কাঁপছে সে। গলার কণ্ঠিগুলোয় সেই রাগে কিড়মিড় করে শব্দ তোলে। অন্ধকারে ওর দুটো চোখ জ্বলছে।

আহুরীও রুখে দাঁড়িয়েছে। কাপড়টা গা থেকে খসে পড়েছে। মাথার একরাশ চুল এলানো। ওর কাছে জীবনের চরম ফাঁকিটা আজ সত্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বেদনাময় এই প্রকাশে মেয়েটা আজ চমকে গেছে, বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এতদিন যে আশ্বাস নিয়ে বেঁচেছিল সেটা চরম মিথ্যায় পরিণত হয়েছে। এতদিন ধরে শুধু ঠকে এসেছে আর নিজের দেহ বিক্রি করে পর্যন্ত ওই জানোয়ারের হাতে টাকার বাণ্ডিল তুলে দিয়েছে।

রুখে দাঁড়ায় আহুরী—মারবে?

ওই কঠিন প্রতিবাদমুখর মূর্তির সামনে মণে দত্ত চুপসে যায় হাওয়া বের হওয়া বেলুনের মতো।

চুপ করে ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। তার জবাব দেবার কিছু নেই। ব্যাপারটার মূলে কঠিন সত্যই রয়ে গেছে।

আহুরী তখনও এককোণে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলছে। ব্যর্থতায় আর যন্ত্রণায় ও যেন কাঁদছে। মুষড়ে পড়েছে কঠিন আঘাতে। তাই কাঁদছে ব্যর্থ বেদনাহত একটি নারী। কি যন্ত্রণায় যেন দেওয়ালে তার মাথা ঠুকতে ইচ্ছে হয়।

ওরা তাকে ঠকিয়েছে। তাকে পরিণত করেছে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থে ওই ঘৃণ্য পরিচয়ে। সতীত্ব পুণ্য! সবকিছুর অর্থ ধিক্কৃত বিকৃত হয়ে উঠেছে আহুরীর সামনে।

অনেক রাত বেড়েছে। রাতের এই প্রহরগুলো স্বাভাবিক নিয়মে সহজ গতিতে বেড়ে চলে। আর গাঢ়তর হয়ে ওঠে অন্ধকার, তারাগুলোর ঔজ্জ্বল্যের যৌবনতা ফিরে আসে, কুয়াশার ফিকে আভাস গাঢ়তর হয়ে হয়ে যবনিকার রূপ নেয়, যেন জমাট বেঁধে আসছে ওই অস্বচ্ছ আবরণটা। সব ক্লান্তি-শ্রান্তি ডুবে গেছে নীরবতার অতলে।

ঘুমিয়ে পড়েছে মণি দত্ত। সারাটা দিন পয়সার ধান্দায় ঘুরে ফিরে সে ক্লান্ত শ্রান্ত। তাই অসাড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে সিন্দুকের পাশেই। ওই টাকার সিন্দুকই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাই ঘুমের ঘোরেও সেটাকে হাতছাড়া করতে সে নারাজ।

আহুরী ঘেন্নায় রাগে গরগর করছে চোট খাওয়া বাঘিনীর মতো। কি ভাবছে সে। গুমোট বন্ধ ঘরটায় অসহ্য গরম। সেই গুমসানি ভাবটা তার দম বন্ধ করে আনছে। মাথায় যেন আগুন ফুটে বের হয়।

আহুরী দরজা খুলে বের হয়ে এল। অন্ধকারে শুধু তারাগুলো জ্বলছে কি নিথর দীপ্তি নিয়ে। ওরা চকমকিয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে

এতদিন সে শুধু পথে পথে ঘুরেছে ঘেয়ো কুকুরের মতো। আর 'দুটো পয়সার জন্য অনেক উঞ্ছবৃত্তি করেছে। মেয়েটা তার সামনে কি এক নোতুন জগতের সন্ধান এনেছে। বেপরোয়া পটলার মনে ওঠে। পাটকলের চাকরিটা হয়তো ফিরে পাবে—আবার থিতু পারবে। আত্মরী আরও ঘনিষ্ঠতর হয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে,

ও বুঝতে টাকা! অনেক টাকা আছে। শয়তানটার সব টাকাই নিয়ে নিটোল। লোক ঠকিয়ে চুরি করে জমিয়েছে শুধু টাকা। তাই নিয়েই ভুলে আছে সে। ওই টাকাই নিয়ে যাবো। তার পুরোপুরি দাম উশুল করে যাবো।

পটলা মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকে। আত্মরী ওকে যেন কান্না ভেজা কঠিন স্বরে আকুতি জানায়—চল!

বাঁধ ভেঙে দুর্বার অট্টহাসিতে দামোদরের সর্বনাশা পাহাড়ি ঢল ঢুকেছে জনপদে, তছনছ করে দিয়েছে সব কিছু। ভেঙে পড়েছে এতদিনের ফাঁকির ইমারত চুর চুর হয়ে।

আত্মরীর নোতুন সত্তা—সেদিনের ঘোমটা ঢাকা বৌটার অপমৃত্যু ঘটেছে। আজ যে নোতুন করে মাথা তুলেছে সে আরও দুর্বার— কঠিন আর রহস্যময়ী হয়ে। পুরুষকে সে নিঃশেষে পেতে চায় তার জের দাবিতে। তাই মণি দত্তের মতো অপদার্থকে সে ঘৃণা করে। অ. করে এই ঘুণধরা সমাজকে—ওই মানুষগুলোকে।

পটলাও আজ বদলে গেছে। এই যেন চেয়েছিল সে সারা মন দিয়ে। আত্মরীর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দুর্জয় সাহস। আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে মেয়েটা।

ডাঃ সেন রোগীদের ওই নোংরা পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে এদিকের ক'টা ঘরে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন। এতে রোগীদের পরিবেশটাও কিছু বদলায়—আর দেখাশোনার সুবিধা হয়।

ডাঃ সেনের সঙ্গের মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট ক'জনও পালা করে ডিউটি দিয়ে চলেছে।

তরুণও রয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন কলেরা পেসেণ্ট ভর্তি হয়েছে।

জগদীশের বোনটার অবস্থাও ভালো নয়। সোমথ মেয়েটা নেতিয়ে পড়েছে। চিকিৎসারও কোনো ভালো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। কোনোরকমে কাজ চালানো হচ্ছে মাত্র।

বেদান্ততীর্থ প্রথমে রাজী হন নি।

ডাঃ সেন ফটিককে দেখতে গিয়ে চমকে ওঠেন, বদ্ধ ঘুপসি একটা ঘর, স্যাঁতস্যাঁত করছে। জানলা নেই, আলো হাওয়া ঢোকে না। ঢোকে শুধু ধোঁয়া, বদ্ধ ঘরটার কোণে কোণে জমে থাকে শুধু ধোঁয়া আর ময়লা। ছেলেটা ভিজে মেজের উপর একটা ময়লা বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে।

ডাঃ সেন বলেন—এখানে এভাবে থাকলে চিকিৎসায় কোনো ফলই হবে না। ওকে বাইরের ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া দরকার।

বেদান্ততীর্থ চুপ করে বসেছিলেন। বিজয়াও কথাটা শুনেছে। সে ভেবেছে এখানে বিনা পথ্যে বিনা চিকিৎসায় ছেলেকে সারানো যাবে না।

তাই ডাক্তারবাবুর কথা শুনে তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে সে। বেদান্ততীর্থর মন চায় না। ওই ফটিকই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তাকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিতে ভয় হয় তাঁর। ওই রুগ্ন শিশুর শিহরে বসে চণ্ডীপাঠ করবেন। বিপদ-বারিণী মহাদেবী চণ্ডীর-আশীর্বাদে তাঁর নাতি সুস্থ হয়ে উঠবে। তিনি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ—তন্ত্রোক্ত নীতিতে তিনি আস্থাবান।

তাই বলেন—কেন? এখানেই থাকুক ও। ওষুধপত্র যা হয় দেবেন।

ডাঃ সেন বৃদ্ধের দিকে চাইলেন। কয়েকদিনের অনিয়ম আর এই

নোংরার মধ্যে বাস করার ফলে বেদান্ততীর্থের চেহারাটা ঝড়ো কাকের মতো হয়ে উঠেছে। দাড়িগুলো উস্কোখুস্কো—মাথার চুলে তেল নেই, বিবর্ণ ময়লা একটা কাপড় পরনে। ডাঃ সেন ওকে দেখছেন। বলেন তিনি—আমার মতটা জানালাম। এখানে এই বদ্ধ নোংরার মাঝে থাকলে ওষুধেও কোনো ফল হবে না। যদি অবশ্য আপত্তি থাকে আপনাদের—পাঠাবেন না। তবে ভালোর জন্যই কথাটা বলেছিলাম।

আপদউদ্ধার স্তোত্র শুরু করেছেন, মধ্যপাদ অবধি এসেছেন, নিষ্ঠা সহকারে আপদ উদ্ধার স্তোত্র অপরাজিতা স্তব পাঠ করলে তার সুফল ফলতে বাধ্য, ওই ক্রিয়া দুটো তিনি সম্পন্ন করতে চান রোগীর কাছে বসে।

তরুণও ডাঃ সেনের কথাটা সমর্থন করে। সে শোনায়,

—ওঁর কথাটা ভেবে দেখুন পণ্ডিতমশাই।

বেদান্ততীর্থ একটু বিরক্তিভরে বলেন—আমার কথায় বাধা দিও না তরুণ। ফটিক এখানেই থাকুক।

বিজয়ার মোটেই ভালো লাগে নি শ্বশুরের কথা। ও জানে এখানের বিশ্রী পরিবেশে সেবা যত্ন করা সম্ভব নয়, পথ্যও ঠিকমতো পাবে না। ওষুধ জুটবে না। আর যখন তখন ডাক্তারও পাওয়া যাবে না। কারণ অন্য রোগীদের নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকবেন। তাছাড়া বিজয়া বেশ বুঝেছে তাঁর কথা না শোনার জন্য ডাঃ সেনও খুশী নন, এবং ভবিষ্যতে যে সব দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন তাও বুঝেছে বিজয়া। তরুণও থেমে গেছে বেদান্ততীর্থের কড়া ধমকে।

বিজয়ার এসব মোটেই ভালো লাগে না। সে বলে ওঠে,

—ফটিক ওঁদের ওখানেই থাকুক বাবা। তবু সময়ে ওষুধ পড়বে, ওঁরা সব সময় দেখতে পারবেন।

—বৌমা! বেদান্ততীর্থ বৌমার কথায় চমকে ওঠেন। তাঁর সব কাজেই বার বার বাধা দিয়ে এসেছে ওই বিজয়া। অনেক বছর

আগেকার দিনেও এমনি বাধা সে দিয়েছিল। আজও আবার তেমনি ভাবেই এগিয়ে এসেছে বিজয়া।

বিজয়া পরিষ্কার কণ্ঠে জানায়—এখানে খোকনকে ফেলে রাখতে আমি রাজী নই। তরুণবাবু আপনি দয়া করে ওকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। ওষুধ নেই—পথ্যি নেই—শুধু গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আর স্তব স্তোত্র পড়ে রোগ সারে?

বেদান্ততীর্থের সব বিশ্বাস—দীর্ঘদিনের সাধনা-সংস্কার আর দাবিকে ওই বিজয়া এক নিমিষেই নস্যাৎ করে দিল। পায়ে দলে পিষে মাড়িয়ে দিল তার সব আশাকে। বৃদ্ধ তবু অস্ফুট কণ্ঠে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেন।

—বৌমা! বিশ্বাস কর বৌমা। আমার একান্ত অনুরোধ তুমি ওকে দূরে সরিয়ে দিও না।

আজ কি দুস্তর পারাবারের তীরে দাঁড়িয়ে আছেন একটি মানুষ। অসহায় ক্লান্ত—পরাজিত সে। বেদান্ততীর্থ কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন নি। অসমাপ্ত রয়ে গেছে তার অপরাজিতা স্তোত্র, অপূর্ণ রয়ে গেল তাঁর চণ্ডীপাঠ। তাঁর আরব্ধ প্রক্রিয়ার শেষ অধ্যায়ে নান্দীস্তোত্র সমাপন হয় নি।

বিজয়া জোর করে তাঁকে আজ অগ্রাহ্য করেছে। পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছে বিজয়া এতদিন তাঁর ওই কর্ম প্রক্রিয়াগুলোকে তবু সহ্য করেছিল আজ সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে ওসবে তার আস্থা নেই। আর তার জন্যই চরম আঘাত দিয়েছে তাকে এমনিভাবে তার সব অনুরোধকে অগ্রাহ্য করে।

খোকনকে ওরা নিচের হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ঘরটা শূন্য ঠেকছে। মনে হয় বুকের মাঝখানেও জেগে রয়েছে অমনি শূন্যতা আর সেটা বেদনাদায়ক—দুঃসহ।

রাত্রি নেমেছে। নিথর রাত্রি। প্রদীপের শিখাটা কাঁপে দমকা বাতাসে, চকিত হাওয়ায় দীর্ঘতর প্রলম্বিত শিখাটা দরদরিয়ে কাঁপছে যেন নিভে যাবে এখুনি। ভাবতে ভয় হয়—তবু ওই শিখাটাকে তার একমাত্র বংশপ্রদীপের আয়ুর সঙ্গেই তুলনা করে। চারিদিকের নগ্ন অভাব-যন্ত্রণা আর এমনি সর্বনাশের মধ্যে ওই এতটুকু শিখা এমনি অনিশ্চিত অন্ধকারে পথ খুঁজে ফিরছে।

একদিন এই পৃথিবী তাঁর কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছিল। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তিনিও ঘর বেঁধেছিলেন। কত আশা আর আনন্দের জালবোনা সেই সংসার—মনে হয়েছিল তিনি সেই আনন্দের মায়াজালে বোধহয় নিজেকে বিস্মৃত হয়েছিলেন। সেদিনের পণ্ডিত গিরীশ বেদান্ততীর্থ ভুলেছিলেন জীবন সত্যকে—পরমার্থকে।

একে একে স্ত্রী গেল—হারিয়ে গেল একমাত্র সন্তান; তবু তিনি স্বপ্ন দেখেছেন. কাশীতে অধ্যাপনা ছেড়ে, শাস্ত্রালোচনা বিসর্জন দিয়ে তিনি আবার ঘর বেঁধেছেন। মোহের আবরণে সেই হারানো দিনগুলোকে ফিরে পেতে চেয়েছেন, এগোনো নয়—পিছনেই এসেছেন। সামান্য মোহ আর স্বার্থের জন্য পরমার্থকে বিসর্জন দিয়েছেন বেদান্ততীর্থ।

বিজয়ার এই ব্যবহার সেই কঠিন সত্যটা তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরেছে। দুঃখদায়ক তবু এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। এতদিন কি নকল সোনা নিয়ে পথে পথে ফিরি করেছেন।

কার বোঝা বয়ে ফিরেছেন চোখবাঁধা কলুর বলদের মতো সংসারের ঘানি গাছে।

বিজয়া বের হয়ে গেছে, বোধহয় খোকনের ওখানে গেছে।

রাত অনেক। বেদান্ততীর্থের বিরক্তি বোধহয় তবু তিনি চুপ করে নীরব দর্শকের মতো সব কিছু দেখবার চেষ্টা করেন, শান্ত শুদ্ধ নির্বাক হয়ে ভবিতব্যকে মেনে নেবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছেন। তেল ফুরিয়ে আসছে। খোলা রয়েছে পুঁথিগুলো—প্রদীপশিখাটা কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল।

নিবিড় অন্ধকারে মানুষটা যেন একটা স্তূপের মতো বসে আছে, বোধহয় ধ্বংসস্তূপই। একবার ফটিককে খুব দেখতে ইচ্ছা হয়। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর হয় না। ছানি পড়েছে চোখে, ছানি কাটাবারও সামর্থ্য নেই। ঝাপসা হয়ে আসে তাঁর দৃষ্টি। বৃদ্ধ হাতড়ে ঘরের কোণ থেকে লাঠিটা নিয়ে নামবার পথ খোঁজেন।

বিজয়া আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। ডাঃ সেন ফটিককে পরীক্ষা করে ওষুধপত্র দিয়ে বের হয়ে আসেন। তরুণও এসে পড়েছে, কাল থেকে লঙরখানা খুলতে হবে সেবাশ্রমের দুজন স্বামীজীকে সে জায়গাগুলো দেখিয়ে উনুন খোঁড়ার ব্যবস্থা করে এসেছে। সেইখানে আটকে পড়েছিল।

ডাঃ সেন তরুণকে দেখে এগিয়ে আসেন।

তরুণের মনে আসে ফটিকের কথা। শুধোয় সে—কেমন দেখলেন ওকে ?

ডাঃ সেন চুপ করে যান। এক কথায় জবাব দিতে পারেন না। তরুণ ওকে দেখছে, ডাঃ সেনের মুখে ভাবনার কালো ছায়াটুকু ওর নজর এড়ায় না। ডাঃ সেন বলেন—বেশ ক'দিন ওইভাবে থাকার ফলে কেসটা গোলমেলে ঠেকছে। আবার ব্রঙ্কাল প্যাচও দেখছি, তাই একটু কম্‌প্লিকেটেড হয়ে উঠেছে।

পরে আশ্বাসের স্বরেই বলেন তিনি—লেট আস্ ট্রাই।

এদিকে চেয়ে থাকে বিজয়া। ফটিক এখানে এসে অবধি জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে আছে। বিজয়ার মনে হয় শ্বশুরের কথার বিরুদ্ধে—তার সম্পূর্ণ অমতে এখানে এনেছে খোকনকে।

বিজয়া বাইরে ডাঃ সেন আর তরুণকে কথা বলতে দেখে এগিয়ে আসে। হয়তো ডাঃ সেন ওর সামনে আসল কথাটা জানাতে চান না। তরুণকেই বলছেন। বিজয়ার ব্যাকুল মন সেই কথাটা জানতে চায়।

সব কথা সঠিক শোনা যায় না। তবু বিজয়ার কেমন ভয় ভয় ঠেকে।

বাইরে নেমেছে অন্ধকার, তারাগুলো জ্বলছে, কুয়াশার চাদর জড়ানো বাঁশবন—তালগাছগুলো আকাশের বুকে কালো রেখার দৈর্ঘ্য নিয়ে উঠেছে। উথলপাথাল হাওয়া বয়—অতন্দ্র পৃথিবীর হাহাকারের মতো। দিক্‌মোড়া অবগুণ্ঠনাবৃত ধরিত্রী কি দুঃসহ বেদনায় গুমরে ওঠে, ঝড়ো হাওয়ায় ওঠে সেই কান্নার সুর।

—কি বললেন ডাক্তারবাবু? বিজয়া তরুণের কাছে এগিয়ে এসে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে। ডাগর দুচোখও জলে টলমলো। তরুণ জানে মায়ের এই ব্যাকুলতার খবর। তাই সান্ত্বনা দেয় সে।

—ভালো হয়ে উঠবে খোকন।

বিজয়া এমনি দুঃসহ কান্নায় ভেঙে পড়ে নি কখনও। মুখ বুজে অতীতের সেই আঘাতকে সহ্য করেছিল সে। আজ দারিদ্র্য-অভাব আর অনেক যন্ত্রণা সয়ে সয়ে তার সব সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। ঘরও নেই—জমিজারাত গেছে, বাগানটাও নাকি বিক্রি করে দিয়েছেন শ্বশুরমশায়।

তার আশা ভরসাস্থল ওই একমাত্র সন্তান। ওইটুকু তার বর্তমান—ওইটুকু তার ভবিষ্যতের আশ্বাস। তাই বিজয়া কান্নাভরা স্বরে জানায়,

—ওকে সারিয়ে তুলতেই হবে ঠাকুরপো। ওইটুকু ছাড়া আর আমার যে কিছু নেই, কেউ নেই।

ছায়ামূর্তি দুটো এই সময়ই বের হয়ে যায়। বিজয়া ফিরে চাইল না। ওর সারা মনে কি দুঃসহ আবেগ। তরুণ ওকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে—আপনি শান্ত হোন। এসময় অধৈর্য হলে চলবে না।

বিজয়ার তবু মন মানে না।

নেশা ছুটে গেছে গোবিন্দ মুন্সীর। রাতের অন্ধকারে সৌরভীর নেশা তার মাদকতা ছুটিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা বের হয়ে গেছে।

গোবিন্দ মুন্সীর ঘুম আসে না। তেষ্টা পায়—তাছাড়া সাদা চোখে রাতের অন্ধকারে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই মালের সন্ধানে বের হয়েছে। পুটুর সংগ্রহে দুচারটে বোতল থাকে, তাই পুটুকে খুঁজতে আসছে।

নিচে নেমে এদিকে আসছে। হঠাৎ আবছা কুয়াশার আড়ালে বারান্দার ওদিকে কোনো মেয়ের কান্নার চাপা আওয়াজ আর তরুণের গলা শুনে দাঁড়াল। গোবিন্দ মুন্সীর মনে হয় যেন নেশাটা তার এখনও রয়েছে। নেশার ঘোরে ভুল দেখছে, না। পা টলে নি। ঝরঝরে দেখতে পাচ্ছে।

তাই এগিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। গোবিন্দ মুন্সীর নীতিজ্ঞান টনটনিয়ে উঠেছে। সামনে তরুণ মাষ্টার আর বেদান্ততীর্থের বিধবা বৌটাকে এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করতে দেখে গোবিন্দ বলে—যাঃ বাবা। এত কান্নার কি আছে? তা বলিহারী দিই তরুণমাষ্টার। একেবারে পণ্ডিতের কাঁথায় আগুন দিয়েছো বাবা। সাবাস!

তরুণ চমকে ওঠে—কি যা তা বলছেন?

বিজয়ার কান্না থেমে গেছে, ওই কুৎসিত লোকটার কথাগুলো শুনে চমকে উঠেছে সে। এমনি সময় এসব কথা উঠবে ভাবে নি বিজয়া। তাই তার দুচোখ জ্বলে উঠেছে দুঃসহ রাগ আর অপমানে। কিন্তু গোবিন্দ মুন্সীর এসব ব্যাপার জানা আছে। জীবনে সে ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নাচ চালিয়ে এসেছে। তার কাছে শুচিতা শালীনতার দাম কানাকড়িও নয়। তাই গোবিন্দ মুন্সী বলে,

—এসব ছ্যায়লা ঢের দেখা আছে বাবা। চালাও পান্সী। তবে আমরাও আছি এই নিবেদনটা জানিয়ে গেলাম। হেঃ হেঃ হেঃ

লোকটা টলে টলে হাসছে। তরুণের মনে হয় বলিষ্ঠ হাতের ঘুষিতে ওর বাকী ক'টা দাঁত খুলে দেবে। কিন্তু তাতেও সমস্যার

সমাধান হবে না বরং বিজয়ার সম্মানই বিপন্ন হবে। নিজের কথা সে ভাবে না, বিজয়ার কথা ভেবেই থামল।

লোকটা ততক্ষণে চলে গেছে, কিন্তু তার জিব দিয়ে ছড়ানো গরল-এর জ্বালা ওর সারা দেহে মনে কি দুর্বার জ্বালা এনেছে।

বিজয়া নির্বাক হয়ে গেছে এই অতর্কিত অপমানে। ওদের দুজনের সামনে কি বেদনায় বিকৃত মনোজগতের বিকৃত রাগ ফুটে ওঠে।

গোবিন্দ মুন্সী একটু বেগেই চলেছে পুটুর ঘরের দিকে। জোর খবর একটা আছে আজ, আর দরকার হলে পুটুকে ডেকে এনে যুগলকে দেখাতে পারবে। মাস্টার শিক্ষক! তাদের এই দেবচরিত্রের পরিচয়টা পুটুর জানা দরকার। গোবিন্দ মুন্সী জানে তরুণ তাদের কাছে মস্ত একটা বাধা, সেই বাধাকে ওরা চরম আঘাত হানতে পারবে।

সবাই সাধু মহাজন, দোষী কেবল গোবিন্দ মুন্সী। সেই শ্লা মদ খায়, মেয়েছেলের সন্ধানে ঘোরে।

হঠাৎ অন্ধকারে ধাক্কা লাগে কার সঙ্গে। গোবিন্দ চমকে ওঠে।

—কে!

বেদান্ততীর্থ হাতড়ে চলেছেন। ওপাশে দেখা যায় রোগীর ঘরে আলোর ক্ষীণ আভা। আচ্‌মকা ধাক্কায় তার হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে লাঠিটা, তিনিও পড়তে পড়তে কোনো রকমে সামলে নিলেন! লোকটার মুখে মদের বিশ্রী গন্ধ লেগে রয়েছে। গায়ের ময়লা চাদরটা দিয়েই নাক চেপে ধরেন তিনি,

গোবিন্দ মুন্সীও দেখেছে ব্যাপারটা। ইতিমধ্যে লাঠিটা তুলে নিয়েছেন বেদান্ততীর্থ। শুধোলেন তিনি,

—হাসপাতালটা কোন দিকে, বাবা?

গোবিন্দ মুন্সী হাসছে—হাসপাতাল!

—কে? গোবিন্দবাবু? বুড়ো ওর কণ্ঠস্বর চেনেন। বললেন, একবার নাতিকে দেখবো যে।

গোবিন্দ হাসছে ওর কথা শুনে। হাসি থামিয়ে বলে,

—নাতি! তা হাসপাতালে আপনার বৌমাকেও দেখলাম।

বেদান্ততীর্থ বলে ওঠেন—দেখলে বৌমাকে? ফটিক ভালো আছে তো?

গোবিন্দ মুন্সী বেশ তীক্ষ্ণস্বরেই জানায়,

—বৌমাকে দেখলাম ওইদিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওই যে ছোকরা মাষ্টার—তরুণ মাষ্টার, ওর হাত ধরে কান্নাকাটি করে কি বলছে। মানে—বুঝলেন না? বয়সের দোষ—

বেদান্ততীর্থ অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন ওই কথাগুলো শুনে। তাঁর এতদিনের সব ধারণা যেন প্রচণ্ড আঘাতে বদলে যাচ্ছে। সব কিছু তাহলে মিথ্যা! তবু এই কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন না কোনোমতেই। আর্তনাদ করে ওঠেন বেদান্ততীর্থ।

—না, না! এসব মিথ্যা! মিথ্যা কথা বলছ তুমি! ঈশ্বর জানেন তুমি মিথ্যাবাদী।

বুড়ো অন্ধকারে যেন পালাচ্ছেন। ওই দস্যু তার সব কেড়ে নেবে। শেষ সম্বল মান সম্মান ধর্ম—সেইটুকুও সে ছিনিয়ে নেবে এই ভয়ে তিনি পালাচ্ছেন।

গোবিন্দ মুন্সী হাসছে—যাঃ বাব্বাঃ। হলাহল্ মিথ্যাবাদী বলে গেল। উনিই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির!

বেদান্ততীর্থ ব্যাকুলভাবে আসছেন! এবড়ো-খেবড়ো পথ। কোথায় ঠোক্কর লেগে পায়ের বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে গেছে, রক্তপাত হচ্ছে খেয়াল নেই। অন্ধকারে সরে গেল একটা সাপ, তার হিমশীতল চলমান দেহের ছোঁয়া লেগেছে বুড়োর পায়ে—তবু চমকে ওঠেন নি তিনি। তাঁর সব ধারণা সব চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাঁর একমাত্র পুত্রবধূর সম্বন্ধে যা শুনেছে তা নিশ্চয়ই সত্য নয়। ঈশ্বর!

অন্ধকারে বুড়োর নীলাভ জীর্ণ কোটরাগত দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। নিজের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্য আজ তিনি ঈশ্বরের আশ্রয় খোঁজেন কি নিদারুণ স্বার্থপরের মতো।

আলোটা দেখা যায়। বৃদ্ধ কি আশ্বাস-এর সন্ধানে ওই আলোটুকুর দিকে এগিয়ে আসে। সামনের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় এসে ঘরে ঢুকলো।

—বৌমা! হাঁপাচ্ছেন বেদান্ততীর্থ। ছানিপড়া ঘোলাটে দু'চোখ মেলে বিজয়াকে খুঁজছেন। তিনি বিশ্বাস করেন এই সময় বিজয়া তার ছেলের কাছেই থাকবে, সে এগিয়ে আসবে তার ডাকে।

কিন্তু কোনো সাড়া নেই, বিজয়া নেই এখানে। বেদান্ততীর্থ দেখেন শূন্য ঘর, ফটিকের বিছানার দিকে চোখ পড়ে, ছেলেটা যন্ত্রণায় যেন কুঁকড়ে উঠছে। বিড়বিড় করে কি বলছে ছেলেটা।

—জল!

বেদান্ততীর্থ এগিয়ে আসেন। সারা মনে তার থমথমে রাগের গাঢ়তা, মনে হয় তাহলে গোবিন্দ মুন্সী মিথ্যে কথা বলে নি। সবই সত্যি। নইলে রাত নির্জনে বিজয়া তার অসুস্থ ছেলের বিছানা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে কেন?

—মা। মাগো! অস্ফুট আর্তনাদ করে চলেছে খোকন।

ক'দিনের জ্বরে ভুগে শীর্ণ-বিবর্ণ হয়ে গেছে ফুলের মতো তাজা সুন্দর ছেলেটা, আজ অনাদরে এমনি অবস্থায় পড়ে আছে। পাশে ওর কেউ নেই।

তার একমাত্র বংশধর এমনি অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকবে এটা তিনি সহ্য করবেন না। এগিয়ে চলেন বৃদ্ধ। মনে মনে তিনি আজ কঠিন-কঠোর হয়ে উঠেছেন।

নীল আকাশে সাদা পেঁজাতুলোর মতো মেঘগুলো ভেসে ভেসে চলেছে। মাঠের সবুজ ছাপিয়ে ফুটেছে কাশফুলের সাদা স্তবকগুলো—বাতাসে সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো স্তবকগুলো উড়ছে, তার সঙ্গে মিশেছে

রঙীন প্রজাপতির দল। মুঠো মুঠো রঙীন ফুল কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে হাওয়ায়, ওরা উড়ছে।

ফটিক লক্ষ্মী-মিতন দত্তদের গোপাল আরও কারা চলেছে বাঁধের পথ ধরে। নদীর রূপোলী বালুচরের বুক কেটে একফালি তিরতিরে জল রেখা একে-বেঁকে চলেছে, দামাল ছেলে যেভাবে ভিড় এড়িয়ে ছোটে নদীর জলধারার চলাটাও তেমনি আঁকা-বাঁকা।

প্রজাপতিগুলো কাশবনের মাথা ছাড়িয়ে ওই পথে ছুটেছে। ওরা চলেছে প্রজাপতির সন্ধানে—তাদের বাগানের ধারে এসে প্রজাপতি-গুলো ছিটিয়ে পড়ে—ফটিক-এর দল কলরব করছে। জীর্ণ আকাশের বুকে সাদা মেঘগুলোয় পড়েছে শেষ সূর্যের আভা। মেঘগুলো লাল জাফরানী রং-এর হয়ে গেছে। ওরা ভেসে চলেছে প্রজাপতির দেশে। সেখানে আছে সবুজ আলো—পাখির ডাক আর ফুলের গন্ধ।

—ফটিক! কে ডাকছে তাকে। অনেকদূর থেকে সেই ডাকটা ভেসে আসে বাতাসে। মনে হয় মা ডাকছে তাকে। মা—দাদুর গলা, হাসছে ফটিক। ও চলেছে মস্ত বড় ডানামেলা একটা প্রজাপতির পিছনে। চোখে মুখে লাগছে হিম হাওয়া, খুশীর আবেগে সে চলেছে।

হঠাৎ প্রজাপতিটা বিরাট বড়—অনেক বড় হয়ে ওঠে। তার ডানায় ওকে তুলে নেয়। নরম তুলতুলে পিঠ। প্রজাপতিটা হাসছে—ফটিকও। হাওয়ায় হাওয়ায় সেটা ভেসে চলেছে গাছের মাথা ছাড়িয়ে—কাশবন ছাড়িয়ে। তাদের বাগানের ফুলফোটা চাঁপাগাছের ডালগুলো গায়ে লাগে, মগডালের সোনালী চাঁপাগুলোকে কোনোদিন পাড়তে পারে নি সে। আজ সেই ফুলগুলোকে দু'হাত দিয়ে ছুঁয়েছে—মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে চলেছে ওই মেঘের দিকে। লাল, হলুদ, জাফরানী মেঘগুলো। ফটিক চলেছে কোন নোতুন দেশে। আলোটুকু এখানে স্নিগ্ধ সবুজ আর বাতাস কি মিষ্টি সুবাসে গাঢ় থেকে গাঢ়তর।

সেই ডাকটা শোনা যায় তখনও। মা-এর গলা। মা ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকছে। দাদুও। বাতাসে উড়ছে ওর সাদা দাড়ি মাথার চুল শ্বেত উত্তরী।

—দাদুভাই!

ফটিক চলেছে কোন আনন্দের জগতে। সামান্য রুটির জন্য বেনেবুড়ি তাকে গাল দেবে না, বিনা পথ্যে—বিনা চিকিৎসায় বানে ডোবা ওই পচা নরকে সে ফুরিয়ে যাবে না। সেখানে সে বাঁচবে নোতুন করে। দু'চোখে সেই তৃপ্তির আশ্বাস। ডাকটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে।

মেঘগুলো মুখে গায়ে ছুঁয়ে যায়—দু'হাত দিয়ে ফটিক সেই মহাশূন্যের আলো—আনন্দ জগৎকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে। সে হারিয়ে গেছে—অনেক—অনেকদূরে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন বেদান্ততীর্থ—ঈশ্বর! তুমি দয়াময়।

বেদান্ততীর্থের অস্ফুট আর্তনাদে ডাঃ সেনও ছুটে এসেছেন। ফটিকের শীর্ণ মুখে কি তৃপ্তির ছায়া। ওর হাতদুটোর সেই অদৃশ্য জগতের খুশীর ইশারা। ডাঃ সেন ওর হাতটা একবার তুলেই নামিয়ে দিলেন। সেই অদেখা আনন্দ জগতের পথ তিনি জানেন না—সেই ভাষা মানুষের কাছে অজানা। তাই মনে হয় ফটিক চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল—ফুরিয়ে গেল এখানের দুঃখ আর বেদনার বুক থেকে।

বেদান্ততীর্থ বুঝেছেন, তাই বৃদ্ধের দু'চোখে জল নামে। ভাষা নেই। নির্বাক পাথরের মূর্তির দুচোখ ফেটে জল নামে। বৃদ্ধের দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। শেষ অবলম্বন ওই লাঠিটাও ছিটকে পড়েছে। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো যুক্তি-তর্ক শিক্ষার অনুভূতির গভীরতা দিয়ে এই প্রচণ্ড বেদনাকে তিনি সহ্য করতে যেন অপারগ। অসহায়ের মতো শুধু কাঁদছেন তিনি। বিজয়ার তখনও দেখা নেই।

ফটিক কারও জন্য অপেক্ষা করে নি, বোধহয় কি নিদারুণ অভিমান আর অবহেলার বেদনা বুকে নিয়ে সে হারিয়ে গেল এই দুঃখের জগৎ থেকে।

বেদান্ততীর্থ স্তব্ধ হয়ে গেছেন। হঠাৎ দরজার কাছে বিজয়াকে ঢুকতে দেখে চাইলেন। এতক্ষণ সে কোথায় ছিল জানা নেই। তার সব হারিয়ে গেছে এই সংবাদও শোনবার অবকাশ তার ছিল না। বেদান্ততীর্থের মনে হয় বন্যার সর্বনাশা ভাঙনে তাঁর ঘর—শান্ত গৃহ-কোণের শুচিতা শেষ অবলম্বন ওই বংশধর—সব কিছু তার ভেসে গেছে চিরদিনের জন্য, হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্য।

বিজয়ার কান্নার শব্দ শুনছেন তিনি। মা তার একমাত্র সন্তান হারিয়ে কাঁদছে—ওটার মূলে কতটুকু সত্য আছে, গভীরতা আছে জানা নেই। আজ এই ভাঙনের সর্বনাশা বিপর্যয়ে ওই কান্নাও যেন মিথ্যা আর ক্ষণিকের বলেই বোধহয়। কিন্তু তাঁর—তাঁর জীবনে এই ক্ষয়-ক্ষতি এসেছে বার বার। যোগ্য সন্তান গেছে, স্ত্রী গেছে, ঘর গেছে, বাকী ছিল একটুমাত্র আশা, ওই ফটিক। তাঁর বংশধারার শেষ প্রদীপের ক্ষীণতম আভাটুকুও কেঁপে কেঁপে হারিয়ে গেল। এই বেদনা তাঁর মনের গভীরে আবর্তের সৃষ্টি করেছে। প্রচণ্ড কি ঘূর্ণাবর্ত —তারই অতলে হারিয়ে গেছেন বেদান্ততীর্থ।

বিজয়ার এই ব্যবহারে তিনি আজ বেদনাহত, মনে হয় চীৎকার করে ফেটে পড়বেন। বিজয়া আজ মহাপাপ করেছে—পাপী সে। আর সেই পাপেই এই সর্বনাশ ঘটে গেছে। এরজন্য সেই-ই দায়ী।

কিন্তু মনের এই অব্যক্ত যন্ত্রণাটা বেদান্ততীর্থের করুণ অসহায় ভাবের মধ্যে ফুটে উঠল না। আগ্নেয়গিরির মতো বুকে ওর দুর্বার ফুটন্ত লাভার উত্তাপ, তবু বিস্ফোরণ ঘটল না। অগ্ন্যুৎপাত-এর সর্বনাশা প্লাবন নামল না।

নামল দু'চোখে হৃদয় গলানো অশ্রু। সেই অশ্রুতে মিশেছে শুধু বুকভরা ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা। শুধু ওই বিজয়ার উপরই নয়।

সারা সংসারের উপর, মানুষগুলোর উপর—সর্বনাশা প্রকৃতির উপর। এখানে আছে শুধু লাঞ্ছনা, প্রতারণা আর ধ্বংস। মানুষগুলো সেই আঘাতে পশু হয়ে উঠেছে—ঘেংড়ে ঘেংড়ে কাঁদছে আর ধুঁকছে।

এ কান্নাটা তারই—তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর এমনি বিকৃত কদর্য সেটা বুঝতে পারেন বেদান্ততীর্থ অনেকদিন পর। ছেলে মারা যাবার পর থেকে তিনি আর কাঁদেন নি, এই হোল তার শেষ কান্না।

তাই কেঁদে হাল্‌কা হতে চান তিনি।

—পণ্ডিতমশাই!

আচ্ছা অন্ধকারে কে ডাকছে তাঁকে। তারাগুলো কুয়াশাঢাকা পরিমণ্ডলে জ্বলজ্বল করছে। সেই ক্ষীণআলোতে বেদান্ততীর্থ দেখেন তরুণকে।

বিজয়া ছিল না—অন্ধকারে ওর সঙ্গে কোথায় গেছল। গোবিন্দ মুন্সীও বলেছিল কথাটা। কদর্য অশ্লীল কথাগুলো ঠিক মনে পড়ে না। আজকাল কেমন ভুলে যান। তবু ওই কথাগুলো মনের গভীরে কি বেদনার অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। তাই তরুণের ডাকে ওর দিকে চাইতেই—সেই নীরব ঘৃণাটা ফুটে ওঠে ওর চোখে।

তরুণ দেখছে বৃদ্ধকে। ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই।

কিন্তু বৃদ্ধ ওকে দেখে সরে গেলেন। ওর ছায়াটুকুও বেদান্ত-তীর্থের মনে কি জ্বালা এনেছে। সান্ত্বনা তিনি পান নি, পেতেও চান না। শুধু জ্বালাটাই বেড়ে ওঠে তরুণের সান্নিধ্যে। তরুণ ওকে সান্ত্বনা দিতে এসেছে। বৃদ্ধ ওর দিকে চেয়ে থাকেন। বলে ওঠেন তিনি,

—কঠোপনিষৎ পড়েছো মাষ্টার?

তরুণ ওর দিকে চাইল। অর্থনীতির ছাত্র সে। কঠোপনিষৎ পড়ে নি। তাই নির্বাক হয়ে থাকে, বেদান্ততীর্থ বলেন,

—ঋষি উদ্দালকের ছেলে নচিকেতা যজ্ঞের সময় বার বার জানতে চেয়েছিল—স হেবেচ পিতরং কস্মৈ মাং দাস্যসী? হে পিতা, কোন

ঋত্বিকের হাতে আমায় দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করবেন? ঋষি উদ্দালক বার বার এই প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—মৃত্যবে ত্বা দদামি। অর্থাৎ তোমাকে যমরাজের হাতেই সমর্পণ করলাম।

তরুণ বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে। বেদন্তাতীর্থ কি বেদনাভরা কণ্ঠে বলে চলেছেন।

—সেদিনের নচিকেতা নিজের প্রজ্ঞা সাধনা দিয়ে মৃত্যুকে পরাজিত করে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করেছিল, আজকের মানুষ অমৃতমন্ত্র বিস্মরিত হয়েছে—তারা আর ফেরে না। মৃত্যুর অতলে হারিয়ে যায়। আমার খোকনও হারিয়ে যাবে—এর জন্য শোকগ্রস্ত আমি হই নি মাষ্টার। বেদনার কালো অন্ধকারে আমি কবে হারিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা পাবো তারই দিন গুণছি।

বৃদ্ধ সরে গেলেন। এড়িয়ে গেলেন তরুণকে। বিজয়া ছেলের প্রাণহীন দেহটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। রাতের অন্ধকারে সেই কান্নাটা গুমরে ওঠে।

কান্নার অন্ধকারেও হাসির ঝলক ওঠে। হাসি-কান্নার জগৎ—আলো আঁধারির এখানে ফারাক নেই। বেদান্তর্তীর্থের মনের শূন্যতার পাশে অন্য মন আশার পূর্ণতায় উছলে ওঠে।

পুটু কেরানী দমকা খুশীর আবেগে তাই তুটো বোতলই বের করে দেয় গোবিন্দ মুন্সীকে। গোবিন্দই উদারভাবে বলে,

—তবে ভায়া, এ নিয়ে গোলমাল পাকিয়ো না, আরে বাবা ছোকরা মানুষ আর ডবকা ওই ছুঁড়ি। এক আধটু রং তামাসা হবে বই কি! খেলারামের হাট—খেলারাম খেলে যাবে না একি ধরনের কথা বলো?

পুটু কেরানী ঘাড় নাড়ে।

ইতিমধ্যে সেও এগিয়েছে। জগদীশকে পাঠিয়েছে অন্ধকারে

ব্যাপারটা দেখতে। নিজেও একনজর গিয়ে আড়াল থেকে দেখে এসেছে। গোবিন্দ মুন্সী মিছে কথা বলে নি। ত্রিদিববাবুকে একবার এই যুগলরূপ দর্শন করাতে পাঠালে ভালো হতো, কিন্তু তার উপায় নেই। ত্রিদিববাবুর দীর্ঘদিনের অভ্যাস—রাতের বেলায় এক আধটু খেয়ে শয্যা নেন। এসব কথা পুটু ছাড়া বাইরের বিশেষ কেউ জানে না।

পুটু কেরানী অবশ্য জেনেছে ওই বিভূতিবাবুকেই শিখণ্ডী খাড়া করে এখানের ভীষ্মকে বধ করা যাবে, তার উপর আজকের এই ঘটনাটা বেশ জমে উঠেছে।

পুটু গোবিন্দের কথায় সায় দেয়—না না। খেলারামের খেলা একটু জমতে দাও। পরে দেখা যাবে হে।

রাত নামছে। কান্নার শব্দটা ভেসে আসে থমথমে অন্ধকারে। পুটু উৎকর্ণ হয়ে কি শুনছে। গোবিন্দ মুন্সীরও কানে গেছে শব্দটা। অন্ধকারে কান্নার শব্দ ছাপিয়ে কাদের ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠস্বর চাপা কথাবার্তা আর পায়ের শব্দ ওঠে। গোবিন্দের নেশার মধ্যেও চৈতন্য আছে। সেইই বলে,

—কারা হে ?

পুটু জানে ওরা কারা। রাতের অন্ধকারে গোপনে গুদাম থেকে চালের বস্তা কম্বলের গাঁট সরাবার ব্যবস্থা সেইই করেছে। চোরা জগদীশ আরও দু'একজন সেই কাজ করছে।

পুটু জানলার ফাঁক দিয়ে দেখছে ছায়ামূর্তি ক'টাকে। ওরা কে তা জানে সে। মাথায় দু একটা বস্তা—আরও কি রয়েছে। পুটু মনে মনে খুশী হয়েছে। গুদাম থেকে মালপত্র কিছু রাতের অন্ধকারে সরে যাবার পথ সে করেছিল। সেই কাজই নির্বিঘ্নে হয়ে গেল দেখে খুশী হয় পুটু। আমদানি ভালোই হবে তার।

পুটু গোবিন্দের সামনেও এটাকে ঢেকে রাখতে চায়। তাই বলে,

—যেতে দাও। কত শ্লা ছোঁক ছোঁক করছে রাত আঁধারে।

—যা বলেছো। গোবিন্দ বোতলে মুখ লাগিয়ে গলায় ঢালছে। গেলাসে ঢেলে তার ঠিক জুত হয় না।

তখনও কান্নার শব্দটা উঠছে, বিজয়া কাঁদছে। এ কান্নার গভীরতা ওদের মনকে ছুঁয়ে যায় না। বোধহয় মন বলে কোনো বস্তুই ওদের নেই। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল বন্যার দুর্বার প্রবাহে তা ভেসে গেছে কোনদিকে।

এ রাত্রির শেষ বোধহয় নেই। দুঃখের দীর্ঘতর রাত্রি। বেদান্ততীর্থ স্তব্ধ বনস্পতির মতো বসে আছেন। ঝড়ে ভাঙা গাছের বুক থেকে ছড়িয়ে পড়া দীর্ঘশ্বাস তখনও আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। বিজয়া কেঁদে কেঁদে ঝিমিয়ে পড়েছে। এ কান্নার শব্দ আর ওঠে না—বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে তীব্র একটা শূন্যতার বেদনা। বিজয়ার মনে হয়েছিল সে স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্নের সঙ্গে অতীতের সেই রাত্রির স্বপ্নের নিবিড় সাযুজ্য রয়ে গেছে।

চোখের সামনে দেখেছিল তার স্বামীর মৃত্যু, অতল অন্তহীন প্রশান্তির প্রতীক ওই মৃত্যু। জীবনের সব কিছুর পরিসমাপ্তি এনেছে—বার বার ফিরে এসেছে সেই অন্ধকারটা বিজয়ার জীবনে। ফটিক নেই। হারিয়ে গেছে।

কালো ছায়াটা নড়ে ওঠে, বোধহয় সরে গেল। তার নিজের বাঁচার প্রশ্নটা আজ ওর মনে। জানে বিজয়া এইভাবে আর চলবে না।

তার ক্ষোভ রয়ে গেছে। অসহায় স্থবির প্রায় বেদান্ততীর্থই তাকে শহরে কাজ নিতে দেন নি—এখানের স্কুলেও যেতে দেন নি। বাধ্য হয়েই দুঃসহ অভাবকেই মেনে নিতে হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে তার একমাত্র সন্তান মারা গেল বিনা চিকিৎসায়—

বিনা পথ্যে। একটু দুধ—দুখানা রুটিও তাকে দিতে পারে নি। তার ভবিষ্যৎকে সে নিঃশেষে হত্যা করেছে।

কিন্তু কেন—কি সংস্কারবশে তা জানে না। আজ বিজয়া মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। বুকচাপা শোকটা কঠিন জ্বালায় পরিণত হয়। সেই জ্বালাটা যেন ফুটে বের হবে এইবার—বিদ্রোহের রূপে।

বাইরের কোলাহল থেমে গেছে। মানুষ আরও কে কে মারা গেছে, তাদের কান্নাও থেমে এসেছে। রাত্রির শেষ প্রহর।

জেগে আছেন বিনিদ্র রজনীর শেষ প্রহর গুণে বেদান্ততীর্থ। একে একে তার সব বাঁধন খসে যাচ্ছে। মনে পড়ে কাশীর ত্রিগুণানন্দ স্বামীর কথা। তাঁর ছেলে তখন বিয়ে করে চলে গেছে। একাই রয়েছেন তিনি কাশীতে। সারা মনে তীব্র একটা বেদনা। সেইদিন গিরিশ বেদান্ততীর্থ ওই মানুষটির সান্নিধ্যে আসেন। সংসার ত্যাগী মহাপুরুষ। তিনি বলেছিলেন—বৃথা তোমার দুঃখ বাবা। স্বার্থপর মন নিয়ে সবকিছুকে দেখেছো, তাই এই ব্যথা। মুক্ত হবার চেষ্টা করো। তুমি শুধু নিমিত্তমাত্র—

তবু সেই সংসারেই জড়িয়ে পড়েছিলেন আবার। মনে হয় স্বার্থই ছিল তাঁর। হয়তো মনে মনে আত্মপ্রসাদ পেতে চেয়েছিলেন এই ভেবে যে তিনি মহৎ, কর্তব্যপরায়ণ। নইলে এই দায়িত্ব কেউ নেয়?

এই আত্মপ্রসাদটাকে কঠিন আঘাতে চূর্ণ করে দিয়েছে। ফটিক চলে গেল, শূন্য রিক্ত হয়ে গেল সব। জীবনের পাতাগুলো অনেক আখরে অনেক কালির আঁচড়ে ভরে উঠেছিল। কিন্তু অদেখা বিধাতা সেগুলোকে সব ছিঁড়ে জঞ্জালের স্তূপে ফেলেছে, জীবনের শেষপ্রান্তে সব শূন্যতার বুক থেকে আবার চলা শুরু।

রাতের তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকেন। শেষ হয়ে আসছে রাত্রি—পাখিদের কাছে সেই খবর পৌঁছে গেছে। পুব আকাশের বুকে ফিকে ফিকে আভাস—এই অন্তহীন দুঃখের শেষে তবু কোথায় যেন আলোর সন্ধান পান তিনি। মনে হয় সব হারানোর মাঝে—বুকজোড়া নিঃস্বতার বুক চিরে নোতুন সূর্য ওঠে—কি আলোকস্বপ্ন নিয়ে। দৃষ্টিপথকে উদ্ভাসিত করে তোলে। পরম সত্যকে সে বহু বেদনায় প্রত্যক্ষ করে। যে সত্য বহুবর্ণের বৈচিত্র্যে মোহ আর লোভের দ্বারা আবৃত থাকে, বহু বেদনার অনুভূতি সেই মিথ্যা আলোকবৃত্তের গভীরে নিহিত সত্যকে প্রভাত আলোর মতোই প্রতীত করে তোলে।

শোকজীর্ণ—ক্লান্ত—পরাজিত বেদনাহত বেদান্ততীর্থের সামনে সেই আলোক স্বপ্ন। জীর্ণ প্রকম্প দুটো হাত তুলে সে প্রণাম জানায় ওই পূর্বাচলের দিকে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎত্বম পুষণ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

আকাশ বাতাসে পাখির কলরবে শরতের শিশির মাখা বাতাসে কি নীরব প্রশান্তি ফুটে ওঠে। বেদান্ততীর্থের মনে তারই ছোঁয়া। ফটিকের আত্মা শান্তি লাভ করুক।

—বৌমা !···জীর্ণ কণ্ঠে ডাকছেন তিনি।

বিজয়ার বোধহয় চোখ লেগেছিল। ওর চোখে মনে তখনও সুন্দর পূর্ণতার একটি স্বপ্ন। ফটিক—তারা বাড়ি ফিরে গেছে। শিউলি গাছে ফুল ফুটেছে, বন্যার পর এই সর্বনাশা ধ্বংসের মাঝে তার ফুলফোটার দিন আসে, সাদা ফুলগুলো কুড়োচ্ছে ফটিক আর বিজয়া। সবুজ ঘাসের উপর জমা শিশিরের বুকে পড়েছে ফটিকের পায়ের ছাপ। হাসছে ফটিক মাকে জড়িয়ে ধরে। বিজয়াও।

···হঠাৎ ওই ডাকটা শুনে চোখ মেলে চাইল বিজয়া। চমকে ওঠে। নিষ্ঠুর বেদনায় মুচড়ে ওঠে তার সারা মন। ফটিক নেই—

তবু ওই ফুলের শিশিরভেজা সৌরভে আর হাসির সুরে ফটিক চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে।

—শেষ কৃত্য এখনও বাকী বৌমা!

বেদান্ততীর্থের কণ্ঠস্বর এতটুকু কাঁপে না—স্থির স্থবির সেই কণ্ঠ।

মণি দত্ত ভোরবেলাতেই ওঠে। ওটা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। উঠেই দেখে বিছানা খালি, আহুরী নেই। বিছানা-বালিশ তেমনই রয়ে গেছে। এমনিতে মেয়েটার বেলা অবধি ঘুমানো অভ্যাস, তার জন্য অনেক কথাই শুনতে হয়েছে। কিন্তু আজ তাকে না দেখে অবাক হয়।

কোমরে হাত দিয়ে আঁতকে উঠে, কালো মোটা কারে বাঁধা চাবির থলেটাও নেই। ঘুনসিটা কাটা। ধড়মড়িয়ে লাফ দিয়ে ওঠে মণি দত্ত। বুকের ভিতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। কাপড়চোপড় ঠিক করে পরার অবকাশ নেই—সাধ্যও নেই। হাত পা থরথরিয়ে কাঁপছে। ওই অবস্থাতেই গিয়ে ছোট লোহার বাক্সটা দেখে আর্তনাদ করে ওঠে সে।

চাবিটা পড়ে আছে—বাক্সের ডালা খোলা। তার মধ্যে থেকে টাকার বাণ্ডিল গহনার পুটুলি সব উধাও হয়ে গেছে। পড়ে আছে আহুরীর মাথার 'পতি পরম গুরু' লেখা সোনার পাত বসানো চিরুনীটা মাত্র আর কিছুই নেই।

মণি দত্তের জীবনের সব সম্বল—তার একমাত্র অবলম্বন সব চলে গেছে। আহুরীও নেই—টাকা পয়সা সোনা গহনা সে রোজগার করেছিল জীবনভোর লোককে ঠকিয়ে—আর অন্যায়ভাবে। সব পাপের বোঝা নিয়ে মেয়েটা পালিয়ে গেছে। চরম আঘাতই দিয়েছে তাকে মেয়েটা।

আর্তনাদ করে আর কপাল চাপড়ায় মণি দত্ত। বিকৃত কণ্ঠের

সেই কান্না আর আর্তনাদে লোকজন জুটে পড়ে। মণি দত্তের বুড়ি মাও নুইয়ে পড়া কোমর টানতে টানতে এসে পড়েছে। বুড়ির খ্যান্‌খেনে গলার শব্দ ওঠে ফাটা কাঁসার মতো।

—হয়েছে তো! তখনই বলেছিলাম মণে—ওটা মেয়ে লয়, ডাকিনী, বিষ খাইয়ে মেরে দে—ওটা কুল মজাবে, সব্বোনাশ করবে। তা তুই মুখপোড়া তখন মজেছিলি র্যা।

মণি দত্ত মাথার চুল ছিঁড়তো—তবে সারা মাথাটাই টাকে চকচকে, তাই চুল ছেঁড়াটা হ'ল না। কপাল চাপড়াতে থাকে। আর গর্জন করে—থানায় খবর দোব। পুলিশে ধরে আনুক লষ্টা মাগীকে।

সৌরভীও এসে জুটেছে। সাতসকালে কলরব শুনে গোবিন্দ মুন্সী টংএর বালাখানা থেকে নেমে এগিয়ে আসে, এসে পড়েছে পুটু কেরানীও। লোকজনের ভিড় ঠেলে গোবিন্দ মুন্সী বলে—তা একাই গেল, না যুগলে র্যা?

খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেছে। শশী মোড়লের বিশ্রী লাগে সব ব্যাপার। জায়গাটা যেন নরকে পরিণত হয়েছে। মহামারী মড়কও লেগেছে। মারী ভয়—আর অভাব-অনাহারের মধ্যে এই জঘন্য রূপটা কদর্যভাবে ফুটে উঠেছে। শশী ঠিক করেছে ওদের পাড়ার দু'চারজন মিলে ভাঙা ভিটের উপরই তালপাতা বাঁশ দিয়ে—চালা করে উঠে যাবে। বান মরে গিয়ে পলিঢাকা জমিগুলো বের হয়—কোথায় পলির প্রলেপ পড়েছে। কোথায় ক্ষেতের বুক চিরে বয়ে গেছে নদীর প্রবল জলপ্রবাহ, দহে পরিণত হয়েছে। আর কোথায় সোনা ফসলের জমি ঢেকে গিয়ে বালির রুক্ষতা জমেছে। সব নিয়ে এই বিরাট ধ্বংস—তবু তার মাঝেই বাঁচতে হবে। আবার নোতুন ফল ফসলের কথা ভাবতে হবে।

তরুণবাবুই তাই বলে—ওরা জমির মানুষ—জমিতে যাক। নোতুন বীজ আসবে—যাহোক কিছু ফসলও হবে।

বীজের জন্য তরুণবাবু ব্লক অফিসে জেলা সদরেই গিয়েছিল।

হঠাৎ ওই কলরবে তারা এদিকে আসে। শশী বলে,

—ওসব ঘেন্নার ব্যাপারে আর কান দেবে না মাষ্টার। শালারা যেন ধুকছে—মনের সব পচা পাঁক কাদা গুলিয়ে উঠবে কেবল।

ভিড় ঠেলে ওদের আসতে দেখে ভূষণ বলে—পটলাকে পাওয়া যাচ্ছে না খুড়ো।

শশী শোনায়—আপদ গেছে।

গোবিন্দ মুন্সী এই অন্তর্ধানে মোটেই খুশি হয় নি। আরও বেশী মাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছে পুটু কেরানী। তার সব আশা ভরসা চলে গেল। মেয়েটা মহা ধড়িবাজ; তবু পুটু মুখ ফুটে কিছু বলে না। সে চতুর সাবধানী লোক।

গোবিন্দ মুন্সী বলে—আপদ তো বেশ ঘা দিয়ে গেছে হে। অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যে সমেত। যাঃ বাব্বাঃ একা পটলারই দোষ? বুঝলে মোড়ল অনেক পাখিতেই মাছ খায়—নাম হয় মাছরাঙার। এখানে অনেক লটর পটরই চলছে বাবা। তবে স্রেফ ঘোমটার ভেতর। পটলার সাহস আছে—বাপের ব্যাটার মতো কেটেছে। চলো হে পুটু চন্দর। চোখকান খুলে রাখো দেখবে আবার কে কাকে নিয়ে পালায়।

গোবিন্দ মুন্সী কথাটা অন্য অর্থে বলছে, আর বলেছে সে সেই ভাবেই। কাল রাতে ওই তরুণ আর বিজয়ার কথা বলাটা দেখেছিল সে, কয়েকজনকেই দেখিয়েছিল। তারাও ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসছে।

তরুণ ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুঝতে পারে না। ও চলে গেল শশীকে নিয়ে। পুটুর নীরব রাগটা এইবার যেন ফেটে পড়তে চায়। আহ্লরী তাকেও ঠকিয়ে গেছে। তাই ঠকে যাওয়া মানুষটার নীতিজ্ঞান হঠাৎ টনটনিয়ে ওঠে।

পুটু কঠিন স্বরে জানায়,

—এসব সইবো না গোবিন্দবাবু, লষ্টামি—শয়তানি ইতরামির

জায়গা এটা নয়। মণে—থানায় খবর দে। আর তোমাকেও বলে রাখলাম মুন্সী মশায় -ভবিষ্যতে এসব এখানে ঘটতে আর দোব না।

হাসছে মুন্সী—তা ভালো।

হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মেয়েটা। ওর নিটোল দেহে রেখাগুলো হাসির ধারায় উচ্ছলিত হয়। পুটু ধমকে ওঠে—এ্যাই! এ্যাই—হাসছিস কেন?

সৌরভী হাসছিল, ওর কথাতেও হাসি থামাবার প্রয়োজন বোধ করে না। হেসে ক্লান্ত হয়ে থামল সে। চোখের তারায় ঝিলিক তুলে বলে সৌরভী।—ভাবছি এইবার গঙ্গাস্নান করে কাশীতেই যাবো গ। তুলসী কাঠের মালা কিনে দিও দিন!

পুটু হঠাৎ যেন গোঁৎ খেয়ে যায় ঘুড়ির মতো, পরক্ষণেই কানিক ঠেলে সোজা আকাশে ওড়ার মতো তেজ নিয়ে বলে,

—থাম্ দিকিন্!

ভিড় জমেছে টিউবওয়েলের ধারে। চামেলিও এসেছিল। তার এই পরিবেশ বিশ্রী লাগে। মানুষগুলো যেন ক্ষেপে উঠেছে। এখান থেকে সরে যেতে পারলে সে বাঁচে। তাদের বাড়িঘর পরিষ্কার করা হচ্ছে, আজই উঠে যাবে তারা। তবু সেখানে গিয়ে মানুষের এই ভিড় আর নোংরা থেকে বাঁচবে।

সকালেই চামেলি নিজেও ওদের বাড়ির দিকে গিয়েছিল। অনেক-দিন পর এই দিকে আসছে। দু'চার ঘর লোক ফিরে এসেছে ভাঙা ভিটেয় আবার ঘর তুলছে পলি কাদা সরিয়ে। মাঠে ধানগুলো জেগে উঠেছে। সেই পলির মধ্যে ওরা কলাই আর নোতুন করে ধান চাষ করছে। মাঠে মাঠে আ।বার মানুষের সাড়া জাগে। মৃতস্তব্ধ শ্মশানের নৈঃশব্দ্যের বুকে প্রাণের সাড়া আসছে। চামেলির মনে হয় জীবনটাই এমনি বৈচিত্র্যময়। ঠাঁই ঠাঁইএর আলো আর অন্ধকার। বেদনার কালো ছায়া নামে আবার মানুষ তারই অন্ধকারে নোতুন আলোকস্বপ্ন দেখে।

তরুণকে দেখে দাঁড়াল চামেলি।

সকালের আলোয় শিশির ভেজা ঘাসগুলো ঝলমল করছে, ওর মনেও তেমনি খুশীর আবেগ। তরুণ এসেছিল মাঠের দিকে। নোতুন আশায় বুকবেঁধে এগিয়ে এসেছে, অতীতের সব দুঃখ ভুলে মাটির বুকে তাই নোতুন প্রাণের সাড়া জেগেছে।

দু'জনের মুখচোখে সেই আলোর আভাস।

চামেলি ওকে দেখে দাঁড়াল। কোথায় বাঁশবনে পাখি ডাকছে। সুরেলা ডাকটা নদীর দিক থেকে ভেসে আসে বাতাসে; বন্যারিক্ত নদীর বালুচরে কাশফুলগুলো ফুটে উঠেছে—তাদের কাছে খবর পৌঁছে গেছে, খুশীর। শরৎ আসার খবর।

তরুণ চামেলিকে দেখেছে। এ সেই বন্যাপীড়িত পরিবেশ নয়—সহজ সুন্দর মুক্ত পরিবেশ। মন এখানে ব্যাকুল হয়ে কি সুর শোনে, স্বপ্ন দেখে।

চামেলি বলে—আজই বাড়িতে চলে আসছি আমরা।

—তাই নাকি; তরুণও খুশী হয়—তাই ভালো। চামেলি, মানুষের জীবনে দুঃখ বিপদ বিপর্যয়ের হয়তো দরকার আছে। তাতে তার প্রাণশক্তির বিকাশ হয়। মানুষ যে সব বিপদ দুঃখের ঊর্ধ্বে এই কথাটাই সে প্রমাণ করে। নোতুন করে সে আবার বাঁচে—গড়ার স্বপ্ন দেখে।

চামেলি ওর কথাগুলো শুনছে, মনে হয় সত্যই এই। বন্যা শুধু বিষপলি আর বালির অতলে সব সবুজকে নিঃশেষ করেই দেয় নি, এ সব মালিন্য জঞ্জালকে স্রোতের আবর্তে দূর করে দিয়েছে। এ কোনো এক বিপ্লবেরই মতো সব পুরোনো-জীর্ণ ঘুণধরা বস্তুকে প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে—আবার নোতুন করে গড়ে তোলার অফুরাণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

নোতুন করে পাবার স্বপ্নও রয়েছে এতে মেশানো।

চামেলির চোখে কিসের আভাস, বলে সে—আসবেন তো মাঝে

মাঝে, সামনে পরীক্ষা। এক-আধটু দেখিয়ে দিতে হবে। অবশ্যি মা বলে—পড়ে আর কি হবে।

ওর কথায় বিষণ্নতার সুর আর সেটা তরুণের দৃষ্টি এড়ায় না, তরুণ শুধায়—কেন ? পড়বে না কেন ?

হাসছে চামেলি—মা তো আমাকে বিদেয় করার জন্য একপায়ে খাড়া। বিয়ে-থার নামে কারো ঘাড়ে গছিয়ে হাঁড়ি খুন্তির ভার না চাপিয়ে মা নিশ্চিন্ত হবে না।

হাসছে তরুণ, চামেলির এই হাসিটুকু ভালো লাগে না। মনে হয় চামেলির মনের স্বপ্নটুকুকে চোখের নীরব ভাষাকে তরুণ দেখে নি। চামেলি এতদিন মিথ্যাই স্বপ্ন দেখেছিল ওকে কেন্দ্র করে। তাই বলে সে,

—আপনি হাসছেন ?

তরুণ ওর কণ্ঠস্বরের গাঢ়তায় অবাক হয। বলে সে,

—না না, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবো। আগে পাস করবে তারপর ওসব।

তরুণ চলে গেল, চামেলি দাঁড়িয়ে আছে, বাতাসে শিউলির মিষ্টি গন্ধ তখনও কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে। চড়ুইগুলো ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে আর কিচমিচ করছে, চামেলি ভাবছিল তরুণ হয়তো নিবিড়ভাবে তার কথাটা ভেবে দেখবে, চামেলি জানাতে চেয়েছিল আরও কিছু। কিন্তু সে সময় পায় নি। চামেলি ইস্কুলের ওই ভিড়ে-ভরা ঘরগুলোর দিকে এগোল।

অনেক জলবন্দী পুরুষ যে যার ঘরে ফিরে যাচ্ছে। ভিড় কমে আসছে, তবুও টিউবওয়েলের ওখানে জল নেবার ভিড় কমে নি। সেই ভিড়ের মধ্যেই মণি দত্তের মা বুড়ির থ্যান্‌থেনে গলার শব্দ শুনে দাঁড়াল।

এর আগে চামেলি শুনেছে আদুরীর পালিয়ে যাবার কথা। ওই মেয়েটা চলে গিয়ে এদের মনে চাপাপড়া একটা ব্যর্থতা আর নীচতাকে নিদারুণভাবে প্রকট করে তুলেছে।

বুড়ি বলে চলেছে নোতুন কি কথা, নিজের কলঙ্ক ঢাকবার জন্যই আরও অন্যের কথাগুলোই জবাব দিচ্ছে,

—সব পাপে ভরে গেছে বাছা দেখলি না—ধড়ফড়িয়ে এমন তাজা ছেলেটা গেল, যাবে না? একে বামুনের ঘরের বিধবা তুই, বলে কিনা পণ্ডিতের বংশ, তার ঘরের বৌ আর তুই কিনা নষ্টামি করিস ওই ছোকরা মাষ্টারের সঙ্গে। মরে যাই—মরে যাই লা! আর বাকী রইল কি?

চামেলি থমকে দাঁড়াল। ওই জঘন্য কথাগুলো শুনে চমকে উঠেছে সে। তার পিঠের উপর যেন পর পর কয়েকটা চাবুকের ঘা পড়েছে। মনে হয় এখানে এই নোংরা ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির মধ্যে সবই সম্ভব। আর সেইজন্যই আজ তরুণবাবুও তাকে এড়িয়ে গেছে, ওর কথার মধ্যে ছাড়াছাড়া ভাবটা প্রকট হয়ে উঠেছিল। চামেলির সারা মনে তীব্র জ্বালাটা পরিণত হচ্ছে দুঃসহ ঘৃণায় আর বেদনায়। ওদের কথাই সত্য, আর আজ সেটা ও বিশ্বাস করেছে।

চামেলির দু'চোখ ফেটে যেন জল নামবে। চামেলি সরে এল পালিযে যাচ্ছে সে, এখানে তিষ্ঠুতে পারবে না।

হাওয়ায় বিষাক্ত গন্ধ যেভাবে ছিটিয়ে যায়—বিস্তারিত হয় ওই জঘন্য কথাগুলো তেমনিভাবে ছড়িয়ে চলেছে। তরুণও শুনেছে, কাল রাতের ব্যাকুল একটি মাতৃহৃদয়কে সে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল এইমাত্র। সেই সত্যটুকু এমনি বিকৃত বিষাক্ত করে প্রচারিত হবে স্বপ্নেও ভাবে নি সে।

তীব্র আঘাতে সে মুষড়ে পড়েছে। প্রতিবাদ জানাবে কার কাছে জানে না। সে রেগে উঠেছে।

অসহায় এই রাগটা তার সারা মনের চিন্তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

তরুণের মনে হয় মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিও প্রচণ্ড আঘাতে অনেক শুভচিন্তাকেই বার বার বিঘ্নিত করেছে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সে—ছোট্ট ঘরখানার বাইরে সুন্দর পৃথিবী, পাখিগুলো ঘাসের মধ্যে

খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে, দু' একটা ছেলে খুশিতে কলরব করে। মাঠের ওদিকে এবার মানুষের গানের দু' এক কলি সুর ভেসে আসে। পৃথিবী থেমে নেই—তার মাঝে এই ক্ষণিকের আঘাতগুলো মানুষকে বিব্রত করে তোলে। তার জন্য ভাবে নি—ওর লজ্জা হয় ওই বিজয়ার জন্য ; বিজয়াকে জড়িয়ে এসব কথা উঠবে তা স্বপ্নেও কল্পনা করে নি। জনের কলরব ওঠে। রিলিফ দেওয়া হচ্ছে।

বিভূতিবাবু প্রথম দিকটায় এই চুরির ব্যাপারে ঘাবড়ে গেছলেন। মালপত্র অনেক সরে গেছে আর তাঁকেই এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

নিরীহ মানুষটাকে ওরা কি বিপদে জড়িয়ে ফেলেছে।

তাই বিবর্ণমুখে বিভূতিবাবু বলেন—কি হবে ত্রিদিববাবু? আমি তো এসবের কোনো খবরই জানি না।

পুটু কেরানীও চেয়েছিল বিভূতিবাবুকে এমনিভাবে বিপদে জড়িয়ে ফেলে তাঁকে হাতে রাখতে। আর সেই কৌশলও ঠিক কার্যকরী হয়েছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার তারাই করবে এবং তার বিনিময়ে বিভূতিবাবুকে দিয়ে ওরা সব কাজই করাতে পারবে এবং বিভূতিবাবুও যে তাদের সব কাজগুলো সমর্থন করবেন বাধ্য হয়ে তাও জানে সে।

সেই জন্যই পুটু বলে—দেখা যাক। যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই।

ত্রিদিববাবু চুপ করে কি ভাবছে। অবশেষে বলেন, এখন তো রিলিফ দিতে শুরু করা যাক।

অর্থাৎ ব্যাপারটাকে ধামাদেবার পথ তাঁরাও খুঁজছেন। বিভূতিবাবুও বুঝেছেন তাঁদের হাতে তিনি আটকে পড়েছেন। মুখ বুজে সব কাজই করতে হয়। মানুষগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা একে একে জিনিসপত্র নিয়ে সরে যাচ্ছে। তবু কলরব ভিড় গুঁতোগুঁতি

আর গালাগালির বিরাম নেই। কে কার আগে নেবে তার জন্যই মারামারি বাধে।

আর সেই মারামারি ছাড়াবার কেউ নেই, ওরা যেন একপাল বুভুক্ষু জানোয়ার, নিজেদের মধ্যেই হানাহানি শুরু করেছে। উন্মাদ জনতার অনেকে হানা দেয় গুদামেই।

দু'চার বস্তা গম কোনদিকে তছনছ হয়ে যায়।

ত্রিদিববাবু পুটু কেরানী এইটাই চেয়েছিল। ওদের সব গোলমাল এইভাবেই চাপা দিতে পারবে। পথ তারা পেয়ে গেছে।

উন্মাদ জনতার কোলাহল উঠছে। নিজেদের মধ্যেই ওরা মারামারি হাতাহাতি আর তাণ্ডব শুরু করেছে। ওদের চীৎকারে মাঠ থেকে লোকজন ছুটে এসেছে, তরুণও এসে পড়ে। শশী মোড়ল, ভূষণ আরও অনেকে এসেছে।

—থামো, থামো তোমরা।

তরুণ ওদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যুধ্যমান কাদামাখা মানুষগুলো ফুঁসছে কি অসহায় আক্রোশ, পুলিশও এসে পড়ে। ব্যাপারটা অনেক দূর অবধি গড়িয়ে গেছে। ওরা নাকি দলবেঁধে মালপত্র লুঠ করেছে—আর তাদের এই কাজে ইন্ধন যুগিয়েছে ওই তরুণের দলবল।

তরুণের মেজাজ এমনিতেই রুক্ষ হয়েছিল সকালের ওই ব্যাপারে। বলে সে-—এসব কি বলছেন ?

পুটু কেরানী ওর দিকে চেয়ে থাকে। ত্রিদিববাবু বলেন,

—ওরাই জানিয়েছে সেই কথা।

—মিথ্যে কথা ! আপনি কি বলেন বিভূতিবাবু ? আপনি তো এখানে আছেন প্রথম থেকে।

তরুণ বিভূতিবাবুকেই কথাটা সোজাসুজি শুধোয়।

ত্রিদিববাবুর চোখ পড়ে বিভূতিমাষ্টারের উপর, পুটুও তাকে দেখেছে। বিভূতিবাবু জানে এই রটনার মূলে কোনো সত্য নেই।

তবু এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস তাঁর নেই। বিভূতিবাবু বেশ বুঝেছেন তিনি তাঁর অজ্ঞাতেই নিজের ব্যক্তিত্ব নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে বসে আছেন। স্তব্ধতা নামে। কোনো জবাব আসে না বিভূতিবাবুর দিক থেকে।

পুটু হাসছে। সে এইটাই চেয়েছিল। তাই বলে,

—যা সত্যি তা সত্যিই তরুণবাবু, মিথ্যে গোলমাল করে লাভ কি হ'ল বলুন? কিছু চাল গম বরবাদ হয়ে গেল। সরকারী জিনিস, থানা পুলিশেও খবর দিতে হবে তো।

—কি বলছেন এসব? শশী মোড়ল বলে ওঠে।

পুটু বলে—যা সত্যি তাই বলছি।

তরুণ জবাব দিতে পারে না। শশী মোড়লই বলে,

—যারা নিয়েছে তাদের তো চেনেন গো। ধরে আনুন না?

সে প্রশ্ন, ওরা এড়িয়ে গেল। দুপুর নামছে। সকালের মিষ্টি রোদটুকুর আমেজ কেটে গিয়ে কিছু উষ্ণতা ফুটে উঠেছে। শৈশবের স্নিগ্ধতা ছাড়িয়ে যৌবনের ছড়ানো উত্তাপের মতোই, তরুণ রেগে উঠেছে এতবড় অপবাদের জন্য তৈরি ছিল না সে।

বেদান্ততীর্থ নাতির শেষ কৃত্য সমাপ্ত করে ফিরেছেন। তৃষ্ণার্ত জীর্ণ ক্লান্ত একটি মানুষ, দু'পা চলতেই হাঁপাচ্ছেন, পিছনে আসছে বিজয়া। তখনও ওর চোখের কান্নার জল মোছে নি। হঠাৎ কথাটা কানে আসে। গোবিন্দ মুন্সীই এসেছে ওই রিলিফ অফিসে। তখন গোলমাল থেমে গেছে। তার সঙ্গে আরও ক'জন। মণি দত্ত রয়েছে।

টাকার শোকটাই তার বুকে বেজেছে সব থেকে বেশী করে। মেয়েটা গেছে যাক্। তার জন্য দুঃখ নেই। বরং একটা যন্ত্রণা থেকে সে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু টাকার শোকেই সে পাগল হয়ে গেছে। তাই

সেও এসেছে অভিযোগ জানাতে। তারই কথা ক্রমে এই কথাটাও আসে। গোবিন্দ মুন্সী জোর গলায় বলে,

—এসব লীলাখেলা বন্ধ করতে হবে। তোমার ওই তরুণবাবুও কম যান না।

বিভূতিবাবু অবাক হয়ে গেছেন কথাটা শুনে, তরুণের সম্বন্ধে এসব কথা তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। গোবিন্দ বলে,

—কই পুটুবাবু, বলো কি দেখেছিলে কাল রাতে? অনেকদিন থেকেই এসব চলছে, বলি নি, মানি সম্মানিত লোক—

ত্রিদিববাবু ফুঁসে ওঠেন।

—এই সব কুৎসিত ব্যাপার সহ্য করতে হবে? আর গিরিশ-পণ্ডিতই বা ভেবেছে কি? ওই বিধবা বৌটা এমনি ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ায় তা জানি, বুড়োর সব রোজগার গেছে একটার পর একটা সর্বনাশ হয়ে গেল, তবু এই পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে? পণ্ডিত! বেদান্ততীর্থ! না কচু!

—ত্রিদিববাবু! হঠাৎ আর্তকণ্ঠে একজন কে আর্তনাদ করে ওঠে।

ত্রিদিববাবু ওরা সকলেই ফিরে চাইল। বিভূতিবাবুও। শ্মশান থেকে ফিরছেন বেদান্ততীর্থ—পিছনে বিজয়া। ওর চোখের জল তখনও শুকোয় নি।

বিজয়া শুনেছে ওই কথাগুলো। লজ্জায়—ঘৃণায় অসহায় রাগে কাঁপছে সে। মাথার ঘোমটাও খুলে গেছে। জলভরা হুটো চোখে ঘৃণার দুঃসহ জ্বালা। বিজয়ার আজ সব হারিয়ে গেছে। একমাত্র সন্তান—আশ্রয়, এমনকি ইজ্জতটুকুকেও ওরা কেড়ে নিয়েছে নিষ্ঠুর বর্বরের মতো তাদের সামান্যতম স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। সেখানে একটুকু দয়ামায়া—মানবিকতার কোনো স্থান নেই। বিচার নেই। সব প্রতিবাদ সেখানে অর্থহীন।

তবু বৃদ্ধ অসহায় মানুষটার কণ্ঠে সেই আর্তনাদ ধ্বনিত হয়, ওই

শব্দটায় ফুটে ওঠে কি অসহায় একটা ভাব, আর বেদনা। এতদিনের তাঁর সব বিশ্বাসকে—আদর্শকে ওরা পায়ের তলে মাড়িয়ে দিয়েছে।

ওই লোকগুলোকে তিনি জানেন। ওরা তার সেই সবুজ স্মৃতির প্রতীক বাগানটুকুকে ছিনিয়ে নিয়েছে অন্যায় ভাবে। তাকে—বহু মানুষকে ঠকিয়েছে, সর্বস্বান্ত করেছে। আজও তারা সেই কাজ সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।

—একি বলছো ত্রিদিব। না-না এসব মিথ্যা। সব নিয়েছো, নাও। আমার এই ইজ্জতটুকু, সম্ভ্রমটুকুকে নিয়ে বাঁচতে দাও তোমরা। কাঁদছেন অসহায় মানুষটা। মানুষের সামগ্রিক কণ্ঠের এই যেন আজ একমাত্র আবেদন। সেই আর্তি ফুটে ওঠে ওঁর কণ্ঠস্বরে।

বিজয়া বলে—চলুন বাবা। চলে আসুন।

বিজয়াই ওর প্রকম্প হাতটা ধরে নিয়ে সরে এল। আহত শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন বৃদ্ধ। সারা পৃথিবীর রূপ তার কাছে বদলে গেছে। চারিদিকে শুধু হাহাকার আর নিষ্ঠুর আস্ফালনের গর্জনই ভেসে আসে। মানুষ আজ সবচেয়ে বেশী বিষণ্ণ আর কোণঠাসা হয়ে গেছে।

বিজয়াও কথাটা ভেবেছে।

এখানে তাদের কিছুই নেই। তবু চলে যাবে এখান থেকে। এ মাটিতে ঘর বাঁধা যায় না। চারিদিকে শুধু শূন্যতার যন্ত্রণা। বিজয়া ভেবেছে কথাটা। তবু কাশীতে ফিরলে তার পুরানো স্কুলের চাকরিটা পেতে পারে, দু'একজন নিকট আত্মীয় রয়েছেন। তবু এই পরিবেশ থেকে গিয়ে বাঁচতে পারবে শান্তিতে। আর সবচেয়ে বেশী বেদনা বোধ করে সে বৃদ্ধ ওই শ্বশুরমশয়ের জন্য। আঘাতের পর আঘাতে সে বিভ্রান্ত—জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত দিশাহারা একটি মানুষ।

বিজয়া একগ্লাস সরবৎ নিয়ে এসেছে, আর কিছুই নেই।

—বাবা।

বেদান্তীর্থের মনে তখনও বেদনার ছায়া। বলেন তিনি,

—এমনি করে ফুরিয়ে যাবো জানতাম না মা, তোমাকেও এই চরম অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না।

বিজয়া ভেবেছে কথাটা। সেই বলে,

—এখান থেকে চলে যাবো বাবা। সবই ফুরিয়ে গেল—কি হবে এই মরা মাটিতে পড়ে থেকে?

বেদান্ততীর্থ ওর দিকে চাইলেন। বলেন,

—কিন্তু কোথায় যাবো মা?

—এত বড় পৃথিবীতে মানুষ এখনও বেঁচে আছে বাবা। আমরা কাশীতেই ফিরে যাবো। পুরনো স্কুলে আবার কাজ নোব। আমাদের দিন চলে যাবে। আপনিও শান্তিতে থাকবেন।

বেদান্ততীর্থের জীর্ণ স্থবির চোখের তারায় কাশীর ঘাটের ছবি ভেসে ওঠে। অপরাহ্নের ছায়া নেমেছে নদীর বুকে—বড় বাড়িগুলোর মাথায়।

ওপারের গ্রামসীমায় আবছা অন্ধকার নামে। দু'একটা করে প্রদীপ জ্বলছে। কোথায় ওঠে সামস্তোত্রের সুর, নান্দী পাঠ করে চলেছেন কোন কথক—

কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ।

পৃথিবী শস্যশালিনী—

পূর্ণতার প্রতীক শান্তির স্পর্শ আর জীবনের শেষ দিনের একটু আনন্দচেতনা বৃদ্ধের শূন্যমনকে কি নিশ্চয়তায় ভরে তোলে।

বেদান্ততীর্থ ক্লান্ত স্বরে বলেন—তাই চল মা। এখানে আর মন টেকে না। এখানের প্রশান্তিকে ওরা হত্যা করেছে, এখানের বাতাসও কলুষিত, অন্ধকারে বিবর্ণ এর আকাশ।

ফটিক তাই চলে গেল। সব সত্য সম্ভাবনাকে এরা এমনি ভাবেই ব্যর্থ করে তুলেছে।

তাই তরুণকে ওরা এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়

পুটু কেরানী, ত্রিদিববাবু রিলিফের হাজার হাজার টাকার মাল অন্যত্র পাচার করছে। বিভূতিবাবুও সেটা জানেন। আর নিজেও বেশ কিছু পেয়েছেন। ভাঙা বাড়িটা তা দিয়ে আবার নোতুন করে গড়ে তুলেছেন, জমিজারাতও বেনামীতে কিছু কিনেছেন।

ওদের রিলিফ কমিটি, স্কুল কমিটি থেকে তরুণের কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে। ওর সম্বন্ধে নানা অভিযোগ, দলবেঁধে মালপত্র লুট করিয়েছে আর স্কুল কমিটি থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ওর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ করে বেদান্ততীর্থ মশায়ের গ্রাম ছেড়ে যাওয়াটাই ওদের এই অভিযোগকে যেন সত্য করে তুলেছে।

পুটু কেরানী বলে—এবার আর জাল কেটে বেরুতে হবে না প্রেসিডেণ্টবাবু।

বিভূতিবাবুও কথাটা ভেবেছেন। জানেন তিনি তরুণের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ অর্থহীন মিথ্যা। কিন্তু নিজের স্বার্থেই তিনি চুপ করে গেছেন। কারণ প্রতিবাদ করলে রিলিফের হিসাবের অনেক গড়বড় বের হয়ে পড়বে। আর স্কুলে আইনত হেডমাস্টার হবার যোগ্যতা তরুণেরই আছে। বিভূতিবাবুর দাবি নাকচ হবার ভয়ে তিনি চেপে যান।

তাই তরুণের প্রতি এই ব্যবহারের কোনো প্রতিবাদই করেন নি। বিমল ডাক্তারই বলে,

—এসব মিথ্যে কথা। তরুণ একটা রিয়েল কর্মী।

পুটু কেরানী বলে ওঠে—এগুলো তো আর মিছে কথা নয়। এত সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে।

তরুণ তার মনস্থির করে ফেলেছে। এখানে এত দিন এসেছে সে, এ জায়গাটাকে ভালবেসে ফেলেছিল। কিন্তু এই বন্যার তাণ্ডবে দেখেছে এইখানের কিছু মানুষের মনের লোভ, আর লালসা আর নীচতাকে। বন্যা এদের সব সবুজ স্নিগ্ধতাকে নিঃশেষে বিকৃতিতে ভরিয়ে দিয়েছে।

ভাঙা বাড়িটার জানলাটা খুলে পড়েছে। এই ঘরখানাতেই ছিল তার ক'দিনের আস্তানা। চারিদিকে ছিল সবুজ গাছ-গাছালি—ধান পাটের ক্ষেত, শস্যের সম্ভাবনা।

এখন সেখানে নিঃস্বতা, সব গাছগুলো পচে গেছে জলকাদায়, আকাশ বাতাস বিষিয়ে আছে পূতিগন্ধে।

তরুণ এখানের মায়া কাটিয়ে চলে যাবে।

তাই ওদের অভিযোগের কোনো উত্তরই দেবে না। পদত্যাগ পত্রখানা পাঠিয়ে দিয়েছে।

চুপ করে ভাবছে। ক'বছরের পরিচয় ক'দিনেই ক্লেদাক্ত হয়ে উঠল। বেদান্ততীর্থকে দেখেছে স্তব্ধ শান্ত একটি মানুষ। বিজয়া বৌদির কথা মনে পড়ে।

এতবড় আঘাতের পরও ওরা তাকে চরম অপবাদ দিতে ছাড়ে নি আর তরুণই সেই অপবাদের উপলক্ষ। বিজয়া বৌদির জলভরা দু'চোখের চাউনি কোন দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেছে।

ওদের ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে।

আজ তার পালা।

তবু তরুণের মনে পড়ে চামেলির কথা।

একটা ক্ষীণ সুর ওঠে বাতাসে, হয়তো আবার পথ-হারানো দু' একটা পাখি ফিরে এসেছে।

চামেলিও কথাটা হয়তো বিশ্বাস করেছিল। এসবের কোনো যুক্তি আজ নেই। তরুণ এখানের অধ্যায় শেষ করে চলে যাচ্ছে।

তার জীবনের ব্যর্থ একটা অধ্যায়। হয়তো এরও প্রয়োজন ছিল।

বিভূতিবাবু মনে মনে খুশী হন। তরুণ এসবের মধ্যেই আসে নি। এখানের সবকিছুকে পিছনে ফেলে তরুণও চলে যাচ্ছে।

বিমল ডাক্তার ওর পদত্যাগপত্রখানা দেখে বলে,

—তোমাদের মুখের মতো জবাব দিয়েছে পুটু, হি ইজ এ ম্যান।

পুটুও নিশ্চিন্ত হয়েছে, মানে মানে এই আপদকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে দেখে তবু বললে,

—না গিয়ে উপায় কি ডাক্তার ?

বিমল ডাক্তার খুশী হতে পারে না। 'ত্রিদিববাবুও অবাক হন তরুণের এই সিদ্ধান্তে।

শশী মড়ল বলে—দেবতুল্য আর একটা মানুষকে তাড়ালেন বাবু? পণ্ডিত মশাইকেও তাড়িয়েছেন। মানুষ মাথা তুললেই বিপদ হবে যি গ'।

পুটু কেরানী ধমক দেয়—থামবি তুই ?

শশী মোড়ল বলে—থামতিই হবে আজ্ঞে। নালে আমাকেও ভিটে মাটি ছাড়া করবেন যে।

বিমল ডাক্তার গর্জে ওঠে—রাইট। আমার রেজিগ্‌নেশন লেটারও রাখো পুটু। এসব মেনে নিতে পারলাম না।

বিমল ডাক্তার উঠে গেল অফিস ঘর থেকে।

তরুণ এসব খবর জানে না। ওই গ্রামসীমা ছাড়িয়ে ভাঙা বানডুবো পথটা বয়ে ফিরে চলেছে সে শহরের পানে। পিছনের দিকে চাইবার মতো কোনো সঞ্চয় তার নেই।

কথাটা অনেক বেদনায় স্মরণ করে চামেলি।

হারানো দিনগুলোকে ভুলতে চায় এরা। আবার গ্রামের মাঠে এসেছে সবুজের নিশানা। মরা গাছগুলোয় এসেছে ফুলের ইশারা।

চামেলি আজ এই হারানো সবুজের স্মৃতি নিয়ে ফিরছে, সেদিন বাবার কথার প্রতিবাদ করতে পারে নি।

নিজেও একটি মানুষকে নিদারুণ আঘাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল। হয়তো ভুলই করেছিল সে। তরুণকে সে চিনতে পারে নি, চায় নি।

তাই ওদের দেওয়া মিথ্যে অপবাদগুলোকে চামেলিও বিশ্বাস করে তরুণকেও আঘাত দিয়েছিল।

কোথায় একটা পাখি ডাকছে। ভাঙা ভিটেটা বেদান্ততীর্থ মশায়ের বাড়ির ধ্বংসাবশেষের নীরব সাক্ষী। ওই পরিত্যক্ত ভিটের এককোণে শিউলিগাছটায় এসেছে ফুলের ইশারা। বানে ডোবা মাটির বুকে আবার শরতের কাশফুল ফুটছে।

চামেলির মনে পড়ে হারানো সেই মানুষগুলোর কথা। ফটিক—বেদান্ততীর্থ বিজয়া বৌদি আর কত মুখ। সব ছাপিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তরুণের নীরব চাউনি। ওকেও সে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

আজ কাশ ফুলের মেলায়—শিউলির সজল সৌরভে হারানো বেদনাগুলো ফিরে ফিরে আসে তার নিঃসঙ্গ মনে।

সমাপ্ত